পারো — কাকে কাঁদু —
প্রশান্ত দ্বিবেদী
১৯৩৭

... কিছু বললেন না, ভাবলেন হলে বেশ হয়। তাঁর মৃতা ...র কথা মনে হলো—দেওয়ালে টাঙানো প্রকাণ্ড অয়েল-পেন্টিং ছবির দিকে তাকালেন এবং মনে মনে বললেন—তোমার ছেলের জন্য বৌ করতে ওকে যদি পছন্দ হয়তো তুমি আন—তোমার সংসার সে গ্রহণ করুক।

অসিতবাবু ঈশ্বরপরায়ণ ধর্মভীরু ব্যক্তি। আধুনিক যুগের মানুষ হলেও তিনি আধুনিকভাব আওতা থেকে দূরে থাকেন। বড় ব্যবসাদার কিন্তু কালোবাজারের ধার দিয়েও তিনি যান না। পৈত্রিক কারবার তাই সুনাম যথেষ্ট এবং ঐ ব্যবসাতেই ভালভাবে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া তিনি তাঁর পত্নীর সম্পত্তিও পেয়েছেন যা নীলুর হবে। ব্যাঙ্কেই নগদ তাঁর কোটিখানেক টাকা মজুত। এর মধ্যে নীলুর নিজের তহাবল লাখ কয়েক। অতএব পুত্রটির বিয়ে দিয়ে সংসারের ভার তার উপর চাপিয়ে দিয়ে অসিতবাবু বাণপ্রস্থে না যান অন্ততঃ বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হতে চান।

নীরাকে তাঁর পছন্দ হয়েছে, এখন প্রস্তাবটা এলেই হয়। কিন্তু নীরা যে কোন্ বংশের মেয়ে, কে তার বাপ-মা কিছুতো জানা গেল না। যদিও বর্ত্তমান দিনে ওগুলো আর কেউ জানতে চায় না তবু অসিতবাবু জানবেন ঠিক করলেন। নীরা আবার এলেই তাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি জেনে নেবেন তার বাবার ঠিকানা এবং নিজেই গিয়ে প্রস্তাব করবেন মেয়েটিকে তাঁর ঘরে আনবার জন্য।

নীরা যে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা এবং সবরকমে যোগ্যা এ বিষয়ে কোন সন্দেহই আর রইল না অসিতবাবুর মনে। তবু যেগুলো করণীয় তা তিনি করবেন—ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন—উঠে দেখলেন সকাল হয়ে গেছে। ওঘরে রেডিও বাজছে। আজ বিশেষ দিন। গান্ধীজীর বাণী পাঠ হচ্ছে। শুনলেন—সংযত জীবন কি ভাবে পালন করেছেন গান্ধীজী। ভারতের ঐ

মহান পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে উঠল অন্তর। [illegible]হ: প্রণাম করলেন—এবং প্রার্থনা করলেন, ঐ আদর্শই যেন দি জীবনে ধরে রাখতে পারেন।

—নীলুবাবু কাল রাত্রে ফেরেন নি হুজুর—চাকরটা জানালে,

—ফেরেনি? সেকি? এবকম তো হয় না। ওর ক্লাব খোঁজ নে।

তৎক্ষণাৎ ক্লাবে ফোন করা হোল। জানা গেল যে ক্লাবের কয়েকজন সদস্য ষ্টিমারপার্টিতে বেড়াতে গেছে। আজ বিকেল নাগাদ ফিরবে।

ভালো কথা কিন্তু নীলু কেন বলে গেল না? তিনি তো ছেলের কাজে বাধা দেন না। নিজের অফিসে গিয়েও তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—নীলু এবং নীরা ফিরলো কি না। দুবার ফোন করলেন 'সুন্দরম্' ক্লাবে—না, ফেরেনি। জানলেন, তাদের ফিরতে হয়তো রাত হবে—আজ নাও ফিরতে পারে।

অসিত বাবু শুধু নীলুর নিরাপত্তার কথাই ভাবছেন। বৈশাখ মাস, কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠতে পারে। অসিত বাবুর এসময়ে ষ্টীমারপার্টি পছন্দ নয় কিন্তু বর্ত্তমান যুগ উন্নাসিক যুগ—ওসব কেউ মানে না। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তিনি অফিস থেকে বেরুলেন এবং তাঁর বিশেষ বন্ধু অমরনাথ বাবুর বাড়ী এলেন মনটাকে একটু হাল্কা করবার জন্য। অমর বাবুও ধনী ব্যক্তি এবং অসিতবাবুর মতই বিপত্নীক তবে তাঁর বৃদ্ধা মা আজও জীবিতা। পুত্র অমিয় এবং কন্যা অঞ্জনাকে নিয়ে তিনি সংসার করেন। অন্তঃপুর দেখেন বৃদ্ধা মা। কন্যাটি এবার স্কুল-ফাইন্যাল দেবে। পুত্র ডাক্তারী পড়ে। বড় ডাক্তার হবার জন্য তার বিলাত যাবার ব্যবস্থা করছেন, অমরবাবু। অতি সুন্দর সুপুরুষ পুত্র যেন রাজপুত্র, কন্যাটিও সুন্দরী।

অমরবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করলেন অসিতবাবুকে। অঞ্জনা এসে প্রণাম করলো এবং বললো,—আমার স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা জেঠামশাই—আশীর্ব্বাদ চাইছি।

—ঈশ্বরের কৃপায় ভাল ভাবে পাশ কর। একখানা ভাল শ্যামা-সঙ্গীত শুনতে এলাম মা—

—আচ্ছা, এখুনি গাইছি—

বসে অঞ্জনা যন্ত্র নিয়ে আরম্ভ করলো,

'আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে···

তুমি দেখ আর আমি দেখি মন

আর যেন কেউ নাহি দেখে ;

কাম-আদিরে দিয়ে ফাঁকি

এসো তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি

রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে—'

—আহা !—অসিতবাবু অশ্রুসজল নয়নে বললেন—।

—সত্যি ! এতো মিষ্টি লাগে।—অমরবাবুও সমর্থন করলেন।

—রেডিওতে সেদিন এই শ্যামাসঙ্গীত শুনছিলাম নতুন সুরে গাওয়া হচ্ছে।

—হচ্ছে নানা রকম—সব কিছুরই আধুনিকীকরণ হচ্ছে—সব আপ্-টু-ডেট হবে।

—হোক—যা হবার তা হবে কিন্তু আমি এটা সমর্থন করিনে অমর-ভাই।

—সমর্থন আমিও করিনে দাদা কিন্তু কে শোনে আমাদের কথা !

—না, আমরা ইতর জনা—যাঁরা দেশ-নেতা, দেশবরেণ্য, দেশ চালাচ্ছেন, তাঁরাই চাইছেন—এক দৌড়ে এই সনাতন ভারতকে আধুনিক এ্যামেরিকার রূপ দান করতে। ভালই হয়তো করছেন,

তাঁরা—কলকারখানা, কৃষি উৎপাদন, বণ্টন—সমবায—সার্ব্বজনীনতা সহ-ভ্রাতৃত্ব—মহান্ মনোভাবের মানুষ সৃষ্টি—কিন্তু হচ্ছে কি? আধুনিকীকরণের মন্ত্র এবং যন্ত্র অনেক আবিষ্কার হযেছে কিন্তু মানুষকে মানুষ করবার মত মন্ত্রদাতা গুরু কোথায়? মন্ত্র থাকলেই এবং তা পুঁথী থেকে পড়ে জপ করলেই মন্ত্রসিদ্ধি ঘটে না—তার জন্য চাই সিদ্ধ গুরু যিনি নিজে সেই সাধনা করেছেন, যেমন গান্ধীজী।

—অবশ্য - অমরবাবু বললেন— বড় বড় কথার আড়ালে অনেক কাজের কদর্য্যতা যতই চাপা দেওয়া থাক তার দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে মনুষ্যত্ব জাগছে না—জাগছে রিরংসপরাযণতা, হিংসার কুটিলতা আর বিদ্বেষের বহ্নিমানতা—যার বিভৎস পরিণাম ভেবে আতঙ্ক হয সত্যি দাদা—মানুষের জীবন আজ যেন মৃত্যুর খাড়ার উপর ঝুলছে কাল খবর পেলাম ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটায লক্ষ্ণৌযে শ' খানেক লোক সাবাড়। খবর পেলাম—কোথায লোকাল ট্রেন থামিয়ে গোটা পঁচিশ ট্রেনের আসা বন্ধ করা হয়েছে। খবর পেলাম—কোথায় যেন মারমুখো জনতাকে শান্ত করতে পুলিশ লাঠি চালায—জনতাও পুলিশকে রেহাই দেয়নি। বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছে। এই সব নিত্যদিনের খবর। আমরা সাধারণ জীব—শান্তিতে থাকতে চাই—খাই শুই এবং একদিন মরতে চাই শান্তিতে। জীবনটাকে অবিরাম যুদ্ধক্ষেত্র করে রাখতে চাই নে

—হ্যাঁ অমর ভাই, ভাবছি ছেলেটার বিয়ে দিয়ে দূর কোন দেশে চলে যাই যেখানে এই সব অশান্তি ঘটবে না।

—এমন যায়গা পৃথিবীতে আজ আর নেই দাদা। নৈমিষারণ্যও নেই আর আজ। সেখানেও আধুনিকীকরণ চলছে। হিমালয় আজ অগ্নিকুণ্ড—সুন্দরবনে বাঘের উপদ্রব কমেছে কিন্তু বিদেশীয় সাপের বিষ বাড়ছে সেখানে—মধ্যপ্রদেশ আজ মহান ইস্পাৎ-

নগরী অথবা ঐরকম কিছু। অরণ্য-নগরী বা আরণ্যক-সভ্যতা বিলুপ্ত আজ পৃথিবী থেকে!

—তাই তো অমর! কি করা যায়?

—করবার কিছু নেই দাদা—যেখানে আছো যতদিন বাঁচো থাক সেখানেই। খাও ভাল করে যতদিন জোটে—শোও ভাল বিছানায়—চিন্তা কর ভাল অর্থাৎ সচ্চিন্তা কর—কর্ত্তব্য যা আছে শেষ করে ফেল। তারপর বসে থাক মধুর মরণের জন্য।

—হ্যাঁ—এ ছাড়া পথ নেই!

অঞ্জনা দুজনকে দুগ্লাস কাঁচা আমের সরবৎ এনে দিল। পরিষ্কার সাদা স্বচ্ছ গ্লাসে এনেছে। হাত দিয়েই অসিতবাবু বললেন, —কাসার গ্লাস আর চলে না অমর পাথর তো বহু দিন বিদায় নিয়েছে। এখন কাঁচের যায়গা জুড়ছে সুন্দর মসৃণ কোমল নমনীয় এই প্লাষ্টিক—হ্যাঁ—আধুনিকীকরণ –

দুজনেই হাসলেন। অঞ্জনা ছেলেমানুষ। ঐ সব কথার কোন মর্ম্মই সে বোঝেনি তাই অপ্রতিভ হয়ে বললো,

—পাথরের গেলাস আছে জেঠামশাই। আনবো?

—না রে না—ওগুলো আর চলবে না—আছে তো তুলে রেখে দে!

—তোলাই আছে। মা তুলে রেখে গেছেন।

অঞ্জনার চোখে জল এল। চলে গেল অঞ্জনা!

পরদিন ফিরলো নীলোৎপল। অসিতবাবু প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে বিশেষ কিছু বললেন না। শুধু বললেন—এরকম দূর দূরান্তর গেলে জানিয়ে যেতে হয়। পুত্র নীলু মাথা নত করে রইল এবং সবিনয়ে জানালো যে অকস্মাৎ ষ্টিমার পার্টির ব্যবস্থা হয়—বাড়ী আসবার সময় পাওয়া যায় নি। বাবাকে ফোন করে না পাওয়ায়

সে তাঁকে খবর দিতে বলে গিয়েছিল ক্লাবে। যাই হোক এরকম আর হবে না।

অসিতবাবু আর বাড়াবাড়ি করলেন না—শুধু প্রশ্ন করলেন, —সেই মেয়েটিও তো গিয়েছিল ?

—হ্যাঁ বাবা—ঐ তো সব করলো ব্যবস্থা। তারই জন্য সব হোল। খুব ভাল লাগলো সবারই।

—ওর ঠিকানা কি নীলু ? কার মেয়ে ? ওর বাবা কি করেন ?

—ঠিক জানিনা বাবা—বৌবাজারে বাড়ী। ওর বাবা আছেন কিনা জানা নেই। আমি জেনে আপনাকে বলবো। কেন বাবা ?

—মেয়েটি ভাল। দরকার হলে ওর বাবার কাছে যেতে পারি আমি। অবশ্য তার আগে তোমার মত দরকার।

—ও সব এখন থাক বাবা—এখনকার দিনে বাবার প্রস্তাবমত বিয়ে হয় না। ওর নিজের মত না জেনে এগুনো ঠিক হবে না।

—হ্যাঁ—সে তো বটেই !

অসিতবাবু আর কিছু বললেন না। যোগ্য ছেলে তাঁর—বুদ্ধিমান এবং সাবধানী—তার কথায় খুসীই হলেন অসিতবাবু। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে অবিলম্বে ছেলের বিয়ে দিয়ে বাড়ীতে লোক আনবেন। সেদিন অমরবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলেন। অমরবাবুও বিপত্নিক কিন্তু তাঁর মেয়ে আছে, বৃদ্ধা মা আছেন, আর আছে যোগ্য ছেলে—অমিয়কুমার। ছেলে তাঁর খুবই ভাল। সে বড় ডাক্তার হবে—এই জন্য অমরবাবু তাকে বিলাতে পাঠাবেন। সে কথা শুনে এলেন অসিতবাবু। বিপত্নিক হলেও অমরবাবুর বাড়ীতে মহিলা আছে। মেয়ে অঞ্জনা বাড়ীখানা একাই ভরে রেখেছে। আর অসিতবাবুর বাড়ী ন্যাড়া বাড়ী। না,—এ ভাবে গৃহবাস করা যায় না। ছেলের বিয়ে দিয়ে তিনি অবিলম্বে বাড়ীতে লক্ষ্মী আনবেন। বারান্দায় শাড়ী শুকোবার জন্য না ঝুললে বাড়ী মানায় না—অন্তঃপুরে

মেয়েদের গলা না শোনা গেলে সে বাড়ী অরণ্য কী শ্মশান কে জানে কি মনে হয়। (মেয়েরা লক্ষ্মী—তাদের অশ্রয়েই পুষ্ট হয়ে সংসার গড়ে ওঠে—যে বাড়ীতে মেয়ে নাই সে বাড়ী বাড়ীই নয়!)

নানা কথা ভাবছিলেন অসিতবাবু। নীরাকে তিনি একদিন মাত্র দেখেছেন—আবার দেখতে ইচ্ছে করছে। নীলু যদি তাকে আনে তো বেশ হয়। বৈকালিক চা তিনি নীরাকে নিয়েই পান করবেন—তার হাত দিয়েই পরিবেশন করাবেন—এমন কত কি ভাবতে ভাবতে অফিস গেলেন। অফিস থেকে ফিরে অসিতবাবু সানন্দে দেখলেন, নীরা এসেছে। অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। অসিতবাবুকে প্রণাম করলো নীরা। তিনি সস্নেহে বললেন,

—ভাল আছ মা?

—হ্যাঁ বাবা ভাল আছি। ক'দিন আপনাকে দেখিনি তাই ভাবলাম, বাবাকে একবার আজ দেখতে যাব। আপনার শরীর ভাল তো?

—হ্যাঁ—বসো! ওরে কে আছিস 'লন'-এ চেয়ার দে—চা খাবে মা।

—ওসব আমি করিয়ে রেখেছি। আপনি কাপড় জামা ছাড়ুন; সবই ঠিক আছে।

নীরা সহাস্যমুখে অসিতবাবুর জামার বোতাম খুলে দিল, কোটখানা টাঙিয়ে রাখলো আলনায়—অসিতবাবু গেলেন বাথরুমে। এর মধ্যে 'লন'-এ চায়ের সব ব্যবস্থা করে রাখলো নীরা। অসিতবাবু এলেন পোষাক বদলে। ধুতি ফতুয়া পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক তিনি এখন। চা তৈরী করছে নীরা—খাবারের প্লেটখানা এগিয়ে দিল অসিতবাবুর দিকে। বললো,

—সেদিন ষ্টিমারে আপনাকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল আমার।

ফোন করে আপনাকে পাইনি—খুব এনজয় করেছি আমরা—!

—আনন্দের কথা মা—আমাদের আর ওসব পোষায় না। তোমরা ভাল থাকলেই ভাল এখন। তোমার বাবা কি করেন মা?

—বাবা তো নেই আমার। অনেকদিন নেই। আমার তখন বারো বছর বয়স। 'বাবা' বলার সাধই মিটলো না।

—তাহলে কে দেখাশুনো করছে তোমাদের?

—মা। বাবার কিছু টাকা ছিল—আর বাড়ী ভাড়া কিছু পাওয়া যায়।

—ওঃ তাহলে তো খুব দুঃখের কথা! তোমার আর ভাই বোন আছে?

—হ্যাঁ—আমার ছোট বোন ধীরা পড়ছে—এবার স্কুল ফ্যাইন্যাল দেবে। ভাইটি ছোট,- ক্লাস সেভেনে পড়ে—আর মা—মোট চারজন আমরা বাড়ীতে।

—বড় বাড়ী?

—না বাবা—নেহাৎ ছোট—নীচেতে ভাড়াটে আছে দু'ঘর—একশ কুড়ি টাকা ভাড়া পাই--যাট টাকা করে। উপরে আমরা থাকি।

—আর কোন আয় নেই?

—না—ঐতেই বোনের ভাইএর স্কুলের মাইনে, তাদের কাপড়-জামা, আমাদের সব খরচ চালাতে হয়। দুস্থের সংসার বাবা!

—তা হোক—তোমরা ভাল হও বড় হও।—বলে অল্প থেমে অসিতবাবু শুধালেন,

—তোমার বাবার নাম কি ছিল মা?

—অতুল রায়—তিনি ছিলেন শিল্পী—কাঁচের উপর ছবি আঁকতেন। তাঁর রোজগার ভালই ছিল—বাড়ীটা তাঁর পৈত্রিক, ভালই চালাতেন সংসার। হঠাৎ কি যে হোলো—নীরা থেমে

গেল কথা বলতে বলতে'

—কি হোলো মা—?

—বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। প্রায় পাঁচ-সাত বছর তাঁর খবর পাই নি!

—ও—

নীরার মুখপানে তাকালেন অসিতবাবু—চোখে জল আসছে তার—দেখলেন। সান্ত্বনার সুরে বললেন,

—নিরুদ্দেশ হয়ে যখন আছেন তখন হয়তো ফিরে আসবেন!

—না—সে আশা নেই আর। শুনেছি, কাশীতে গিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। খবরটা সরকার থেকে জানানো হয় আমাদের।

—ও—

অসিতবাবু আর কিছু বললেন না। ভাবতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ কথাই আর বললেন না অসিতবাবু! নীরা গান শোনালো— রবীন্দ্র-সঙ্গীত :—

'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে;
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই
চাহিতে পারিনা যে লাজে........

সরল কথায় সহজ ছন্দে মহাকবি এই গানে যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অপরূপ ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন অসিতবাবু তাঁর সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তাই অনুভব করছিলেন। নীরা গাইলো,

জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়ঃতম
এমন ধন আর নাহি যে তোমাসম
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া যেতে পারি না যে!"

অসিতবাবু কেমন যেন মুহ্যমান হয়ে রইলেন। এই গানের

রসে যেন নেশা ধরে গেছে। আর কি মিষ্টি গলা মেয়েটার! যত রূপ, তত গুণ নীরার। এমন মেয়ে হাতছাড়া করা উচিত নয়।

—তোমাদের বাড়ীর ঠিকানা কি মা?

—তেতাল্লিশ নম্বর হিতুমল বাই লেন—বৌবাজার। চোরা-বাজারের কাছে। কিন্তু আপনি ওখানে যাবেন না বাবা, ওখানে মানাবে না আপনাকে।

—ওখানে যদি আমার মা থাকে তো আমাকে অবশ্যই যেতে হবে মা—

নীরা আর কিছু বললো না—স্নেহ-সজল নয়নে অসিতবাবু তার পানে তাকিয়ে আছেন। দেখলো নীরা। অবশেষে বললো, —যাবেন! আমি ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখবো।

—না, ওসব কিছু করতে হবে না তোমায়। আর আমি আজই যাচ্ছি না। যখন যাব—তোমাকে জানাব! নীলু গেল কোথায়?

—কি জানি বাবা—হয়তো ঘরেই আছেন। ডাকবো?

—না, থাক—সে যখন আসে আসুক—তুমি কতটা পড়েছ মা?

—বি, এ....আর টাকা নেই। পড়া হলো না।

—পড়বে আরও?

—না বাবা—আর ইচ্ছে নেই। তা ছাড়া পড়াতে আমি খুব ভাল ছাত্রী নই! গান—ছবি আঁকা—অভিনয় করাই আমার ভাল লাগে। কোন রকমে বি. এ. পাশ করে ফেলেছি—হাসলো নীরা কথাটা বলে।

ওর হাসিটা খুবই সুন্দর—এমন সুন্দর যে দীর্ঘক্ষণ মনে থাকে। ওর গানের স্বর অত্যন্ত মিষ্টি—উচ্চারণ খুব স্পষ্ট এবং বাক্যবিন্যাস সুন্দর। অসিতবাবু ওকে মূল্যবান সম্পদ বলেই মনে করলেন। বললেন,

—তাহলে বিয়ে করে সংসার ধর্ম্ম কর—গান বাজনা ছবি

আঁকা তো আর জীবন নয় মা—ওগুলো জীবনের খাদ্য—খোরাক। (জীবন পূর্ণ হয় সংসার রচনায়; নারী সেখানে শুধু মাধুর্য্যময়ী প্রিয়া নয়—মমতাময়ী মা। সৃষ্টিস্রোত বহমান রাখতেই বিধাতা নারীর সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এই সুরচিত বিশ্বে নারী তাই পরম সম্পদ, পরম গৌরব।)

নীরা চুপ করে শুনে গেল। অসিতবাবু থামলেন।

নীলু এল। এসেই বললো,

—এক বাটি চা।

—এই যে--নীরা এগিয়ে দিল খাবারের প্লেটখানা!

—ও সব না—শুধু চা একবাটি।

—কেন?

—সুনীলের বাড়ী গিয়েছিলাম—ওরা খাওয়ালো।

—তাহলে চা-ও নিশ্চয় ওখানে খাওয়া হয়েছে—এটা দ্বিতীয় দফা?

—না—ওরা চা খায় না। সরবৎ দিতে এল—আমি খেলাম না।

—এই যুগে চা খায় না এমন বাড়ী আছে নাকি?

—আছে। সুনীল চক্কোত্তি, তার বাবা শিবরাম চক্কোত্তি—মা জয়দুর্গা চক্কোত্তী আর বোন লক্ষ্মী চক্কোত্তী—চা ও-বাড়ীতে ঢোকে না।

—কার কথা বলছিস নীলু, কোন্ বাড়ী?—অসিতবাবু শুধালেন।

প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক ডাঃ শিবরাম চক্কোত্তির কথা বাবা—সুনীল ওঁর ছেলে আমার সঙ্গে পড়েছে—তাই যাই মাঝে মাঝে। আজ হঠাৎ ডাকলো সে আমাকে।

—কিছু দরকারী কথা বললেন?

—হ্যাঁ—বললো, ওর বাবা ডাঃ শিবরাম আপনার সঙ্গে দেখা

করতে চান। কবে সুবিধে হবে জানাতে বললেন।

—তিনি আসবেন?

—হ্যাঁ—আপনি সম্মতি দিলেই আসবেন।

—যেদিন ইচ্ছে আসতে পারেন! ওরকম মহান ব্যক্তির আগমন তো ভাগ্যের কথা নীলু। তুই কি বললি?

- বললাম—বাবাকে শুধিয়ে আমি তোকে জানিয়ে দেব!

- জানিয়ে দে—কালই তিনি আসুন—আমি সানন্দে সাক্ষাৎ করবো।

নীরা চা দিলো নীলুকে। কিন্তু নীরার মুখ খুব প্রসন্ন দেখাচ্ছে না। কেমন যেন মলিন ছায়া তার মুখে। বললো,

—অধ্যাপক শিবরাম বাবুকে দেখেছি আমি। খুব উচু দরের লোক তিনি!

—না তো—নীলু বললো—সাংঘাতিক গোঁড়া! তার হিন্দুয়ানীর ঠেলায় পৃথিবী অস্থির। আমাকে বললেন—

'—নীলু তোমার বাবাকে আমার অন্তরের অভিবাদন জানিয়ে বলবে আমি তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষী! দয়া করে যেন অনুমতি দেন।'

—ওসব লোক ঐ রকমই হয় নীলু—যাক তুই ওঁকে জানিয়ে দে—কাল তো ছুটি নেই।

—আছে বাবা কাল কি একটা পর্বের ছুটি। তিনি কালই আসতে চান।

—সকালেই?

—হ্যাঁ—বললেন—সকালেই যাব—দিন ভাল আছে।

—আচ্ছা—আসুন। কিছু আয়োজন করতে হবে তো?

—না—কিছু না; একটা বড় আর টাটকা ডাব হলেই চলবে। উনি চা-সিঙ্গাড়া খান না।

কিছুক্ষণ পরে নীরা বললো,

—আমরা এবার ক্লাবে যাব বাবা—

—যাও—আবার এসো মা নীরা।—

নীরা আর নীলু চলে গেল মোটরে চড়ে। অসিতবাবু বসে রইলেন।

সকালেই অসিতবাবুর মনে পড়ে গেল অধ্যাপক শিবরামবাবু আসবেন। আয়োজন যদিও কিছুই করতে হবে না। একটা ডাব হলেই হবে, কিন্তু না, কিছু আয়োজন কি না করলে চলে! ডাব ছাড়াও কিছু সন্দেশ আনিয়ে রাখলেন।

সাড়ে নটার সময় এলেন ডাঃ শিবরাম চক্রবর্ত্তী। অমায়িক ভদ্রলোক, উজ্জ্বল সুন্দর মুখে তাঁর হাসি লেগেই আছে। সাদরে অভ্যর্থনা করলেন অসিতবাবু। বসালেন এবং করযোড়ে বললেন,

—আমার মত ব্যবসাদারের কাছে অধ্যাপক মহাশয়ের দরকার কি বুঝতে পারি নি।

—বলছি—হেসেই আরম্ভ করলেন শিবরাম বাবু—দরকার আপনার ছেলে নীলুকে। শুনেছেন বোধহয়, আমার একটি মেয়ে আছে নাম লক্ষ্মী—তাকেই আমি নীলুর হাতে দিতে চাই। এখন আপনার কৃপা।

—এতো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা চক্কোত্তিমশাই! আসুন কিঞ্চিৎ জলযোগ করুন।

—হ্যাঁ—মিষ্টিমুখ করতে হয়। দেশে গুড় দেবার প্রথা আছে। আমি এগুলো মানি—বলতে বলতে একটা সন্দেশ মুখে দিলেন শিবরামবাবু।

—মানি আমিও। তবে আজকাল ছেলেরা আর মানছে না।

—হ্যাঁ, দেশকাল বদলাচ্ছে। আমরা এখন বিলাতী সভ্যতার

আওতায় এসে ওসবকে কুসংস্কার মনে করি। কিন্তু সংস্কারটা কু কখনো হয় না ওটা চিরকালই 'সু'—কারণ ঐটাই আমাদের জাতীয়তাকে আমাদের ভারতীয়তাকে ধরে রেখেছে। যখনই আমরা ধর্ম্মের উপর দেব-দেবীর উপব অথবা গুরুজনদের উপর থেকে শ্রদ্ধা সরিয়ে নেই তখনই আমরা ভারতীয়ত্ব ত্যাগ করি। কিন্তু উপায় নাই—এই চলছে—চলবে। তবে আমাদের আমলটা আমরা কাটিয়ে যাব।

—ঠিক কথা! আমরা যতটা পারি সংস্কার বজায় রেখে যাই।

—হ্যাঁ—

ভাবটা খেলেন তিনি। একটু থেমে বললেন,

—ছেলে তো আমাব ছাত্র। তাকে আর দেখবার কিছু নেই। মেয়ে কবে দেখবেন?

—যেদিন বলবেন! বলেন তো আজি বিকালে যেতে পারি।

—বেশ—আসুন। আমার ছুটি আছে। কাজটা সেরে ফেলা যাক। দিনও ভাল আছে।

—ছেলে-মেয়ের মতামত?

অসিতবাবু সসঙ্কোচে বললেন কথাটা।

—হ্যাঁ—যতদূর জানা গেছে ওদের অমত নেই। মেয়ের তো নাই-ই—খুব সম্ভব নীলুরও নেই। ওটা আমাদের আগেই জানা দরকার; তবে কি জানেন—ওরা ছেলেমানুষ—সবটাই আমি ওদের উপর ছেড়ে দিতে চাইনি। তাদের বিবেচনা-শক্তি কম।

—নিশ্চয়! তবু আমি নীলুকে একবার জিজ্ঞাসা করবো।

—করবেন। আশা করি তার অমত হবে না।

—না—অমত হবার কারণ তো কিছু নেই!

অতঃপর আরো কয়েকটা কথা যা এর সঙ্গে একেবারেই মেলে না যেমন সমাজ, শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হোল।

ডাঃ চক্কোত্তি বিদায় নিলেন। নীলু সকালেই বেরিয়ে গেছে। এখনও ফিরলো না। অসিতবাবু ভাবছেন কালই তিনি নীরাকে মনে মনে মনোনীত করেছেন। এখন কি করবেন ?

শিবরামবাবু চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন অসিত বাবু। ভাবলেন, নীরা সম্বন্ধে যেটুকু তিনি শুনেছেন তাতে তার আভিজাত্যের বা বনেদিয়ানার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অতি সাধারণ গৃহস্থ পরিবার—বাবা শিল্পী ছিলেন কিন্তু তাঁর অপমৃত্যুর কারণ রহস্যাবৃত। এরকম বাড়ীর মেয়ে খুব যে ভাল হবে তা মনে হয় না। ওদিকে শিবরামবাবুর মেয়েকে বিনা দ্বিধায় ঘরে তোলা যায়। কি এখন করবেন তিনি ? নীরাকে এত তাড়াতাড়ি মনোনীত করা এবং তাকে খানিকটা আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া ঠিক হয় নি। কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন অসিত বাবু! চিন্তার কথা।

আজ ছুটি আছে। নীলু কখন এসেছে জানতে পারেন নি ; শুয়ে ছিলেন অসিতবাবু! নীলু কোথায় গিয়েছিল জানেন না। বিকালে তার সঙ্গে দেখা হোল। নীলুই প্রশ্ন করল,

—অধ্যাপক চক্কোত্তি এসেছিলেন বাবা ?

—হ্যাঁ—অতি অমায়িক লোক—মহাশয় ব্যক্তি।

—কি কথা উনি বললেন ?

—ওঁর মেয়ে লক্ষীরাণীর সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চাইছেন। মেয়ে দেখতে বলে গেছেন।

—আপনি কি জবাব দিলেন ?

—আমি বললাম—আমার কোন অমত নেই। তবে ছেলের আর মেয়ের মতামত দরকার।

—মেয়ে দেখতে যাবেন কি আপনি ?

—হ্যাঁ—যাব! তোর মতের জন্য অপেক্ষা করছি।

—মেয়ে ভালই বাবা—তবে ওরা বড্ড গোঁড়া—অত বিদ্যে-বুদ্ধি ওদের কিন্তু ওরা সেই সেকেলেই আছে। বাড়ীতে বিগ্রহ আছেন। লক্ষ্মীর কাজ ঐ ঠাকুরের সেবা আব ঘবের যৎসামান্য কাজ করা।

—লেখাপড়া?

—হ্যাঁ, সেদিকে ঠিক আছে; বি, এ,তে তৃতীয় হয়েছে এবার! ওর দাদা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের জুয়েল! বিদ্যার চর্চ্চা অবিবত বাড়ীতে হয় তাদের। এবং সে-বিদ্যা পৃথিবীর দর্শন-উপনিষদ থেকে আধুনিক রাষ্ট্রীয় অনুশাসন বা অর্থবিজ্ঞান অথবা পদার্থবিদ্যা কিছুই বাদ যায় না—বর্ত্তমান যুগের সব কিছুই ওদের আয়ত্তে।

—তাহলে গোঁড়ামী কোথায়?

—বাইরে! ঐ লক্ষ্মীকে আপনি কোনো রেষ্টুরেণ্টে ঢুকোতে পারবেন না—ও যাবে না। বলবে "ওগুলো খেলে পাপ হয়।" সিনেমায় যদি যায় তো জেনে যায় গল্পটায় অভদ্র কিছু আছে কিনা। যদি গিযে দেখে সেরকম কিছু যা ওদের মতে সতী-ধর্ম্মের বাইরে তাহলে তৎক্ষণাৎ ফিরে যাবে।

—ও, এমন গোঁড়া!

—হ্যাঁ—আমি একদিন বলে ফেলেছিলাম শ্রীকৃষ্ণের যৌবনের চরিত্র ভাল নয়। তাতে আমার সঙ্গে পনর দিন কথা বললো না। পরে মার্জনা চাইলে বললো—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"—তাঁর চরিত্র নিয়ে আলোচনা করবার কি অধিকার আপনার আছে জানান—আমি ভয়ে ভয়ে বললাম 'না কিছু নেই' তাতে রেগে গিয়ে বললো, ভীরু কাপুরুষ! পালাচ্ছেন কেন তর্ক থেকে? আসুন যুদ্ধং দেহি—বলে আরম্ভ করলো শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের ব্যাখ্যা। সত্যি বলছি বাবা, আমি তার ব্যাখ্যার বিন্দুবিসর্গও বুঝি নি।—হাসছে নীলু কথা বলতে বলতে।

—ওঃ, তাহলে তো মুস্কিল।

—হ্যাঁ বাবা—লক্ষ্মী অতিশয় ভাল মেয়ে। কিন্তু তাকে বিয়ে করবার মত কোন যোগ্যতাই আমার নেই। ঐ পরিবারটি এই পৃথিবীর মানুষই নন।

—তাহলে কি করবো? যাব না দেখতে?

—যান—না গেলে উনি দুঃখিত হবেন। গিয়ে দেখে তো আসুন। কথা কিছু দেবেন না—বলবেন ছেলের মত দরকার।

নীলু বেরিয়ে গেল। অসিতবাবু এলেন অধ্যাপক চক্রবর্তীর বাড়ী। সাদরে অভ্যর্থিত হলেন। কয়েক মিনিট পরেই লক্ষ্মী এসে প্রণাম করলো তাঁকে কয়েকটি সাদা সুন্দর ফুল দিয়ে। অসিত বাবু দেখলেন—মাতা লক্ষ্মীর মূর্ত্ত রূপ যেন। অপরূপ মেয়ে, রঙ, গঠন এবং চলাফেরা সবই সুন্দর। এ মেয়েকে আগে কেন তিনি দেখেন নি! শুধালেন,—তোমাকে আমার ঘরের লক্ষ্মী করে নিয়ে যেতে চাই মা, অমত করবে না তো?

—আমার মত-অমতের কোন মূল্য নেই—আমার বাবার মতই যথেষ্ট। তিনি আমাকে যেখানে দেবেন যার হাতে দেবেন তারই সঙ্গে যাব আমি।

—এ তোমারই যোগ্য কথা মা—ভাল, তাঁর সঙ্গেই কথা কইব আমি।

—চা তো আপনি খেয়ে এসেছেন। এখন আপনাকে নাড়ু খাওয়াবো।

—নাড়ু?

—হ্যাঁ—খৈ-এর নাড়ু—আমি বাড়ীতে তৈরী করি ঠাকুরের জন্য। আনছি।

চলে গেল লক্ষ্মী। অধ্যাপক মৃদু হাসিমুখে বসেছিলেন। অসিতবাবু বললেন—ঘর আলোকরা মেয়ে আপনার। যদি ওকে

নিয়ে যেতে পারি তো আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো। কিন্তু একটা কথা আছে।

—বলুন।

—এ মেয়ে যেভাবে মানুষ হয়েছে মার স্নেহচ্ছায়ায়, বাপের আদরে, ভাইএর স্নেহমমতায়, সকলের উপর আপনার পারিবারিক সংস্কৃতির আওতায়—আমার নীলু তো তা হতে পায় নি। ওরা কি পরস্পরকে ঠিকমত মেনে নেবে?

—আমার মেয়ের দিক থেকে বলতে পারি নিজেকে যে-কোন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তার আছে। সুতরাং আপনার ছেলের দিকটা ভাবা দরকার। তার বর্ত্তমান চলাফেরার খবর জানি না।

—জানুন, তারপর আমরা কথা পাকা করবো। কথা অবশ্য পাকাই হয়ে রইল তবে ওরা যাতে সুখী হয় তাতো দেখতে হবে।

—নিশ্চয়। এ বিষয়ে আমার ছেলেই ভাল খবর বলতে পারবে; তার মত হলে নীলুর হাতেই লক্ষ্মীকে দেবো—আপনার কথাটাও তাকে জানাব আমি!

লক্ষ্মী নাড়ু নিয়ে এল—নারিকেল নাড়ু খৈ-নাড়ু এবং আরো কিযেন নাড়ু—চিড়ে বা ঐ রকম কিছু এবং তিলের নাড়ু—বললো,

—সবগুলোই খেতে হবে।

—আচ্ছা—দেখি কতগুলো খাওয়া যায়। এ সব কে করেছে মা? তুমি?

—মা দেখিয়ে দেন—আমি তৈরী করি—কোন ঝি চাকরকে ছুঁতে দেওয়া হয় না। ঠাকুরের ভোগ হয় ওতে, তাই।

অধ্যাপক বললেন,

—একটা গান ওঁকে শুনিয়ে দে মা।

লক্ষ্মী একটা যন্ত্র নিয়ে একখানি কীর্ত্তন গাইলো; সুন্দর গলা।

চমৎকার গায়। যার সুন্দর হয় তার সবই সুন্দর হয়। গানটা বহু দিনের পুরোনো গান—পদাবলীর গান। দীর্ঘকাল পরে শুনে খুব তৃপ্তি পেলেন অসিতবাবু। শেষ হলে বললেন—

—তোকে নিয়ে যাওয়া ভাগ্যের কথা মা—যদি তোদের পরস্পর মত বিনিময় হয় তো আমাদের কোন অসুবিধা হবেনা'। তোরা লেখাপড়া শেখা ছেলে-মেয়ে—ঠিক করে জানাবি।

লক্ষ্মী কিছু বললো না। অসিতবাবুকে প্রণাম করলো আবার। অর্থাৎ তার মতটা দিল। কিন্তু অসিতবাবু ভাবতে লাগলেন—নীরাকে কি বলবেন তিনি? নীরাই-বা কি বলবে? যতদূর বুঝেছেন—নীলুব এখানে বিয়ে করতে মত নেই। কারণ লক্ষ্মীর আর যত গুণই থাক সে গোঁড়া। কিন্তু কৈ—গোঁড়ামীতো কিছু দেখলেন না অসিতবাবু। প্রাচীনপন্থী এরা কিন্তু তাতে কি? তিলের নাড়ু খেলেই মানুষ অমানুষ হয়ে যায় না। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি যুগযুগান্ত পূজিত হয়ে আসছেন—ঋষি মুনি যোগী সিদ্ধগণ যাঁকে শ্রীভগবান বলেছেন—'তনি চরিত্রহীন একথা উচ্চারণ করা পাপ—লক্ষ্মীর দিকটাই সমর্থন করলেন অসিতবাবু। ফেরার পথে ভাবলেন, লক্ষ্মীকেই তিনি বরণ করে ঘরে তুলবেন। নীলুর মা নেই। থাকলে আজ এতখানি অসুবিধা তাঁকে পোহাতে হোত না। পত্নীর জন্য গভীর দুঃখ জাগলো তাঁর অনেকদিন পরে। কিন্তু উপায় কি! নীলুর বিয়ে দিয়ে বাড়ীতে তিনি নারীর অমৃতস্পর্শ ঘটাবেন যার অভাবে সবই শূন্য—সবই শুকনো মনে হয়।

পরদিন শুনলেন—নীলু ক্লাবে জানিয়ে গেছে তারা ইলোরা অজন্তাগুহা দেখতে যাচ্ছে। ফিরতে চার-পাঁচ দিন দেরী হবে। হয়তো বেশীও হতে পারে। পত্র দিয়ে জানাবে নীলু।

এইটুকু সময়ের মধ্যে অজন্তা দেখতে যাবার কথা কখন ঠিক হোল বুঝতে পারলেন না। হয়তো আগেই ঠিক হয়েছে। কিন্তু

কথাটা নীলু নিজে তাঁকে জানালো না কেন ?

—না—উপায় নাই। লক্ষ্মীকে তিনি আনতে পারবেন না। নীরাই আসবে। আসুক।

তবু একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো অসিতবাবুর বুক থেকে।

চায়ের আসরে নীরা শুনে এসেছে কোন এক অধ্যাপক নীলুর বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তাঁর এক মেয়ে আছে। নীরার বুঝতে দেরী হোল না যে অধ্যাপক মহাশয় কন্যাটিকে পার করবার জন্যই আসবেন নীলুর বাবার কাছে। নিশ্চয় কন্যাটি বিবাহযোগ্যা। কিন্তু তখন নীরার মুখের ভাবটা অপ্রসন্ন হলেও সে সামলে নিয়ে নীলুকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লো। পথে এসেই প্রশ্ন করলো,

—সেই অধ্যাপকের মেয়েটি কেমন ? চলবে ?

—মেয়ে অবশ্য ভালই। কারণ আমি কোন মেয়ের নিন্দা করি না। তবে আমার চলবে না। সে শুধু গোঁড়া নয়—গোঁরা অর্থাৎ যুদ্ধবাজ মেয়ে।

—সেকি! কার সঙ্গে যুদ্ধ করে ?

—সকলের সঙ্গেই! তার বিদ্যা অগাধ। বুদ্ধি ক্ষুরধার—চেহারাও তোমার থেকে ভাল না হোক খারাপ নয়—কিছু মনে করো না নীরা—বরং ভাল তোমার থেকে তার রূপ—যদিও সেই রূপ সে তোমাদের মত মেজেঘষে চক্‌চকে করে না—তবু ওকে আমার চলবে না। কারণ তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত ক্ষমতা আমার নেই। অর্থাৎ ওর বিদ্যার সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে

পারব না। ওর সঙ্গে তুলনা হয় কালিদাসের গল্পের সেই মেয়ের—যে তাকে পরাস্ত করবে তাকেই সে বিয়ে করবে।

—হ্যাঁ, কিন্তু আমার থেকে সে সুন্দর—কথাটা আমার মুখের উপরেই বললে তুমি?

—বললাম। তোমার রূপের গর্ব খানিকটা ক্ষয় হোক। মনে রেখো পৃথিবীতে তুমি একাই বিম্ববতী নও। আরো আছে। অজন্তায় আছে, ইলোরায় আছে, আমাদের দেশের অন্তঃপুরেও আছে সজীব সচল অনেক বিম্ববতী। দেখতে চাও তো চল, দেখিয়ে আনি।

—কোথায়? অজন্তায়!

—ওরে বাপ্?—অজন্তা কি এখানে? আমি লক্ষ্মীকে দেখার কথা বলছিলাম।

—না, তাকে দেখার কোন দরকার নেই আমার। সে বিম্ববতী আছে—থাক। চল—অজন্তাগুহা দেখে আসি। জীবনের একটা বড় সাধ মিটিয়ে দাও।

—বড় সাধ?

—হ্যাঁ—আমার বাবা ছিলেন শিল্পী। অজন্তার বহু ছবি তিনি রেখেছেন বাড়ীতে। কিন্তু সেগুলো তো ফটো, মূল ছবি দেখবার খুব ইচ্ছে আছে আমার।

—চল—ক্লাবে কথাটা পাড়া যাক।

ক্লাবে এসে কথাটা পাড়লো মীরা। প্রায় সকলেই এখানে ধনীর পুত্র-কন্যা। সমস্বরে সকলেই বললো,

—ভাল কথা। চল যাওয়া যাক—

তৎক্ষণাৎ গাড়ী রিজার্ভের ব্যবস্থা হোল এবং ঠিক হোল পরদিন সকালেই রওনা হবে ওরা। দেরী করবার সময় নাই—কারণ মালতী-মাধব নাটকের অভিনয়ের দিন এগিয়ে আসছে। তার

আগেই ওরা অজন্তাগুহা দেখে আসবে। পরে গেলেও হবে বললো কয়েক জন কিন্তু নীরা জেদ নিল—কালই যাওয়া হোক।

পরদিনই ওরা রওনা হয়ে গেল। নীলু কথাটা বাবাকে জানাবার সময় পায় নি। তাই ক্লাবের কেরাণীকে বলে এসেছে বাবাকে যেন তিনি জানিয়ে দেন। কেরাণী অসিতবাবুকে জানিয়েছে যথাকালে।

ভারতীয় শিল্পকলার সুপ্রাচীন এই নিদর্শনভূমিতে এসে পৌঁছাল ওরা। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে—তাই দলবদ্ধ হয়ে দেখে বেড়াচ্ছে। দেখতে আসে বহু ব্যক্তি বহু বিদেশী—যত দেখে ততই ভাল লাগে। নীরা খুবই আনন্দ পাচ্ছে। ওখানেই নীরার আলাপ হোল একজন শিল্পীর সঙ্গে; শিল্পী বিদেশী—বেড়াতে এসেছে—নাম সানিসিকো। কোন দেশী লোক, বোঝা যায় না।

মনে হয় বর্ণসঙ্কর—মিশ্রজাতি। যাই হোক মিঃ সিকো একজন নামকরা শিল্পী এবং অতিশয় ধনী ব্যক্তি। বয়স বছর ত্রিশ—সুন্দর চেহারা—সুন্দর পোষাক এবং সুন্দর তার কথা বলার ভঙ্গী। অবশ্য বাংলা সে জানে না—কিন্তু ইংরাজি খুব ভাল জানে তাই ভাষার জন্য কিছু আটকালো না। নীরা তার সঙ্গে ভালই আলাপ জমিয়ে ফেললো। তার সঙ্গে ছবির পরিপ্রেক্ষিতের নানা আলোচনা করলো এবং তাকে কলকাতায় আসবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে সদলবলে ওরা ফিরলো সাতদিন পরে।

নীরা কিছু বেশী আলাপ জমিয়েছে মিঃ সানিসিকোর সঙ্গে। মিঃ সিকোকে তার ভাল লেগেছে। সে ভাল শিল্পী, সুন্দর এবং ধনী। জাতিতে সে যাই হোক, তার মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যকে

ভালবাসার আগ্রহও লক্ষ্য করেছে নীরা। তাই তাকে বার বার নিমন্ত্রণ জানালো নীরা তাদের অভিনয় দেখতে আসার জন্য।

মাঝে মাত্র কয়েকটা দিন। রিহারশেল জোর চলছে। নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে। প্রখ্যাত ক্লাবের সুনাম যাতে বজায় থাকে তার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটিই করা হবে না। বহু ব্যক্তিই নিমন্ত্রিত হলেন—অধ্যাপক শিবরামও সপরিবারে নিমন্ত্রিত হলেন। এই নিমন্ত্রণ পাঠালো নীলু আর নীরা। নীরার ইচ্ছে, লক্ষ্মীকে দেখবে এবং লক্ষ্মীও দেখে যাবে যে নীলুকে লাভ করার আশা তার নেই। নীরা তাকে আঁচলে বেঁধে ফেলেছে। নীলু তবু প্রশ্ন করলো.

—অধ্যাপক শিবরামকে কেন নিমন্ত্রণ করতে চাও তুমি?

—তোমার শুভানুধ্যায়ী আর শিক্ষাগুরু হিসাবে।

—তিনি নিশ্চয় আসবেন না। তবে তাঁর বদলে মেয়ে বা ছেলে আসতে পারে।

—তাতেই হবে। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিও।

যথাদিনে মহা সমারোহে অভিনয় আরম্ভ হবে। লক্ষ্মী তার দাদার সঙ্গে এসেছে দেখতে অভিনয়। নীলু আলাপ করিয়ে দিল নীরার সঙ্গে লক্ষ্মীর। দেখলো নীরা তাকে, হ্যাঁ রূপসী সত্যি—কিন্তু এ হচ্ছে নিস্তরঙ্গ সাগর—গভীর যতই হোক—ওর নীল বুকে নেই উত্তাল তরঙ্গ—নেই চঞ্চল মাধুরী, নেই উদ্দাম নর্তন। তার থেকে উপসাগর ভাল—তার অফুরন্ত উচ্ছ্বাস, উদ্বেল তরঙ্গ কলকল হাস্য—মধুর—মধুময়। কি হবে ঐ প্রশান্ত মহাসাগর নিয়ে? ওর কূলে কড়ি-ঝিনুকও পাওয়া যাবে না। থাকতে পারে অনন্ত রত্ন কিন্তু ভোগ্য হয়না সে রত্ন কারও।

নীরাকে দেখে লক্ষ্মী কি কিছুই ভাবলো না? সে দেখলো নীরাকে। দেখলো তার অভিনয় এবং নীলুরও অভিনয়। ফেরার

পথে ওর দাদা শুধোলো,

—অভিনয় কেমন লাগলো লক্ষ্মী ?

—ভাল। মাধবের অভিনয় খুবই ভাল হয়েছে দাদা।

—কেন ? মালতীরও তো অভিনয় খারাপ হয় নি।

—না খারাপ নয়—তবু যেন কেমন মেকী লাগলো ; মাধব কিন্তু খাঁটি মাধব।

—তুই নীলুর দিকটা বেশী দরদ দিয়ে দেখছিস।

—মোটেই না দাদা বরং কঠোব সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখছি। নীলুদা গেছে—অতলে তলিয়ে গেছে। ওকে আর তোলা যাবে না দাদা।

—সেকি রে। আমরা তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দেব ঠিক করেছি।

—না দাদা—না—ওকে ছেড়ে দাও। তোমার বোনের বিয়ের জন্য এখন আর কোনো চেষ্টা করো না।

—কেন ?

—হ্যাঁ—

—তোব মনে কোন কষ্ট হবে না ?

উত্তর দিল না লক্ষ্মী।

সুনীল লক্ষ্য করছে লক্ষ্মী যেন কাঁদছে।

লক্ষ্মী অনেকক্ষণ পরে বললো, ওখানে পুরুষ নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে দাদা। কে কটাকে পাকড়াতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। নীলুদা পা পিছলে ওখানে পড়ে গেছে—আর উপায় নাই—ওকে কচ্ছপে কামড়েছে। ছাড়বে না।

—মেঘ যদি ডাকে ?

—তাহলে ফল খারাপই হবে। কচ্ছপের কামড় সারে না সহজে। ঘা হয়।

দু'ভাইবোনে বাড়ী ফিরলো। দাদা এসেই বাবাকে জানিয়ে

দিল—লক্ষ্মীর সঙ্গে নীলুর বিয়ে হবে না। অন্য পাত্র দেখা হোক—।

ডাঃ শিবরাম কিছুটা আশ্চর্য্য হয়ে শুনলেন। শুধালেন,—কেন রে? ছেলে তো আমার খুব জানা।

—জানার পরেও জানবার আছে বাবা—মানব-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, আপনার কাছেই শুনেছি। ও থাক—লক্ষ্মীর জন্য অন্য চেষ্টা করা হবে।

—থাক—

শিবরামবাবু দুঃখের সঙ্গেই বললেন কথাগুলো। কিন্তু তিনি ভাবলেন নিশ্চয় তাঁর বুদ্ধিমান ছেলে-মেয়ে এমন কিছু দেখে এসেছে যার জন্য তারা এ কথা বললো। অতএব এ নিয়ে আর ভাববার কিছু নাই। লক্ষ্মীর জন্য পাত্রের অভাব হবেনা। আর একটি ছাত্রের কথা তাঁর মনে পড়লো। হিমাদ্রি তার নাম। ভাল ছেলে, ঘরও ভাল—তাকেই দেখবেন।

শুয়ে শুয়ে লক্ষ্মী ভাবছে তার ভাগ্য ভাল যে অভিনয় দেখতে গিয়েছিল সে। নীরাকে দেখেই তার মনে হয়েছিল এ মেয়ে পুরুষকে জয় করবার জন্যই জন্মেছে। বিশ্বের সকল পুরুষই ওর আঁচলে বাঁধা পড়বে। ও সেই 'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূর' জাত। ওরা সহধর্মিণী নয় সহ-চারিণী। লক্ষ্মী প্রতিযোগিতায় নামলে হয়তো নীরাকে হটিয়ে দিতে পারে—কিন্তু সে তা করবেনা। কারণ নীলুর উপর তার কোন অধিকার নেই। কারো উপরেই তার অধিকার নেই। যতক্ষণ সে বিবাহিতা না হবে ততক্ষণ কোন পুরুষের প্রতি আকর্ষিত হওয়াকে লক্ষ্মী নারী-ধর্ম্মের বিরুদ্ধা-

চার বলে মনে করে। অন্তরে অসতী সে হতে চায় না। কায়িক সতীধর্ম্মের চেয়ে অন্তরের সতীধর্ম্মের উপর ওর ভক্তি বেশী। তাই সে নিজেকে কঠিনভাবে রক্ষা করে এসেছে এতদিন। সে তার অন্তর খালি রাখবে তার জন্য যিনি আসবেন তার বরবেশে। তাঁকে নিয়ে একটি মধুব স্বপ্নের জীবন যাপন করবে লক্ষ্মী। অপরের-প্রেমে-পড়া মোহগ্রস্থ পুরুষকে লক্ষ্মী কৃপার চক্ষে দেখে—নীলুকেও তাই দেখবে। আজ দেখলো, নীলু নীরার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। নীলুর অভিনয় তাই সত্য হয়ে উঠেছে—কিন্তু জীবন অভিনয় নয়, আলেয়া নয়—জীবন সুস্থ সুন্দর অভিরাম আনন্দ-নিকেতন। লক্ষ্মী সেই নিকেতনে প্রবেশ করবে এমন কোন পুরুষের হাত ধরে যে ঠিক তারই মত অন্তরের আসন শূন্য রেখেছে লক্ষীরই জন্য। অতএব নীলুকে সে বাতিল করে দিতে চায় এই মুহূর্ত্তে।

প্রতিযোগিতায় নেমে নীলুকে গ্রহণ করা হয়তো কঠিন হোত না তার পক্ষে—কারণ মাধুর্য তার কম নেই। রূপ যৌবন, আভি-জাত্য—বিদ্যাবুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণপনায় সে কিছু কম নয়—ইচ্ছা করলে অনায়াসে নীরাকে হঠিয়ে দিয়ে অসিতবাবুর অন্তঃপুরে ঢুকতে পারে—কারণ স্বয়ং অসিতবাবু তার সহায়। তবু লক্ষ্মী তা করবে না। কেন করবে না ভাবতে গিয়ে লক্ষীর চোখ জলে ভরে এল। অভিমানের যে শক্ত বাঁধটা লক্ষী দিচ্ছিল মনের মধ্যে সেটা ভেঙে চূরে অজস্র জল ঢুকে পড়লো বুকের মধ্যে। কাঁদছে লক্ষী—অভিমানটা ভেঙে চূরমার হয়ে গেল।

নীরাকে আগে থেকেই চেনে লক্ষী—কলেজের চেনা। উইমেনস কলেজে পড়েছে দুজনেই। লক্ষী জানে—তার বাড়ী বৌবাজার অঞ্চলে—অতি দীন অবস্থার মেয়ে। বাবা ছিলেন শিল্পী—কিন্তু মা তার কোথাকার মেয়ে কেউ জানে না। হয়তো

হাফ্ গেরস্থ—হয়তো বা অন্য কোন রকম কিছু।

লক্ষী কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ভাবলো—নীলুকে বাঁচানো উচিত তাব—কারণ নীলু তাদেব আত্মীয়ের পর্য্যাযে পড়ে। সে নিজে নীলুকে লাভ করতে না পাবলেও—নীলুর অকল্যাণ হতে দেওয়া উচিত হবে না।

কিন্তু কি করে নীলুকে সে বক্ষা করবে?—এ চিন্তার শেষ নাই। যে নীলুকে সে নিশ্চিত পাবে বলে এতদিন ধারণা করেছিল তা থেকে বঞ্চনাব বেদনাটা ওকে এমন এক অসহায় অবস্থায় এনে দিল যে লক্ষী কিছুই ভাবতে পারছে না। দুঃখ-রাগ-অভিমান কে জানে কি!

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল সানিশিকো। যথাদিনে সে এসে কলকাতায় উঠলো একটা বিখ্যাত হোটেলে। টাকার তার অভাব নেই; যথেষ্ট ধনী ব্যক্তি সে। যথাসময়ে গেল 'সুন্দরম্' ক্লাবে অভিনয় দেখতে। 'মালতী মাধবের' গল্পটা নীরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল মিঃ শিকোকে। সুতরাং অভিনয় দেখতে এবং বুঝতে তার কোন অসুবিধা হয়নি—দেখলো এবং খুসী হোল।

শিল্পীর মন তার। দক্ষিণ ভারত ঘুবে এসেছে। এখন উত্তর ভারত ঘুরবে—তার জন্য ব্যবস্থা করছে। ট্রেনে ঘুরবে নাকি প্লেনে ঘুরবে অথবা একখানা মোটরগাড়ী কিনে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে ভাবছে। নিজের গাড়ী থাকলে ঘুরে বেড়াবার সুবিধা হয়। তাছাড়া সে কলকাতায় এসে জানতে পারলো যে এখানেই এদেশের বৃহত্তম রাজপথ ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত থেকে উত্তর-পশ্চিম দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এই পথে নিজস্ব মোটরে ঘোরার মত আনন্দ

আর নেই। তাছাড়া—উত্তর ভারতের বিশেষ দ্রষ্টব্য দিল্লী আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন গয়া কাশী সবই এই পথ দিয়ে গেলে পাওয়া যায়। তাই মিঃ শিকো একখানা মোটর গাড়ীর জন্য ব্যবস্থা করছে। তার পরামর্শদাত্রী নীরা—তারই অনুরোধে এবং আগ্রহে এটা করছিল মিঃ সানিশিকো!

নীরা প্রায় নিত্যই যায় তার হোটেলে কিন্তু যায় অত্যন্ত গোপনে! নীলু জানেই না যে সানিশিকো কলকাতায় এসেছে। অভিনয়ের দিন নীরা মিঃ শিকোকে এমন একটা আসনে বসিয়ে দিল যেখান থেকে তাকে অন্য কেউ দেখবেই না। তা ছাড়া নীলু ব্যস্ত ছিল নিজের অভিনয় নিয়ে। লক্ষ্মী আর তার দাদারও তদ্বির তাকে করতে হয়েছে। তাই মিঃ শিকো সম্বন্ধে কিছুই সে জানতো না। এতটা গোপনতার আশ্রয় কেন নিল নীরা জানা দরকার। নীরার অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু না জানলে সবটুকু জানা যাবে না।

অসিতবাবুকে নীরা সেদিন যা বলেছে তার প্রায় অনেকটাই বানানো—সত্য ব্যাপারটা নীরা বলতে চায়নি অসিতবাবুকে—এমন কি তার বাবার নামটাও ঠিকমত বলেনি। সে তখনো বুঝতে পারেনি যে অসিতবাবু তাকেই পুত্রবধূ করবার জন্য মনোনীত করতে চান।

নীরার মা রীনা ছিল সাধারণ নর্ত্তকী। বাইজীর কাজ করে বেশ কিছু রোজগার করতো সে; সময় সময় ছোটখাট অভিনয়েও যোগদান করে কিছু আয়-উপায় করতো ভাড়াটে অভিনেত্রী হয়ে। এমনি একটা অভিনয়ের মাধ্যমে নীরার বাবা অতুলের সঙ্গে তার আলাপ হয়। অতুল ধনী না হলেও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে—একা। ঠাকুমা ছাড়া বাড়ীতে তার আর কেউ নেই। রীনাকে সে পছন্দ করলো এবং বাড়ী নিয়ে এল ঠাকুরমার সহস্র আপত্তি

অগ্রাহ্য করে। পাড়ার লোকে জানে খবরটা। অতুল ছিল ভাল শিল্পী—তাছাড়া ঘড়ি মেরামৎ এবং ছোটখাট মিস্ত্রীর কাজও সে জানতো। রেডিও মিস্ত্রির কাজ শিখে সে একটা রেডিওর কারখানাই করেছিল তার বাড়ীর নীচেতলায়।

ঠাকুমা ইতিমধ্যে দেহ রেখেছে। অতুল ভালই রোজগার করে। রীনার গর্ভে তার দুটি মেয়ে আর একটি ছেলেও হোলো। কিন্তু—

নীচেতলায় রেডিও কারখানা তার—সেখানে তিন চার জন মিস্ত্রি কাজ করে। ট্রানজিষ্টার রেডিও তৈরী করে বিক্রী করে অতুল। নবীন নামে একটি ছেলে কাজ করে ঐ কারখানায়। নবীন দেখতে খুব সুন্দর—কাজও ভাল শিখেছে। বয়স বছর পঁচিশ মাত্র।

রীনা ঐ নবীনকে অতিশয় স্নেহ করে। কেন যে করে কেউ জানেনা। জানবার চেষ্টাও কেউ করে নি। স্নেহ করে—ভালই। অতুল তার কোন খবর রাখে না। তার ইচ্ছা সুন্দরী কন্যা নীরাকে সকলরকমে শিক্ষিতা করে তুলবে এবং সুন্দর শিক্ষিত কোন ধনীর ছেলের হাতে সমর্পণ করবে। মেয়ে তার যথেষ্ট যোগ্য হচ্ছে।

নীরা সে-বছর স্কুলফাইন্যাল পাশ করলো। অতুল তার জন্য গানের মাষ্টার রেখেছে, নাচ শেখাবার ব্যবস্থা করেছে এবং পড়াবার জন্য আলাদা টিউটার রেখে দিয়েছে। অর্থাৎ নীরাকে সুশিক্ষিতা করে গড়ে তোলবার জন্য কোন ত্রুটিই অতুল রাখেনি।

কিন্তু রীনার ইচ্ছে—নীরা ষোল বছরের হোল—এবার তার বিয়ে দেওয়া হোক—এবং ঐ নবীনের সঙ্গেই দেওয়া হোক। অতুল ঘোরতর আপত্তি করলো। কোথাকার ঐ মূর্খটাকে জামাই করবে অতুল। না আছে বাপ-মা, না-বা ঘরবাড়ী, জাতজন্মের ঠিক নাই—ওর হাতে মেয়ে দেবে সে? না—অতুল বললো—

'—একথা আবার বলো তো তোমাকে বাড়ী থেকে বের করে দেব।' রীনা কথাটা আর বললো না। কিন্তু নীরাকে কলেজে পৌঁছানো—তাকে আনা এবং প্রতি শনিবার সিনেমায় পাঠানো বা বেড়াতে পাঠানো চলতে লাগলো নবীনের সঙ্গেই অবশ্য রীনার সমর্থনে। নবীনের আর কোন গুণ না থাক—সে সুন্দর চেহারার মালিক, দুঃসাহসী ও নষ্ট-চরিত্র।

অতএব যা হবার তাই হলো। একদিন কলেজ থেকে নীরা আর বাড়ী ফিরলো না।

নবীনও ফেরেনি। বোঝা গেল ব্যাপারটা। অতুল শুনলো—রাগে দুঃখে ঘরের ভেতর ঢুকে সে শুধু বললো,

—চরিত্রহীনাকে ঘরের বৌ করেছি—তারই শাস্তি।

সারারাত সে বেরুল না। রীনাও খোঁজ করে নি। ভেবেছিল রাগ পড়ে গেলে আপনিই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু অতুল আর জীবিত বেরুলোনা—বেরুলো তার মৃতদেহ। গলায় দড়ি দেওয়া লাসটা পুলিশ বের করলো। রীনা দেখলো, ভাবলো আহাম্মক আর কাকে বলে! কি এর দরকার ছিল? ওদের বিয়ে দিলেই তো চুকে যেতো।

চুকে গেল সবই। কারণ অতুল আত্মহত্যার কথা লিখে গেছে। কাউকেই দায়ী করে নি, অতএব অন্য কেউ দায়ী হোল না। সরকার ময়না তদন্ত করে 'আত্মহত্যা' বলে ছেড়ে দিলেন।

রীনাই চক্রান্ত করে নীরাকে নবীনের সঙ্গে পাঠিয়েছিল। তার ধারণা ছিল—অতুল বাধ্য হয়ে নীরার সঙ্গে নবীনের বিয়ে দেবে যখন সে শুনবে ওরা পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু তা হোল না—হোল অন্য রকম। নিরুপায় রীনা খবর দিল নীরা আর নবীনকে মাসখানেক পরে। তারা যেন ফিরে আসে। নীরা ফিরে এল—নবীন এল না।

—নবীন এলো না কেন রে ?—প্রশ্ন করলো বীনা।

—জানি না—সে বললো আমি পরে যাব—বলে আমাকে মেল ট্রেনে তুলে দিয়ে চলে গেল। কে জানে কোথায় কি কবছে !

—সে কি ! তোকে সে ভালবাসে।

—কচু ! ব্যাটাছেলের আবার ভালবাসা ! তোমার কথা শুনে অমন বাবাকে হারালাম—বলার সঙ্গে কাঁদলো নীরা। রীনা ধমক দিয়ে বললো,

—চুপ কর—কাঁদবার কি হয়েছে ? নবীন নিশ্চয় ফিরবে। দেখে নিস আমাব কথা।

—তোমার কথায় কুকুরে·····বলে নীরা চলে গেল। সে বুঝলো তার মার এমন কোন একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে নবীনের দিকে যাব জন্য এতটা ঘটিয়েও মা কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। রীনার পূর্ব জীবনের কথা কিছু কিছু জানে নীরা। ভাবলো নবীন নিশ্চয়ই মার আগের জীবনের বিশেষ কেউ। নইলে এমনটা করবে কেন ? বোনের ছেলে অথবা বিশেষ কারো ছেলে। রীনা যে-ধাতুতে গড়া মেয়ে তাতে তার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়। নীরা খানিকটা লেখাপড়া শিখেছে। সে সামলে গেল এবং আবার কলেজে আসতে লাগলো।

অতুলের অভাবে রেডিও-কারখানা চালানো আর সম্ভব হোল না। রীনা কারখানার তৈরী মাল আর বাকী যন্ত্রপাতি সব বাজারের এক কারবারিকে বিক্রী করে ঘর তিনখানি খালি করিয়ে এক বিশিষ্ট ভদ্রলোককে ভাড়া দিল। সেলামী বাবদ এবং তিনমাসের ভাড়া জমা বাবদ কিছু টাকা নিল।

ভাড়াটে লোকটি বয়স্ক—তিনটি ছেলে-মেয়ে তাঁর। বড় ছেলে চাকরী [illegible]র, ছোট পড়ে। সব ছোট মেয়েটি, বয়স মাত্র বার। তাঁ[illegible]সী দেবীই সংসার দেখেন। বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ

আনবেন—ঠিক করেছেন। রীনা চেষ্টা করলো নীরাকে যদি গছানো যায়। কিন্তু না—হোলো না। কারণ নীরাই রাজি হোল না। বললো,

—না, তিনি যে মাইনে পান তাতে তাঁর নিজেরই চলে না। ওঁকে বিয়ে করে খাবো কি ? শ' তুই মোটে মাইনে।

রীনা থেমে গেল। সে আর নিজে কিছু কবতে চায না। এই সময় নীরা বি, এ, পাশ কবলো এবং 'সুন্দরম্ মজলিস' ক্লাবে যোগ দিল। এ একটা চান্স। ওখানে নীলুর সঙ্গে আলাপ, তার বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ইত্যাদি যা-কিছু, নীরা জানিয়েছে তার মাকে। শুনে মা তার খুব খুসী। বেশ বড়লোকের ছেলেকে পাকড়েছে নীরা।

নীলুকে একদিন দেখতেও চেয়েছিল রীনা। কিন্তু নীরা বললো—

—তোমার বাড়ীতে ওর জুতো রাখবার যায়গা হবে না মা, বুঝলে ?

—হ্যাঁ—কিন্তু বিয়ে হলে তো এখানে আসতে হবে তাকে।

—না—এপাড়ায় তাকে আনা হবে না—কারণ পাড়ার সবাই জানে—তুমি কোথা থেকে এসেছ। বিয়ে যদি হয় তো ওদেরই বাড়ী আছে পার্ক ষ্ট্রিটে—সেখানেই গিয়ে হবে।

—সে-সব কথা কি ঠিক করেছিস ?

—সবুর কর—ওর বাবা বলেছেন একদিন এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন ; সেইটাই ভাবছিলাম আমি। যদি আসেন তো কি যে হবে কে জানে !

—কি আবার হবে ? পাড়ার কেউ কিছু বলবে না।

—কে জানে—বলতে কতক্ষণ। তিনি তো [illegible] রে করতেই আসবেন এখানে।

—না-না—ওসব বহু দিন চুকে গেছে। এখন আমরা ভদ্র-গৃহস্থ।

—কচু! এপাড়ায় সবাই জানে, আমরা হাফ-গেরস্থ।

কথাটা ভাববার মত। কিন্তু রীনা খুব বেশী ভাবলো না। পুরুষের মনের মোহ সম্বন্ধে তাব অভিজ্ঞতা প্রচুর। সে ধরে নিল ধনীর ছেলে নীলু যখন নীরাকে ভালবেসেছে তখন সে নীরাকে নেবেই—বিয়ে সে কববেই। অতএব ভাবনার কিছু নেই। রীনা শুধু মেয়েকে সাবধান করে দিল যেন বিয়ের আগে দেহদান না করে।

এব মধ্যে একদিন খবর এসে গেল লক্ষী সম্বন্ধে। রীনা এখন একটু চিন্তিত হোল। কিন্তু নীরা জানালো—এ বিষয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই। লক্ষ্মী যতই ভাল মেয়ে হোক—নীলু তাকে বিয়ে করবে না—কারণ নীলু খুব পার্থিব লোক। লক্ষ্মা কেমন যেন অপাথিব—দেবী-ভাবাপন্ন মেয়ে।

এব পরে এল সানিসিকোর খবর। স্বয়ং সানিসিকো এলো অতুলের হাতের শিল্প-কাজ দেখবার জন্য। দেখলো এবং খুসী হোল। নীবা তাকে গান শোনালো—নাচ দেখালো এবং নানা খাদ্য খাইয়ে বাংলার বিপুল ঐতিহ্যেব পূর্ণ পরিচয় দিয়ে মুগ্ধ করলো। মিঃ সিকো যেন স্বর্গ পেয়ে গেল এই নগণ্য গলির দোতালা বাড়ীর কামরায়। এর কদিন পরেই নতুন গাড়ী চড়ে নীরা আর সিকো বেরিয়ে পড়লো উত্তর ভারত দেখতে। এই ব্যাপারগুলোর কিছুই নীলু জানলো না।

চা-বাগানে চাকরী করতো উৎপলার স্বামী। ভালই মাইনে পেতো; কিন্তু বিধি বাম—ওকে কালাজ্বরে ধরলো এবং বছরখানেক ভুগিয়ে নিয়ে গেল কোন লোকে কে জানে। অনাথা উৎপলা একমাত্র কন্যা উলুপীকে নিয়ে অগাধ জলে ভাসছে। না, ভগবানের রাজ্যে আশ্রয় কোথাও-না-কোথাও মেলে বৈকী! স্বামীর দরদী বন্ধু মিঃ ইউনীট এসে দাঁড়ালো সাহায্য করবার জন্য। মিঃ ইউনীট খুব সম্ভব কোনো বৈদেশিক—অথবা ঠিক কি, কারো জানা নেই। দুনিয়ার সকল ধর্মকেই সে মানে; চার্চ্চে যায়—মন্দিরে যায়—মসজিদে যেতেও আপত্তি নেই তার। আবার এখান-কার বুদ্ধ মন্দিরে তার প্রায়ই যাতায়াত দেখা যায়। সে মিস্ত্রী। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি—ভাল কাজ জানা লোক—মাইনেও ভাল পায়। উৎপলার স্বামীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব যথেষ্ট হৃদ্য হওয়ায় উৎপলাকে সে 'বৌদি' বলে।

—কেঁদে আর কি হবে বৌদি—যা হবার হয়েছে—মেয়েটাকে তো মানুষ করতে হবে।

—কি করে করবো ঠাকুরপো? ওঁর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড-এর দরুন পাওনা নিতান্ত কম।

—অত ভাবনার কারণ নেই—আমি যতক্ষণ আছি—ব্যবস্থা একটা করবই।

করবে হয়তো—উৎপলা অকূলে যেন কূল পেল। কিন্তু এখানে আর থাকবার ঠাঁই নেই তার। যাবেই বা কোথায়? কোয়াটার তো ছেড়ে দিতে হবে। তাই বললো,

—কোথায় থাকবো আমি মেয়েটাকে নিয়ে? না আছে বাপের বাড়ী—না-বা শ্বশুরবাড়ী।

—থাকবার জায়গা একটা দেখতে হবে বৌদি।

থাকবার ঘর এখানে পাওয়া মুস্কিল। তাই দু' একদিন পরে ইউনিট বললো—ধানবাদে আমার মাসিমা আছে। হাসপাতালের নার্স। চল, তোমাদের ওখানে রেখে আসি। পারি তো আমিও ওখানেই একটা কাজ যোগাড় করে নেব।

উপায় নাই—উৎপলা রাজি হোল এবং স্বামীর পরিত্যক্ত সামান্য সম্বল আর ন' বছরের মেয়ে উলুপীকে নিয়ে ধানবাদে এসে মিসেস সোনিয়া নাইহাটের কোয়াটারে উঠলো। ছোট কোয়াটার, তবে ঘর তিনখানা আছে। আপাততঃ ওতেই চলে যাবে। মাসী সোনিয়া মিসেস নাইহাট নামে পরিচিত। বছর চল্লিশ বয়সের যুবতী। স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে একা বাস করেন। সন্তানাদি কিছু নাই। থাকেন ঠিক বিলাতী মেমসাহেবের মত। পোষাক পরিচ্ছদ খাদ্য পানীয় সবই বিলাতী। উৎপলার অনভ্যস্ত অন্তর যথেষ্ট পীড়িত হোল এখানে থাকতে কিন্তু অপর কোন উপায় তার নাই—যাতে অন্যত্র চলে যেতে পারে। থাকতে বাধ্য হোল।

ইউনিট সাহেব দক্ষ মিস্ত্রী—দিন কয়েকের মধ্যেই সে একটা মিস্ত্রীর কাজ যোগাড় করে নিল এক কারখানায়—এবং সেখানকার কোয়াটারে নিয়ে গেল উলুপী আর উৎপলাকে। উলুপী কাকাবাবু বলে ইউনীটকে। কোয়াটারে ওদের তুলে এনে ইউনীট উলুপীকে ডেকে বলে দিল—সে যেন ইউনীটকে কাকা না বলে—'বাবু' বলে। 'কাকাবাবু' বলবে না। উলুপী ঘাড় নেড়ে বললো—আচ্ছা।

কথাটা শুনলো উৎপলা দূর থেকে। ওর আভ্যন্তরীণ রহস্য বা অর্থ বুঝতে তার বিলম্ব হোল না কিন্তু তখন অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে। বিপাকে পড়ে উৎপলা যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, সুন্দর কি কুৎসিৎ ভেবে দেখবার তার সময় ছিল না, এখন বুঝলো সে আশ্রয় পাপের আশ্রয়। ইউনিট সাহেব তার কোন

আত্মীয় নয়—স্বামীর সহকর্ম্মী মাত্র। তাকে এতটা বিশ্বাস করে এখানে না আসাই ভাল ছিল। ওখানেই কারো বাড়ীতে থেকে যেতে পারতো সে। সেখানে অন্ততঃ কারো বাড়ীতে ঝির কাজ জুটতো। এখন আর কি করবার আছে! যে সামান্য টাকা কোম্পানীর কাছ থেকে সে পেয়েছিল তাও বিশ্বাস করে ঐ ইউ-নীটকেই রাখতে দিয়েছে। অতি অল্প টাকা, মাত্র হাজার দুই কিন্তু উৎপলার পক্ষে তাই এখন যথেষ্ট। কিন্তু কে জানে টাকাটা ইউনীট ফেরৎ দেবে কি না।

উপায় আর নেই কিছু। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডবৎ তাকে ভেসে যেতে হবে। এ ভুল তার হওয়া উচিৎ ছিলনা। ইউনীট তাদের জন্য আসামের চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখানে এতদূরে নিয়ে এল এবং চাকরী যোগাড় করে কোয়াটারে আনলো—এর মূলে যা আছে, তা আর মেনে না নিয়ে উপায় নেই উৎপলার। ইউনীটের সত্য স্বরূপ ঐ কথাটুকুতেই প্রকাশ হয়ে পড়লো তার কাছে।

থানা-পুলিশ করবার শক্তি তার নেই—এবং লাভও কিছু হবে না। তাই সে ঠিক করলো যে-ভাবেই হোক মেয়েটাকে মানুষ করা যাক। উলুপীকে পরদিনই কাছের একটা স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হোল। ভর্ত্তী করলো স্বয়ং ইউনীটসাহেব। স্কুলেব খাতায় সে নিজেকে উলুপীর বাবা বলেই পরিচিত করলো—কেউ কোন সন্দেহই করলেন না।

উৎপলা সুন্দরী—সাধারণ মেয়েদের থেকে একটু বেশী সুন্দরী বলা চলে। বয়স তার ত্রিশ পার হয়নি এখনো। পরিপূর্ণ যৌবন তার। কয়লাকুঠির দেশে এসেও তার গায়ের রঙএর উজ্জলতা কমলো না। বরং স্বাস্থ্যকর যায়গায় থাকার দরুন আরও সুপুষ্ট সুন্দর হয়ে উঠলো সে।

দিন চলতে লাগলো। মিস্ত্রির কাজে মাইনে ভালই পায়

ইউনীট—কিন্তু পেলে কি হবে—লোকটা মদ খায় খুব বেশী—পরিমান প্রায়ই ঠিক থাকে না—গভীর রাত্রে এসে উৎপলার উপর তম্বী চালায়। নিরুপায় উৎপলা সহ্য করে, কাঁদে আর ঈশ্বরের কাছে মৃত্যুবব মাগে।

মৃত্যু চাইলেই পাওয়া যায় না। ইউনীট তাকে মরতে দেবার জন্য এখানে আনে নি—অতএব যাতে সে না মরে তার জন্য যথা-বিধি ব্যবস্থা কবেছে। উলুপীকে কিন্তু স্নেহের চোখেই দেখে ইউনীট—তার জন্য কোন ত্রুটি সে করে না। তার জুতো-জামা-ফ্রক—তার পড়ার বই-খাতা—তার মাষ্টার, তার স্কুল-বাসের ব্যবস্থা সবই সে ঠিক ঠিক চালায়। সেখানে কার্পন্য নেই। উৎপলাকেও সে ভালই বাসে—তবে মদের মাত্রা ঠিক না থাকলে বাড়ী এসে যাচ্ছেতাই করে। তাতে পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে যায়—সকলেই জানে হেড মিস্ত্রির বাড়ীব এই কাণ্ড। সুতরাং ব্যাপারটা সকলের সহনীয় হয়ে উঠেছে ওখানে। ইউনীট হেড মিস্ত্রি এখানকার। ভাল মিস্ত্রী—কাজ সে খুবই ভাল জানে—সুতরাং তার খাতির যথেষ্ট।

মাইনে ভাল পেলেও যে লোক মদে টাকা ওড়ায় তার টাকা থাকা সম্ভব নয়—তবু উৎপলা ইউনীটের মেজাজ ভাল দেখে এক-দিন বললো—

—মেয়েটা বড় হচ্ছে—বিয়ে তো দিতে হবে—টাকা চাই। কিছু যদি না জমাও তো দেবে কি করে?

—ওর জন্য ভাবনা নাই। পাত্র হাতেই আছে আমার। দেবকী দোসাদ—

—সেকি—। উৎপলা আঁৎকে উঠলো—না-না ওর হাতে মেয়ে দেব কি?

—কেন? খারাপ কি? আমার আণ্ডারে মিস্ত্রীর কাজ শিখছে।

এখনি তিনশো টাকা রোজগার করে। তুবছর পরে ওর রোজকার হাজার পেরিয়ে যাবে। খুব ভাল পাত্র।

—না—অতি খারাপ স্বভাবের ছেলে সে।

—না না—কিছু না। মদ-ভাং একটু খায়। তা থাক গে। খুব কাজের ছেলে ও।

—ও বাঙাল' নয়—তাছাড়া লেখাপড়া একেবারেই জানে না।

—জানে। নাইট ক্লাসে পড়ছে। আর বাঙাল নাইবা হোল—ভাল জাত।

উৎপলা আর কিছু বলতে সাহস করলো না। ইউনীটই বললো,

—উলু তো মোটে চোদ্দতে পড়লো—আরো বছর চার যাক—পাশ করুক স্কুলে—তারপর বিয়ের কথা। ততদিন দেবকীও পাশ করে ফেলবে।

—আমার অদৃষ্টে যা ছিল হোল। মেয়েটাকে অন্ততঃ ভাল বরে দিও।

—দেব—নিশ্চয় দেব। আর তোমার অদৃষ্টে খারাপটা কি হয়েছে—শুনি? এই জন্মই তো 'হারামজাদী' বলতে ইচ্ছে করে। নচ্ছার মেয়ে কোথাকার!

উৎপলা প্রস্তুত হোল ত্বচার ঘা খাবার জন্ম। কারণ এই রকমই হয়। তবে আজ তার কপাল ভাল—কিছু হোল না সে-রকম। ইউনীট শুয়ে পড়লো। কিন্তু উৎপলা চিন্তা করতে লাগলো।

উলুর বয়স মাত্র চোদ্দ, এখনো সে নিতান্ত ছোট—আর দেবকী দোসাদের বয়স অন্ততঃ ত্রিশ হবে। কাজ সে করছে কোম্পানীতে। হপ্তায় চল্লিশ না পঞ্চাশ টাকা পায়—কিন্তু লোকটার চেহারা যাই হোক—স্বভাব খুব খারাপ। ভিনদেশী ঐ

দেবকীর হাতে পড়ে উলুপীর যে কি দুর্দশা হবে—ভাবতেও গা শিউরে উঠছে। অথচ পথ কিছু দেখতে পাচ্ছে না উৎপলা। ভগবান ভরসা মাত্র।

চিন্তায়-চিন্তায় শরীর ক্রমে জীর্ণ হয়ে উৎপলার সুন্দর চেহারা যত খারাপ হচ্ছে—ইউনীটের কর্কশ ব্যবহার ততই বাড়ছে। এমন হোল যে ইউনীট আর বড় একটা বাড়ীই আসে না। কোথায় যে থাকে কে জানে—কোন কোন দিন চুর মাতাল হয়ে বাড়ী ঢোকে এবং উৎপলাকে যা-তা ভাষায় গালাগাল দেয়।

এখানে পাঁচ-ছয়-সাত বছর কাটলো—উৎপলা ইউনীটের আশ্রয়ে রয়েছে। ন'বছরের উলু ষোল বছরের হোল—অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠেছে। ওর গঠন ওর মার থেকে আরো ভাল। এবছর সে স্কুলফাইন্যাল দেবে।

ইউনীট তার জন্য ভাল প্রাইভেট টিউটার রেখে দিয়েছে। কি-জানি কেন—উলুর ব্যাপারে তার কোন ত্রুটি দেখা যায় না। হঠাৎ একদিন সে উলুকেই জিজ্ঞাসা করে বসলো,

—দেবকী দোসাদকে উলু বিয়ে করতে রাজি কি না।

—না—উলু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—না—ওকে কেন বিয়ে করবো আমি?

—তবে রে হারামজাদি—

ইউনীট একটা চড় বসিয়ে দিল উলুর গালে। এতদিন যা সে করেনি আজ তাই করলো। কেন করলো কে জানে! মদ না খেয়েই এটা করলো সে—নেশাহীন চোখেই দেখলো উলুর চোখের জল। দেখলো—চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—উলু যদি দেবকীকে বিয়ে না করে তো উলুকে সে বাড়ী থেকে বের করে দেবে।

উৎপলা শুনলো সবই—দেখলোও সব—ও জানে কেন ইউনীট

দেবকীর সঙ্গে উলুর বিয়ে দিতে চায়। দেবকীর কাছে টাকা ধার করে মদ খেয়েছে ইউনীট। প্রায় পাঁচ বছর ধরে দেবকী ওকে টাকা ধার দিয়ে আসছে। বহু টাকা—হাজার চার-পাঁচ হবে। সেই টাকা দেবকী উলুকে বিয়ে করে উশুল করতে চায়। ইউনীটও রাজি আছে। এখন বিয়েটা দিতে হবে। দেবকী জেদ ধরেছে শিগ্রি বিয়ে হোক।

এরপর ক'দিনই বাড়ী এল না ইউনীট। উৎপলার জ্বর—খুব বেশী জ্বব—উলু খবর পাঠালো পাড়ার অন্য একজন মিস্ত্রীকে দিয়ে। না—ইউনীট এল না। কোম্পানীর ডাক্তার দেখে বলে গেলেন—রাত্তির পেরোবে না। কান্নায় ভেঙে পড়ল উলু—পাড়ার সেই মিস্ত্রিটি আবার গেল ইউনীটকে ডাকতে। ইউনীটের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

ভোরের দিকে উৎপলার যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান ঘটলো—পাশের বাড়ীর যারা ছিল, তারাই ব্যবস্থা করলো সৎকারের। উলু যেন পাথরের মত হয়ে গেছে। কোম্পানীর ম্যানেজার এলেন—সব ব্যবস্থাই করে দিলেন কিন্তু ইউনীটের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কারখানায় সে-সময় ধর্ম্মঘট চলছিল—কে কোথায় ছিল জানা ছিল না।

উলুকে দিয়েই অগ্নিসংস্কার করানো হোল। কোম্পানীর দেওয়া খরচেই হোল সব—তবে শ্রাদ্ধাদি কিছু হোল না। উলুর পরীক্ষাটা দেওয়া হয়ে গেছে। একা ঘরে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়—তাই সন্ধ্যার দিকে সে অন্য একজনের বাড়ীতে চলে গেল এ ঘরে তালা দিয়ে।

গভীর রাত্রে ইউনীট এসে তর্জনগর্জন করছে বাইরে—কোথায় সেই হারামজাদী? মা মরেছে তো কি হয়েছে? আমি তো আছি। কোথায় কার বাড়ী গেলি—ও ছুঁড়ি—ও শয়তানি!

যার বাড়িতে ছিল উলু তাকেও কিছু কম গালাগালি দিল না ইউনীট—কিন্তু পাডার অনেকেই জেগেছে। ইউনীটের এই ব্যবহারে তারা চটেই আছে—একজন যুবক ধমকের সুরে বললো,

—বেশী বকাবকী কব তো দেব ঘাকতক—বুঝলে? মাতাল কাঁহাকা!

—কি। এতোবড আস্পর্দ্ধা—আমি মিস্ত্রি ইউনীট —ইউনীট জামার আস্তীন গোটাচ্ছে।

কিন্তু কিছু কবতে হোল না। দুতিনটি ছোকরা ওর ঘবেব তালা খুলে তাকে ভেতবে ঢুকিয়ে শুইয়ে দিল। উলুপী রয়ে গেল যার বাড়ীতে ছিল সেখানেই।

পরদিন সকালেই দেবকী দোসাদ এসে হাজির। সে ছিল না—ধর্ম্মঘটের জন্য কোথায গিযেছিল। ধর্ম্মঘটের অবসান হবে আজ থেকে। শ্রমিক ইউনিয়নের সর্ত্ত মেনে নিয়েছে কোম্পানী। তাই সবাই ফিরেছে। দেবকী দোসাদ এসে উৎপলাব জন্য চোখের জল ফেললো। বললো—

—কি আর করা যায—আমরা শেষ সময দেখতে পেলাম না। উলু সকালে এসে উঠেছে আবার এবাড়ীতে। ইউনীটের এখন আর নেশা নেই। কি জানি কি ভেবে সে উলুকে আর কিছু বললো না—একটা ঝি-কে ডেকে উলুকে সাহায্য করবার জন্য নিযুক্ত করে দিল। ঝি সব সময় থাকবে উলুকে দেখাশোনা করবার জন্য। ঝি-টা চেনা—উলু ভালই রইল তার সাহচর্য্যে—রান্না করে খায়—কোনদিন ইউনীট আসে বাড়ী, কোনদিন আসে না। এই-ভাবেই চলছে। উলুর পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে, প্রথম বিভাগে পাশ করেছে।

আনন্দের কথা। ইউনীট বন্ধুদের ডেকে মদ খাওয়ালো এবং নিজেও খেলো যৎপরোনাস্তি। উলুর পাশের উৎসব। এই মত্ত-

সভায় প্রস্তাব পাশ করা হোল 'আগামী চোদ্দই চৈত্র উলুর সঙ্গে দেবকীর বিয়ে হবে ঐ অশ্বত্থতলায়'—শুনলো উলু—মাত্র আর চারদিন বাকী।

উত্তর ভারত ভ্রমণ করছে নীরা সানীশিকোর সঙ্গে! সম্পর্ক সম্বন্ধে কেউ কোন প্রশ্ন করবার অবকাশই পেল না। দিল্লী-আগরা-মথুরা-বৃন্দাবন-জয়পুর-যোধপুর ইত্যাদি যায়গা ঘুরে ওরা কাশ্মীর যাবার ব্যবস্থা করলো এবং গেল। ভূস্বর্গে দিনকয়েক বাস করবে—যদিও এই সময়টায় ভারি অশান্তি চলছিল সেখানে, তবু ওরা রয়ে গেল মাসখানেক। ভালই রইল। এবার ফেরা দরকার। ফিরতিপথে কিন্তু মিঃ সানিশিকো প্রস্তাব করলো,

—তোমাদের সেই ভারত-তীর্থ কেদার বদরী দেখতে হবে—চল সেখানে।

—চল—তুমি যেতে চাইলে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে বাড়িতে মা হয়তো চিন্তিত থাকবে। তাছাড়া মার হাতে টাকা-কড়ি নেই খুব সম্ভব।

—ওর জন্য কি চিন্তা! মাকে টাকা আমি কালই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—হ্যাঁ—দাও। গত মাসে যে টাকাটা পাঠিয়েছ, তা হয়তো খরচ হয়ে গেছে।

পরদিনই নীরার মার নামে একশ' টাকা পাঠান হোল—এই নিয়ে তিন দফা। প্রায় আড়াই মাস এসেছে ওরা—বিস্তর ঘুরলো—আরো কিছু ঘুরে কলকাতায় ফিরবে। কিন্তু নীরার

ফিরতে ইচ্ছে নেই। তার ইচ্ছে যে-সন্তান তার গর্ভে এসেছে তাকে মুক্ত বায়ুতে এনে তারপর ফিরবে কলকাতায়। কিন্তু শিকো রাজি নয়। সে বললো যে কলকাতায় ভাল হাসপাতাল আছে। ওখানেই সব ব্যবস্থা হবে।

বিয়েটা রেজিষ্টারী হয় নি—বরমাল্য দান গোপনেই হয়ে গেছে নীরার—সুতরাং নীরার কিছু চিন্তা রয়েছে ও-বিষয়ে। তবু সে বললো—আমাদের বিয়েটার সরকারী সাক্ষর করিয়ে নিতে হবে তো?

—হ্যাঁ—নিশ্চয় কিন্তু তার আগে আমার একবার দেশে যাওয়া দরকার।

—কেন?

—কারণ—টাকা চাই। টাকা অবশ্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আনা যেতে পারে কিন্তু বিয়ের ব্যাপার—পাঁচজন দেশীয় বন্ধুকে তো আনতে হবে। তাঁদের নিমন্ত্রণ করা দরকার নিজের মুখে—নইলে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হয়। তাছাড়া আমি যখন এদেশে এসে তোমার মত রূপকথার রাজকন্যাকে পেয়েছি—তখন সেটা তো আমার আত্মীয়-স্বজনকে দেখানো দরকার।

—হ্যাঁ—কিন্তু আমি আর দেরী করতে চাই নে—বিয়েটা রেজিষ্টারী করা হোক—

—সন্দেহ করছো নাকি?

—না—না—সন্দেহ নয়। মেয়েদের পক্ষে যা দরকার তা আমি করে নিতে চাইছি—নইলে কলকাতায় আমার আত্মীয়দের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। এ অবস্থাটা কারো চোখে ভাল ঠেকবেনা।

কথাটা খুবই সমীচিন—কিন্তু মিঃ সিকো কি যেন ভেবে বললো—

—আমার তরফের অসুবিধার কথা তোমাকে বললাম। আমার মা আছেন। তিনি চান—আমার বিয়েতে তিনি উপস্থিত থাকবেন। তাঁর মনঃক্ষুন্ন করা আমার পক্ষে খুব কঠিন। তাঁকে আনতে অন্ততঃ পনের দিন সময় লাগবে। কারণ—পাসপোর্ট ইত্যাদির ঝামেলা এবং ওখানকার এস্টেট সম্বন্ধে দেখাশোনাব ব্যবস্থা। সব-দিক ভেবেই আমি বলছি যে কলকাতায় গিয়েই ওটা করা যাবে।

নীরা আর কিছু বললো না। বলবাব মত সাহসও তাব আর নেই। নিজেব নির্ব্বুদ্ধিতাব জন্য সে যথেষ্ট লজ্জিত এবং দুঃখিত। কিন্তু এখন সবকিছুই তার হাতের বাইরে চলে গেছে। মাঝে মাঝে সে ভাবে—নীলুকে না জানিযে এভাবে এক বিদেশীর সঙ্গে চলে আসা তার ভুল হয়েছে। আবার ভাবে—নীলুকে পাবাব উপায় ছিল না—লক্ষ্মী নামে সেই মেয়েটিই তাকে নেবে। অতএব নীরা ঠিকই করেছে।

তাছাড়া মিঃ সিকো খুবই ধনী ব্যক্তি। মিঃ সিকো উদার-মনা এবং সুযোগ্য সঙ্গী। এর কাছে নীলু নিতান্ত নগন্য।

পাহাড়ে ওঠা কিন্তু সম্ভব হল না আর নীরার পক্ষে। অত্যন্ত কষ্ট হয় তার। তাই সিকোকে সে বললো যে আর যদি তাকে যেতে হয় তো সে মারা যাবে। মিঃ সিকো কি বুঝলো—ফিরে এলো নীরাকে নিয়ে কলকাতায়। তখনো নীরার অবস্থা বে-সামাল কিছু হয় নি তবে সে যে গর্ভবতী তা বোঝা যায়। ওর মা দেখেই বললো,

—বিয়েটা আগে করে নিতে হোত।

—হ্যাঁ—কিন্তু কি করবো? সবটা সব সময় মনের মত হয় না।

—সে কোথায় উঠলো—? বাড়ীতে আনলি না কেন?

—না—ও হোটেলেই ভাল থাকবে।

নীরার মার এসব দেখা অভ্যাস আছে। সুতরাং সে বিশেষ

ঘাবড়ালো না। শুধু জানালো যে নীলু কয়েকবার নীরার খোঁজ করেছে।

—তাই নাকি! তুমি কি বললে?

—বললাম—সে কোথায় কোন পার্টির সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

—ও যাক গে মা—ওর থেকে সিকো অনেক ভাল পাত্র। ধনী আর গুণীও। ওর ছবি ভাল দামে বিক্রী হয়। খুব সম্ভব ভারত সরকারের সাহায্য পাবে সে। ওর ছবির প্রদর্শনী শিগ্রি খোলা হবে—তার জন্য ব্যস্ত রয়েছে। সব ছবি তো এখানে নেই, আনবার জন্য ওর সেক্রেটারীকে লিখেছে দেশে। তিনি সব একত্র করে এখানে আনলে চৌরঙ্গীর জেণ্ডা-ম্যানসনে একটা বড় একজিবিশন করা হবে—ঠিক করেছি আমরা।

—ভাল কথা! তার আগে কিন্তু তুই বিয়েটা করে ফেল।

—হ্যাঁ—নিশ্চয়!

পরদিন বিকালে মিঃ সিকো এলো নীরার বাড়ী। শুধুলো—

—কেমন আছ? কোন ট্রাবল নেই তো?

—না—তবে পথশ্রমের ক্লান্তি এখনো কাটে নি।

—চল—খানিক বেড়িয়ে নিয়ে আসি তোমায়।

—চল—কোন দিকে যাবে।

—চল—যেদিকে হোক—

দুজনে বেরুলো। বড় রাস্তা দিয়ে মোটর ছুটছে। গাড়ী সিকোই চালায়। ড্রাইভার নেই তার—ধোয়া-মোছার জন্য একজন ঠিকা লোক আছে। ধুয়ে একটা টাকা বকসিস পায়—সঙ্গে সে আসেনা। গাড়ীতে আছে মাত্র নীরা আর সিকো—।

চৌরঙ্গীতে পড়লো গাড়ী—মেট্রো সিনেমার সামনে বিরাট জনতা। কি ব্যাপার? একটা নতুন ছায়াছবি এসেছে। খুব নামকরা ছবি—তাই দেখবার জন্য টিকিটের কাউণ্টারে এই ভীড়—[illegible]

সেই ভীড় দেখবার জন্য পথচারীর ভীড়—পুলিশ হিমশিম খাচ্ছে ভীড় সরাতে। ফুটপাত বন্ধ প্রায়। নীরা দেখে বললো,

—উঃ কী ভাড় দেখেছ!

—দেখবে ছবিখানা?

—না, অত ভীড়ে টিকিট কাটা যাবে না।

—আমি তো তোমার জন্য থার্ড ক্লাসের টিকিট কাটব না। এসো—দেখা যাক।

গাড়ী থেকে নীরাকে নামিয়ে দিয়ে মিঃ সিকো গেল গাড়ীটা স্ট্যাণ্ডে রাখতে। নীরা এসে ঐ ভীষণ ভীড়ের একপাশে দাঁড়াল। বহু লোক—বিশাল জনতা বললেই চলে। এই ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। মাত্র তিন দিনের জন্য কলকাতায় এসেছে তাই দেখবার জন্য তরুণ-তরুণীর এত ভীড়।

নীলুও গিয়েছে ছবিটা দেখতে। কয়েকদিন যাবৎ মন খুব খারাপ তার। নীরা যে কোথায়, কিছুই সে জানে না—তাকে না বলেই নীরা কোন একটা পার্টির সঙ্গে ভারত-ভ্রমণে বের হয়েছে—এইটুকু শুনেছে নীলু নীরার মার কাছে। নীরা তাকে খবরটা জানিয়ে গেল না—এমন কি গিয়েও একটা চিঠি পর্যন্ত লিখলো না। অথচ এই নীরাকে সে জীবন-সঙ্গিনী করবে ঠিক আছে। কথাটা তার বাবার সঙ্গেও হয়েছে নীরার। এই জন্য সে লক্ষ্মীর মত সর্ব গুণবতী মেয়েকে বিয়ে করতে চাইল না। সেই নীরা এমনটা করবে আশা করেনি নীলু। মন তার অত্যন্ত কাতর হয়ে আছে নীরার জন্য।

ওখানে পৌছেই নীলু দেখতে পেল নীরাকে। হাতে যেন স্বর্গ পেল সে। ভীড় ঠেলে প্রায় ছুটেই গিয়ে ধরলো নীরার হাতখানা। আবেগের সঙ্গে বললো—

—নীরা—বেশ তো তুমি? কখন ফিরলে? কেমন আছ?

ওদিকে মিঃ শিকো গাড়ী স্ট্যাণ্ড করে ফিরে আসছে। নীরা দেখলো। সজোরে বলল—

—ছাড়ুন—হাত ছাড়ুন—কে আপনি! হুসিয়ার—অসভ্য কাঁহাকা—দেখুন তো সব। এই পুলিশ—পুলিশ—আমি এই ইন্‌সাল্‌ট সহ্য করবো না—নীরা হাত টেনে নেবার চেষ্টা করছে। তখনো নীলুর হাতে তার হাত। নীলু কেমন হতভম্ব। ওদিকে শিকো এসে নীলুর গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বললো,

—ইউ-রাসকেল—হু আর ইউ?

এতক্ষণে নীলুব জ্ঞান হোল—নীরার হাত সে ধরে আছে। এর মধ্যে সহস্র ব্যক্তি দেখেছে তাদের। কঠিন কঠোর মন্তব্য করছে তারা। পুলিশ কাছেই ছিল—ধরলো এসে নীলুকে। কঠোর প্রশ্ন করলো—

—কেন ধরলে ওর হাত তুমি?

—ধরেছি—যা হয় করুন—নীলু অতি ধীরে জবাব দিল।

—চল থানায়।

—চলুন—নিয়ে চলুন!

অনেকেই ভাবলো—ভেতরে নিশ্চয় কিছু ব্যাপার আছে। আবার অনেকে ভাবলো—ছোকরা বদ স্বভাবের লোক—সুন্দরী মেয়ে দেখেই হাত ধরেছে। পুলিশ ওসব কিছু দেখে না—নীলুকে নিয়ে যাচ্ছে। নীলু শুধু একবার করুণ চোখে তাকালো নীরার পানে। নীরা গ্রাহ্যমাত্র করলো না। পুলিশকে বললো—

—এই ইন্‌সাল্‌ট আমি সহ্য করবো না—লিখে নিন আমার নাম-ঠিকানা।

—ওকে কি আপনি চেনেন?

—অমন কত লোককেই চেনা যায়—তাতে কি? তাই বলে পথের উপর অপমান করবে নাকি! ওর সঙ্গে আমার এমন

কোন সম্পর্ক নেই যে ও এসে আমার হাত ধরবে। ও একটা শয়তান।

পুলিশ আর কথা বাড়ালো না—নীলুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 'সুন্দরম্' ক্লাবেরও কয়েকজন ছিল ওখানে—দেখলো তারাও।

অসিতবাবু বৈষয়িক কাজে বোম্বাই গিয়েছেন—তিনিই শুধু জানলেন না ব্যাপারটা।

সিনেমা হলের ভেতর ঢুকে চেয়ারে বসে মিঃ শিকো প্রশ্ন করলো,

—কে ঐ লোকটা?

—চোর-গুণ্ডা-বদমাস কত কি আছে কলকাতায—তাদেরই দলের কেউ।

—না—ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে মনে হোল।

—তা থাকতে পারে—তাতে কি?

—মনে হচ্ছে ওকে যেন কোথায় দেখেছি। হ্যাঁ—আমার নিজের-চোখে-দেখা মুখ সহজে ভুলি নে। ওকে দেখেছি অজন্তা গুহায়—তোমাদের দলে। কেমন?

—হ্যাঁ—ও ছিল সেই দলে। ওটা আমাদের ক্লাবের দল।

—তোমার সঙ্গে আর কিছু সম্পর্ক নেই?

—না—নিশ্চয় না। কেন এ সন্দেহ হচ্ছে তোমার?

—না—সন্দেহ নয়—ওকে তাহলে মাসকতক জেলে ঠেলে দেওয়া যাক।

—দেবই তো। এই অপমান আমি সহ্য করবো নাকি? নিশ্চয় না।

মিঃ শিকো আর কিছু বললো না।

পরদিন নীলুর বিচার হবে। আসামী হিসাবে তাকে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আনা হয়েছে। ক্লাব থেকে কয়েক-জন বন্ধু এবং বান্ধবী এলো; নীলুকে খালাস করতে চায় কিন্তু নীলু রাজি হোল না। সে বললো—যে-অপরাধ সে করেছে তার শাস্তি তার পাওয়াই উচিত। এমন কি, শাস্তিকে লঘুও সে করতে চায় না। নীলু কিছুতেই আত্মপক্ষ সমর্থন করলো না। সে অপরাধ স্বীকার করলো এবং সবিনয়ে দণ্ডাদেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। বিচারপতি কি যেন ভাবলেন—কোথায় যেন একটা কি গোলমাল আছে মনে হোল তাঁর। তবু তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ এবং অপরাধীর স্বীকৃতির উপর দণ্ডাদেশ দিতে বাধ্য—বিচারে একমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন তিনি।

'সুন্দরম্' ক্লাবেরও সবাই দেখলো এবং বুঝলো—নীরা কি ধরনের মেয়ে—এবং কি সে না করতে পাবে। যে ব্যাপারটা অনায়াসে নীরা এড়িয়ে যেতে পারতো—যা নিয়ে কোন ঝঞ্ঝাটই হবার কথা নয়—তাই নিয়েই নীরা একেবারে জেলে পাঠিয়ে দিল নীলুকে। গোড়ায় ওরা সবাই ভেবেছিল, নীরা রসিকতা করছে নীলুর সঙ্গে। কিন্তু সত্যি যখন পুলিশ ডেকে নীলুকে ধরিয়ে দিল নীরা তখন ক্লাবের বন্ধুরা বুঝলো ব্যাপারটা।

নীলুর আভিজাত্য—নীলুর শিক্ষা-দীক্ষা—বংশ-মর্য্যাদা এবং সদ্‌গুণাবলী সকলের জানা—নীলু ক্লাবের সকলেরই প্রিয়—তাকে এই তুচ্ছ অপরাধের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে, দাগী আসামী হতে হবে এটা ভাবেনি কেউ। তাই হোল—ক্লাবের সব্বাই দেখলো।

নীরার উপর স্নেহ-ভালবাসা বা শ্রদ্ধা ওদের কারুরই কোনদিন

ছিল না—কারণ নীরা এ সমাজের মেয়ে নয়। সে এসেছে একটা নিতান্ত তুচ্ছ যায়গা থেকে, জানে সকলেই। তার রূপ গুণ এবং অভিনয়-নৈপুণ্য যতই থাক—অভিজাত সে হবে না—তাই ক্লাবের সদস্যগণ মন্তব্য করলো,

—এঁটো পাতাকে কুড়িয়ে কি ঠাকুরের ভোগে লাগানো যায়? ওকে কুকুরে খাবে।

কথাটা বললো প্রবীর ঘোষ—নীলুর বিশেষ বন্ধু। বললো—নীলুর মত ছেলেকে জেলে দিয়ে ঐ শিকোকে নিয়ে শয়তানিটা চলবে ভাল।

সবাই শুনলো—কেউ কিছু বললো না ওর কথার পিঠে। কারণ এসব আলোচনা ওরা বন্ধ করতে চায়—শুধু নীলুর বাবার কথাই ভাবছে সকলে। তিনি নেই বাড়ীতে। একমাত্র পুত্রের এই কারাদণ্ড শুনে তিনি যে কি করবেন কে জানে! তাঁকে কি ভাবে সান্ত্বনা দেওয়া যায়—এই এখন চিন্তার বিষয়। কারণ অসিতবাবু এই সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—তিনি শুধু ধনীই নন—যথেষ্ট নাম করা লোক—সরকারেরও প্রীতিভাজন তিনি।

তাঁর ছেলেকে জেলে পাঠালো তাদেরই একজন সদস্যা—ছিঃ! কথাটা ভাবতেই ওরা সকলে খুবই কুণ্ঠিত হচ্ছে। সবাই জানে নীলুর কোন অপরাধ নেই—সে পূর্ব্ব সম্বন্ধ ধরেই নীরার হাত ধরেছিল—নীরা যে ইতিমধ্যে শিকোর প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং তারই কাছে নিজের সতী-মহিমা প্রকট করবার জন্য নীলুর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিল—এটা ওরা দেখেছে। যে মেয়েটি নীরাকে এনেছিল এখানে—সে বললো,

—ওর নাম কেটে দেওয়া হোক ক্লাব থেকে—আমিই ওকে এনেছিলাম।

—ওর নাম ক্লাবের লিষ্টে নেই—ও ভাড়াটে অভিনেত্রী মাত্র।

—যাক্—শিপ্রা আবার বলল,—ও যে এমন তা আমি কোনদিন ভাবিনি।

—হবে না কেন। ওর জন্মটা তো দেখতে হবে।

—সত্যি—একেই বলে হেরিডিটি।—যাক—ছেড়ে দাও···

ছেড়েই দিল সকলে—কিন্তু আগামী বর্ষায় ওদের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অভিনয় হবে। নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। নায়ক গোবিন্দ-লাল হবে নীলু আর রোহিনী হবে নীরা—এই ঠিক ছিল। নীলু তো জেলে—এখন করা যায় কি? পাত্র-পাত্রী বদলাতে হবে। কিন্তু নীলু তার আগেই ছাড়া পেয়ে যাবে জেল থেকে—এখন নীরাকে নেওয়া হবে কি না?

—না—মাধবী ভট্টাচার্য্য সজোরে বললো,—না—নীরাকে আর না।

—নিশ্চয় না—সুলেখা বোস বললে—আবার নীরার নাম?

—ওকে ঢুকতে দেওয়া হবে না—বললো অসীম মজুমদার।

—ওর নাম যেন কেউ না করে এখানে—জ্যোৎস্না রায় বললো। কিন্তু দেখা গেল ক্লাবের উঠানে গাড়ী থামিয়ে নীরাকেই নামিয়ে দিচ্ছে মিঃ শিকো—নীরা নামলো, মিঃ শিকো গেল গাড়ী ষ্ট্যাণ্ড করতে। ঢুকলো এসে নীরা—ক্লাবের সেই বৈঠকে। করযোড়ে নমস্কার জানালো। নিঃশব্দে সবাই হাত তুললো—শুধু শুষ্ক ভদ্রতা—কেউ শব্দ করলো না। অনিমা ঘোষ বললো,

—আমি প্রস্তাব করি—আমাদের আগামী অভিনয় শুধু ক্লাবের মেম্বারদের নিয়েই হবে।

—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি—বললো প্রবীর ঘোষ।

নীরা বসেছে একটা চেয়ারে—মিঃ শিকোও এলো অভিবাদন করে বসলো একখানা চেয়ারে। সে এই ক্লাবে এর আগে আসেনি। আজই নীলুকে জেলে পাঠিয়ে নীরা তাকে নিয়ে পরিচিত করে

দিতে এসেছে তার ভাবী স্বামী রূপে। এর পূর্ব্বে অবশ্য 'মালতী-মাধবের' অভিনয় দেখতে এসেছিল শিকো—কিন্তু সেদিন এসেছিল দর্শক হিসাবে। আজ এল ক্লাবের মেম্বার হবার জন্য—এনেছে নীরা—মিঃ শিকো বলল,

—আপনাদেব অনেককেই আমি চিনি—অজন্তা গুহায় দেখেছি '

—হ্যাঁ—নীলোৎপলকেও দেখেছেন—প্রবীর বললো।

—দেখেছিলাম—কিন্তু আমার বাকদত্তা বধূর অসম্মান আমি সইতে পারিনে—তার প্রতিকার আমাকে করতেই হোল।

—অবশ্যই। এবং এটা করে খুব ভাল কাজ করেছেন। আপনার থেকে আপনাব বাকৃদত্তা বধূ আরো অনেক বেশী ভাল কাজ করেছেন নীলুকে জেলে দিয়ে। এর জন্য প্রশংসা আপনার অবশ্য প্রাপ্য, পাবেনও। তবে আমরা নিতান্ত নগন্য মানুষ, পাপ-পুণ্যে ভরা নরাধম, কবে কোন সময় আপনার বাগদত্তা বধূর অসম্মান করে বসতে পারি—জেলে যাবার সখ্‌ আমাদের নেই, তাই সাবধান হতে চাই—

—আপনি কি বলতে চান ?—শিকো ইংরাজিতে বললো।

—বলছি যে ওরকম হাতে-ধরা—পায়ে-পডাকে আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করি। হেসে উডিয়ে দিই।

—কিন্তু ওগুলো আইনত অপরাধ!

—অবশ্যই—তবে আমরা আইনের জন্য মানুষ মনে করিনে, মানুষের জন্যই আইন মনে করি। আইন যেখানে মনুষ্যত্বকে পীড়িত করে সেখানে আমরা যাইনে। কারণ আমরা দেবতা নই।

প্রবীর ঘোষের কণ্ঠে বজ্র নির্ঘোধ নয়—বিষাক্ত হুল যেন ফুটলো মিঃ শিকোর গায়ে—একটু সামলে শিকো বললো,

—ওর শাস্তি হয়ে যাওয়ায় আপনারা খুবই দুঃখিত হয়েছেন—দেখছি।

—না—মোটেই না। আমরা খুসী হয়েছি। ও রাজাসন ছেড়ে পথের ধূলোয় নেমেছিল—এঁটো পাতা চাটতে।

—নো মাই ডিয়ার—যতি শীল বললো—নর্দ্দমায় নেমেছিল বল—

—হ্যাঁ—'পঙ্ককুণ্ডে'—বললে সম্মান করা হবে—বললো বিধান সরকার—নর্দমাই ঠিক।

নীরা তাকিয়ে দেখলো—কোনদিকে কোন সহানুভূতিই নেই—কারো চোখে তার জন্য তিলমাত্র দরদ নেই। সকলেই তাকে এবং মিঃ শিকোকে বিদ্ধ করবার জন্য একাগ্র! এখানে এসে ভুল করেছে ওরা। এখানে ওদের আর যায়গা হবে না; নিরুপায়ের মতই সে বললো,

—আত্মসম্মান বাঁচাবার চেষ্টা সকলেই করে থাকে—বেশ, আমরা চলে যাচ্ছি; নমস্কার। চল—বলে সে শিকোর হাত ধরে টান দিল; শিকো উঠলো। সে বুঝেছে—এরা কেউ তাদের সহ্য করবে না। তবু বললো,

—আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি দেখে যে ঐ অসভ্যটার জন্য আপনারা এতটা দুঃখ বোধ করছেন।

—হ্যাঁ—আমরা সবাই অসভ্য কিনা—তাই! আপনি দয়া করে সভ্য দেশে যান।

মিঃ শিকোকে নিয়ে বেরিয়ে এল নীরা। তার চোখদুটো জ্বলছে। কিন্তু নীরা নির্বোধ নয়—সে বুঝলো অত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অতবড় একজন বিশিষ্ট নাগরিকের শিক্ষিত পুত্রকে ওভাবে নির্য্যাতন করা ঠিক হয় নি। ব্যাপারটা ওই মেট্রোর সামনেই চুকিয়ে ফেলতে পারতো নীরা। এমন কি—কিছু না করে নীলুর হাত ছাড়িয়ে তার সঙ্গে দু' এক মিনিট কথা বললেও কোন ক্ষতি হোত না। মিঃ শিকো তাতে কিছুই মনে করতো না। নিজেকে

বড় রকমের সতী প্রমাণ করতে গিয়েই নীরা ভুল করলো।

শিকোকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া তার জীবনের দ্বিতীয় ঘটনা। সুতরাং সে এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখে। তবু সে ভুল করলো —এবং এমন ভুল করলো—যা সংশোধন করা সম্ভব কি না কে জানে। তার এই গর্ভাবস্থাটা দেখে ক্লাবের সকলেই হাসছে। নীরা বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠল।

শিকো শুধোলো—

—ঐ ছোকরা—নীলু কি এখানে খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তি?

—হ্যাঁ—খুবই প্রিয়—তাছাড়া ও খুব নামকরা পরিবারের ছেলে। ওর ঠাকুরদা হাইকোর্টের চিফ জাষ্টিস ছিলেন। ওর বাবাও কংগ্রেসের বিশিষ্ট ব্যক্তি—ওরা বরাবর দেশকর্ম্মী—নেত্রী স্থানীয় লোক সব।

—নীলু নিজে?

—হ্যাঁ—সেও খুব দেশভক্ত ছেলে—তবে এখন তো আর ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়তে হয় না। দেশ স্বাধীন—তবে ওরা চিরদিনের দেশভক্ত জনগণের বিশ্বাসভাজন।

মিঃ শিকো গাড়ী চালাতে চালাতে কি যেন ভাবছে। নীরা নিজেও ভাবছে। ভাবছে, কাজটা সে ভাল তো করে নাইই কে জানে এর পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। নীলুকে সে বিয়ে করবে ভেবেছিল—কথাও প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। নীলুর বাবা তো নীরাকে প্রায় পুত্রবধূর মতই দেখছিলেন। অকস্মাৎ হোল ঐ লক্ষীর আবির্ভাব—এবং সেই সময়েই নীরার পাশে এসে দাঁড়ালো সানিশিকো—। লক্ষীর আবির্ভাবে নীলুকে না পাওয়া যেতে পারে—এই আশঙ্কা এবং মিঃ শিকোর শিল্পী-জনোচিত চটুল—চাতুর্য্যপূর্ণ বাক্যবিন্যাস আর ধনের আকর্ষণেই নীরা শিকোর কাঁদে পা দিল—কে জানে, ভাল কি মন্দ করলো। শিকোর অর্থটাই বড়

করে দেখেছে নীরা। শিকো বিরাট ধনী—এতো ধনী যে নীরা ভাবতেই পারে না কত টাকা তার আছে। কিন্তু সে বিদেশী—কে জানে তার সব কথা সত্য কি না? এখন তো আর উপায় নাই। নীরার মাও বললো যে নীলুকে পুলিশে দিযে নীরা ভাল কাজ করেনি। মিঃ শিকোও হয়তো এতটা করতে চাইতো না যদি নীরা ব্যাপারটা ছেড়ে দিত। এখন এই পুলিশে যাওয়া এবং কোর্টে মামলা ও জেল হওয়াটা সাধারণ সমাজের চোখে দোষাবহ। এই দুঃসাহসিক প্রতিশোধ কেউ ভাল চোখে দেখবে না। এরকম ঘটনা সমাজে ঘটে—কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ কমই হয়। পুলিশ-কোর্টে কদাচিত যায় এসব ঘটনা। কারণ এতে নিজেদেরও পারিবারিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকে। তাই কেউ এতটা করে না। নীরা করলো—ক্লাবের সকলেই তাই ওকে ত্যাগ করেছে।

—চল—তোমাকে নিয়ে মাসকতক বাইরে ঘুরিয়ে আনি।

—কোথায়?

—বিলাত বা আমেরিকা—

—তা মন্দ কি! আমি প্রস্তুত আছি।

—হ্যাঁ—চল, পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করি। তুমি যেন পড়তে যাচ্ছ—এই প্রকাশ থাকবে।

—ভাল!—নীরা খুসী হোল। ভাবলো—কিছুদিন অন্ততঃ সে পরিচিতদের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবে। অতঃপর ওরা বিদেশে যাবার ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করলো এবং তার জন্য যা দরকার তাড়াতাড়ি করে ফেললো। কয়েকদিন পরেই মূল্যবান জেট প্লেনে চড়ে নীরা চলে গেল বিদেশে মিঃ শিকোর সঙ্গে কিন্তু মিঃ শিকো যে কেন ওকে নিয়ে গেল নীরা তখনো বোঝেনি। বুঝলো কয়েকমাস পরে। মিঃ শিকো তাকে দূর বিদেশের এক

হোমে ভর্ত্তি করে দিয়ে নিজের দেশে গেছে—আর ফেরেনি। কোন খবরও নেই।

অসিতবাবু ফিরে এলেন কলকাতায়। ফিরেই শুনলেন নীলুর জেলে যাবার কথা। পাঁচ-সাত দিন অতীত হয়ে গেছে এর মধ্যে। ব্যাপারটা বিস্মিত করলো তাঁকে। খানিকটা আশ্চর্যই হলেন তিনি। অবশ্য তাঁর মত সম্মানী ব্যক্তির ছেলের পক্ষে এই রকম কদর্য অপরাধের বোঝা মাথায় করে জেলে যাওয়া যে কতখানি অপমানজনক তা বুঝেও নিরুপায় হয়ে তিনি নিঃশব্দে সব সয়ে গেলেন। বাড়ীর পুরোনো নায়েব তাঁকে তবু সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন,

—সবাই জানে নীলু নিরপরাধ। সমাজের কেউ কিছু মনে করবে না স্যার।

—মনে নিশ্চয় করবে গোপেনবাবু—কলঙ্ক একবার গায়ে পড়লে তাকে আর নিষ্কলঙ্ক করা যায় না। জানেন তো সীতার অগ্নি-পরীক্ষা হোল। অযোধ্যায় এসে রাণী হলেন—কিন্তু তাঁর নামে আবার কলঙ্ক রটিত হোল—বনবাসে গেলেন। সেখান থেকে পুত্রের মাতা হয়ে ফিরলেন কিন্তু প্রজারা বললেন অগ্নিপরীক্ষা আর একবার হোক। কলঙ্ক মোছে না—সীতা পাতালে প্রবেশ করলেন অপমান থেকে নিজকে বাঁচাতে।

—কথাটা ঠিক স্যার, কিন্তু করা যায় কি?

—কিছু করবার নেই গোপেনবাবু—এ বরাত। ঐ মেয়েটিকে আমিই পুত্রবধূ করতে চেয়েছিলাম—দোষ আমারই বেশী।

—ওর সম্বন্ধে কিছু কি অনুসন্ধান করেছিলেন আপনি?

—না। ভাল মেয়ে। গাইতে পারে নাচতে পারে লেখাপড়ায়ও গ্রাজুয়েট ; দেখতে অসামান্য সুন্দরী, তাই ভেবেছিলাম হোক বিয়ে।

—কাজটা ভাল হয় নি স্যার—ওর বংশ-মর্য্যাদা বলে কিছু নেই। ওর বাবাকে আমি চিনতাম। সে ছিল একজন ভাল কারিগর, শিল্পী। নামডাক খুব ছিল তার, রোজগারও করতো ভাল, এই নীরার মা তারই রক্ষিতা হয়ে এসে ওঠে ওর বাড়ীতে। চলতি কথায় হাফ্-গেরস্থ যাকে বলে তাই ওরা - অবশ্য ওর বাবা লোক ভাল ছিল কিন্তু ওর মার অত্যাচারে সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

—আপনি জানেন এসব খবর ?

—হ্যাঁ স্যার, আমার বাড়ী ওদের বাড়ী থেকে পাঁচ-সাত মিনিটের মাত্র পথ।

—আমার নিদারুণ ভুল হয়েছিল গোপেনবাবু। যাক্, নীলুর জেল থেকে খালাস হতে আর দেরী কত ?

—দেরী আছে স্যার, আজ মাত্র সাতদিন।

—আচ্ছা— থাক। খালাস হবার দিন আপনি গিয়ে আনবেন তাকে। মা-মরা ছেলে, কেন যে আমি আপনাদের কাউকে না জিজ্ঞাসা করে ঐ মেয়েটাকে নির্বাচন করেছিলাম।

অসিতবাবুর চোখে জল এল। মুছলেন। পুত্রকে তিনি অপরাধী করছেন না। কারণ জানেন তাঁর অনুমতি না নিয়ে নীলু কিছুতেই এগুতো না নীরার সঙ্গে প্রেমালাপ করতে। ছেলেকে তিনি ভালই চেনেন—তাঁর ছেলে তাঁরই মত নির্লোভ নিরহঙ্কার ইত্যাদি গুণে অলঙ্কৃত। তাই তার বন্ধুমহলে তার জন্য হাহাকার পড়ে গেছে। কাঁদছে ক্লাবের ছেলেমেয়েগুলো। ওরা সব এল বিকালে। রঞ্জিতা, নন্দিতা, অঞ্জনা, বন্দিতা, নীপা, রূপা, দীপা—অসিত, বরুণ, বিনয়, প্রবীর, সুবীর, সুধীর সব—ওরা প্রণাম করলো অসিত-

বাবুকে। বললো,—একটা শয়তানীকে ক্লাবে ঠাঁই দিয়েছিলাম, জেঠামশাই, এই তার শাস্তি।

অসিতবাবু এদের সকলের পরিচিত। তিনি কারো কাকা, কারো জেঠা কারো মামা কারোবা মেসোমশাই। পাতানো সম্পর্ক হলেও তার হৃদ্যতা কম নেই। এই সুপ্রাচীন পরিবারের সঙ্গে সকলেই আত্মীয়তা বজায় রাখতে চায়। অসিতবাবুর পরলোকগতা স্ত্রী নীলোৎপলের মা ছিলেন বাংলার একটি বিশেষ জমিদার বংশের মেয়ে। তার অকালমৃত্যু এদের সকলকে ব্যথিত করে। ঐ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাত্রী সুরঞ্জনা দেবীর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। নীলু তাঁরই পুত্র এবং সুযোগ্য পুত্র। তার অকারণ (এই ব্যাপারটাকে তারা অকারণই মনে করে) জেলে যাওয়া এবং কলঙ্কের ভাগী হওয়া এদের সকলের অন্তরকে পীড়িত করেছে। তাই ওরা এসেছে অসিতবাবুকে সান্ত্বনা দিতে। অসিত-বাবু বললেন—বোস্ তোরা, বোস্ মা-রা—বাবা-রা—বোস্ সব। চা-টা খা। কি আর হবে। আমারই দোষ।

—আপনার? সেকি—কেন মামাবাবু? আপনি কি করলেন?

—সমাজ ছেড়ে ঐ অসামাজিক মেয়েটাকে ঘরের বৌ করতে গিয়েছিলাম।

—আপনি? না-না এ আমরা বিশ্বাস করি কেমন করে?

—বিশ্বাস কর। সত্যই ওকে দেখে ওর কথাবার্ত্তা শুনে আমি ভেবেছিলাম খুবই ভাল মেয়ে—গরীব ঘরের সৎ-সতী মেয়ে—

—আপনার এমন ভুল হোল! যাক, কাকাবাবু যা হবার হয়েছে। আমরা নীলুকে জেল থেকে ফুলের মালা পরিয়ে ঘরে আনবো—আপনি ভাববেন না।

—না না—ওসব করিসনে বাবারা—নীলু হয়তো এমনি লজ্জায় কাঠ হয়ে আছে। তাকে তো জানিস—সে কোনদিন এমন

কাজ করে নি যার জন্য লজ্জা পেতে হবে তাকে। ঐ মেয়েটার সঙ্গে মিশেই সে দুদিন আমায় তার গন্তব্য সম্বন্ধে জানায়নি। তখুনি আমি সাবধান হতে পারতাম।

—সেটা তো নীলুরই দোষ।

—না—অসিতবাবু বললেন—না, আমি তা মনে করি নে। ঐ মেয়েটাই তাকে এমন ভাবে মোহগ্রস্থ করেছিল—এমন ভাবে বুঝিয়েছিল যে—বাবাকে এসব কথা না বললেও চলে। অর্থাৎ তার সংসর্গ, তা সে যতখানাই হোক—বা যতটুকুই হোক, নীলুকে কলঙ্কিত করার জন্য দায়ী। কিন্তু যাক্—ভগবান রক্ষা করেছেন—বিয়ে দিয়ে ওকে বৌ করে ঘরে আনিনি।

—হ্যাঁ, যা বলেছেন—খুব অল্পে রক্ষে হয়েছে।

—না, এখনো রক্ষে ঠিক হয়েছে বলা চলে না। কে জানে আরো কি করবে সেই মেয়েটি! কোথায় সে? জান তোমরা?

—না—তাকে আমরা ক্লাব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। অজন্তা দেখতে গিয়ে একজন শিল্পীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়—নাম মিঃ সানী শিকো। তিনি কোন দেশের লোক কে জানে—খুব সম্ভব সঙ্কর-জাতি—তবে লোকটি ধনবান। টাকা পয়সা খুব ছাড়তেন। নীরা ওর সঙ্গে কিছু বেশী মেলামেশা করেছিল। তখন অবশ্য আমরা জানতাম না যে আপনি বা নীলু ওকে এতটা আস্কারা দিয়েছেন। এখানে ফিরে আমাদের অভিনয় হোলো। ঐ মিঃ শিকো এসেছিলেন সেই অভিনয় দেখতে। নিমন্ত্রণ অবশ্য করা হয়েছিল তাঁকে ক্লাব থেকেই নীরার বন্ধু হিসাবে। তারপরই নীরা কোথায় যায়—মাস দুইতিন তার কোন খোঁজই পাইনি আমরা—পরে জানা গেল সে গেছে ঐ শিকোর সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণ করতে। ও আমাদের সমাজের মেয়ে নয়—সুতরাং ওর গতিবিধি নিয়ে আমরা কেউ কোন আলোচনা করি নি—তবে পরবর্তী অভিনয়ে

ও যোগ দেবে ঠিক ছিল। নীলু অত্যন্ত চাপা ছেলে—নীরার বেড়াতে যাওয়ার জন্য সে যে খুব দুঃখিত তা আমাদের জানতে দেয় নি—নিজের কারবারের কাজে ব্যস্ত আছে বলেছিল। আমরা ভাবলাম আপনি তাকে নিজের ব্যবসায়ে তালিম দিচ্ছেন। তাই আমরা ওদিক দিয়ে কোন চিন্তাই করিনি। হঠাৎ সেদিন ঐ পুরস্কার-পাওয়া ছবিটা দেখতে গিয়েই এই বিপত্তি।

প্রবীর এক নিশ্বাসে বলে গেল ঘটনাটা। অসিতবাবু বললেন,

—যাক—যা হবার হয়েছে। আশা করি সমাজের কেউ কলঙ্ক দেবে না?

—কিছু মাত্র না—আমরা সেখানে ছিলাম—সাক্ষী দিতে দিল না নীলু—বললো সে তার আহাম্মকির শাস্তি নেবে।

—ঠিকই বলেছে। তার এবং আমারও আহাম্মকির শাস্তি।

অসিতবাবুর চোখে জল চকচক করছে। বললেন,

—ঐ মেয়েটার জন্য লক্ষ্মীর মত মেয়েকে নীলু ছেড়ে দিয়েছে।

—কোন লক্ষ্মী? অধ্যাপক শিবরামবাবুর মেয়ে?

—হ্যাঁ—

—সে তো স্বর্গের দেবী!—প্রবীর বললো, নীলু তাকে ছাড়লো?

—হ্যাঁ—মোহ এমনি জিনিষ—যাক, প্রবীর, তোরা যেন এবার সতর্ক থাকিস—আপনার গণ্ডীর মধ্যেই থাক। আন্তর্জাতিক হওয়া নিশ্চয় বড় কথা—আন্তঃপ্রাদেশিক হওয়াও খারাপ কিছু নয়—কিন্তু সংস্কৃতি একটা বস্তু যা বিবাহে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ সেই দম্পতীর সন্তানই হবে দেশের সম্পদ—ভবিষ্যত জাতি-সম্পদ। তাই বলছি, মানবত্ব যেখানে কলুষিত সেখানকার মেয়ে আনবি না। সেখানকার পুরুষকেও সুদূরে সরিয়ে রাখবি। নইলে ঠকবি।

—হ্যাঁ জেঠামশাই—আপনার এই উপদেশ নিশ্চয় মনে রাখবো আমরা।

সকলেই চা খেলো, গল্প করলো এবং আরো কিছুক্ষণ বসে অসিতবাবুকে আবার সান্ত্বনা দিয়ে ফিরে গেল। ওরা চলে যাওয়ার পর অসিতবাবু ভাবতে লাগলেন—সমাজে তাহলে কেউ নীলুকে অপরাধী মনে করে নি। নীলুর সম্মান খুব ক্ষুন্ন হবে না এবং বিয়েতে বাধাও হবে না। এরা—যারা এসেছিল তাদের অনেকেই কুমারী। এদেব মধ্যে যাকে ইচ্ছে নীলু বিয়ে করতে পারে। তবে লক্ষীকে যদি পাওয়া যায়—অসিতবাবু চিন্তা করছেন—না—আব তিনি আশা করেন না। লক্ষ্মী নিশ্চয় হাতছাড়া হয়ে গেছে। ওঃ কী ভুল যে হোল!

—টেলিফোন—বিয়ারা এসে জানালো। অসিতবাবু গিয়ে ধরলেন।

—আমি লক্ষ্মী কথা বলছি—কেমন আছেন? শরীর ভাল?

—হ্যাঁ—মা—তোমরা সব ভাল আছ তো?

—হ্যাঁ—লক্ষী আরো কি বলবে কিন্তু বলছে না। অসিতবাবু বললেন,

—আমি ভালই আছি মা—কিন্তু নীলুর খবর তো জান?

—জানি—ওরকম কিছু একটা যে ঘটবে তা আমি ওদের অভিনয়েব দিনই আঁচ করেছিলাম।

—নীলুকে সাবধান করে দাও নি কেন মা?

—দিয়েছিলাম—মানে, দেবার চেষ্টা করেছিলাম—তাতে উনি আমার উপর চটে গিয়েছিলেন—বলেছিলেন—মানুষকে তার যোগ্য মর্য্যাদা আমি দিতে জানিনে। গোড়ামী আর কুসংস্কারকে আমি প্রেমের উপর ঠাঁই দিচ্ছি—

—বলো কি? নীলু এই কথা বলেছিল?

—হ্যাঁ—কিন্তু আমি অভিযোগ করছি নে জেঠামশাই, আমার কান্না পাচ্ছে। কি এখন করবেন?

—কি আর করবো বল। নীলুর ফেরার অপেক্ষায় আছি।

—এখনো তেইশ দিন দেরী আছে জ্যেঠামশাই।

—হ্যাঁ—ও আসুক—তারপর দেখি কি করা যায়।

—সমাজে ওর নামে কলঙ্ক রটে গেল জ্যেঠামশাই।

—না মা—তা হবে না। নীলুকে সবাই চেনে। তবু নীলু দাগী হয়ে গেল।

—দাগী হওয়ার কথাই বলছি আমি। আর তো কিছু কথা নেই এখন। ফোন ছেড়ে দিই জ্যেঠামশাই।—

—হ্যাঁ, এসো—

লক্ষ্মী ছেড়ে দিল ফোন। অসিতবাবু বুঝলেন—লক্ষ্মী কাঁদছে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় নীলুর খবরটা প্রায় সকলেই জেনে ফেলেছে। চেনা পরিচিতরা পড়ে ভেবেছেন—একি ব্যাপার? আর অচেনাদের কাছে এরকম ঘটনা নিত্যকার ঘটনা—তাঁরা অগ্রাহ্যই করেছেন।

কিন্তু অসিতবাবুর পরিচিতের সংখ্যা কম নয়। এর মধ্যে অমরবাবু এবং তার পরিবার বিশেষ ভাবেই পরিচিত, আত্মীয়বৎ। তাই খবরটা অঞ্জনা পড়া মাত্র ঠাকুরমাকে বললো—তিনি বললেন ছেলেকে—অর্থাৎ অমরবাবুকে। অমরবাবু তৎক্ষণাৎ ফোন করে জানলেন—অসিতবাবু কলকাতার বাইরে আছেন। তাই খবরটা বিশদভাবে জানতে পারেন নি তিনি। পুত্র অমিয় এ সব খোঁজ খবর রাখে না। সে নিজের পড়াশুনা, কাজ আর তার একমাত্র সখ ফটো তোলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফটো তোলার বাতিক তার

এমন আশ্চর্য্য যে ভাল একখানা ছবি তোলবার জন্য সে যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। অমিয় তাই কিছুই জানে না এ সম্বন্ধে। তাছাড়া নীলুর থেকে বয়সে সে কিছু ছোট—খুব পরিচয় বা বন্ধুত্ব নেই তার সঙ্গে। খবরের কাগজ নিয়ে মাথা ঘামায় না অমিয়—বলে,

—কি আর পড়বো—রোজই তো দেখি সেই একই খবর—নেতাদের ভাষণ, গুরুত্ব আরোপ করা আর অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা। সেই অন্নাভাব সেই রেল এ্যাকসিডেণ্ট—সেই খাদ্য নেই আর প্রতিবাদ দিবস, আর সরকারী সাহায্যের লম্বা ফিরিস্তি—একখানা যে-কোন দিনের কাগজ পড়লে সারা বছরের খবর পড়া হয়ে যায়।

ওর কথা অবশ্য কেউ শোনে না। ও তার নিজের মতেই প্রতিষ্ঠিত।

—শুনেছ দাদা, নীলুদার জেল হয়ে গেছে—অঞ্জনা বললো সেদিন।

—জেল! কেন? কার কি করলেন তিনি—সরকারি কিছু?

—না—অত্যন্ত কুৎসিত অপবাদ—নীরা নামে কোন একটা মেয়ের হাত ধরে—বলেই অঞ্জনা ছুটে গিয়ে খবরের কাগজখানা আনলো। দাগ দেওয়া যায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললো,

—আমি বলতে পারবো না—তুমি পড়ে দেখ।

অমিয় পড়লো—পড়ে চুপ করে বসে ভাবতে লাগলো। বৈকালিন চায়ের টেবিলে ভাই-বোন বসেছে। বাবা এখনো আসেন নি—তাঁকে অবশ্য খবরটা আগেই জানানো হয়েছে। অঞ্জনা দাদার মুখপানে চেয়ে বললো,

—তুমি কিছু যে বলছ না দাদা?

—বলবার কি আছে? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

—সেকি ? নীলুদাকে বুঝি অপরাধী মনে কর ?

—হ্যাঁ—বিচারে যখন শাস্তি হয়েছে তখন নিশ্চয় অপরাধী।

—না—হতে পারে না—নীলুদাকে তুমি চেন না তাহলে!

—না—চিনি না—চেনা অত সহজ নয়—বুঝলি অঞ্জু—মানুষকে চেনার চেয়ে ভগবানকে চেনা সোজা। এক কথায় শ্রীভগবানকে চেনা যায়—মানুষ চিনতে মহাভারত দরকার।

—বলো কি দাদা ? এক কথায় ভগবানকে চিনে যাবে।

—হ্যাঁ—শোন তোকে চিনিয়ে দিচ্ছি—এক নম্বর ভগবান নিরাকার নির্বিকার, অতএব তাঁর থাকার কোন দরকার নেই—ছুই নম্বর—তিনি দয়ালু কৃপালু করুনালু অর্থাৎ অনেক রকমের আলু—যত ইচ্ছে খাবি····

—থাক—আর বলতে হবে না—চা খাও····

—শোন শোন—এর মধ্যে ঠাণ্ডাঘরের আলু চড়াদরে কিনে অতি কষ্টে খাবি—গন্ধওয়ালা আলু খেতে বমি আসবে—

—তার মানে তুমি বলছো যে ভগবান মাত্র আলু।

—মাত্র কেন ? তাঁর মাত্রা নেই—মাত্রাহীন আলু—শাঁকালু থেকে শাকর কন্দ আলু—খামালু থেকে খাস নৈনিতাল আর পাহাড়ী থেকে পাটনাই আলু।

—হ্যাঁ—ভগবান মানে আলু তাহলে—

—হ্যাঁ—এক কথায় বুঝে যা—গোল সুগোল-শালগ্রাম আলু—লম্বা নৈনিতাল শিবলিঙ্গ আলু—মোটামোটা চৌকষ শ্রীগণেশ আলু····

—থাক দাদা—নীলুদার কথাটা চাপা পড়ে গেল। বাবা ভাবছেন।

—ভাবনার কিছু নেই—জেলে গেছে—খেয়েদেয়ে মোটাসোটা হয়ে ফিরবে, দেখে নিস।

—জেল থেকে ?

—হ্যাঁ—আজ কাল কারাগার সংশোধন আইন হয়েছে—জেলে যা ভাল খাদ্য দেয় ইচ্ছে করে রেশনের কিউয়ে না ঝুলে দিনকতক বেড়িয়ে এলে হয়।

—যাওনা—যাও—তুমিও ঐরকম কিছু একটা কর।

—সুযোগ কৈ! নীরাব মত কারো পাল্লায় তো পড়তে পারলাম না।

—ওহো—দাদা—একটা খুব জরুরী কথা মনে পড়েছে। ঠাকুমা বলেনি তোমাকে ?

—কৈ—না— কি এমন জরুরী কথা ?

—শোন—নিশ্চয় অধ্যাপক শিবরামবাবুকে চেন ?

—ওঁকে না চিনলে তো বাংলা দেশকেই চেনা যায় না—কেন ?

—তাঁর একটি মেয়ে আছে—নাম লক্ষ্মী বা কমলা কি যেন—তারই কথা।

—কি হোল তার—জেলে গেছে ?

—আরে না—সব কথাতেই ফোড়ন দাও কেন দাদা—তোমার বড্ড বদ অভ্যাস।

—ফোড়ন না দিলে কথা ভাল জমে না—লঙ্কাফোড়ন চাইই।

—আচ্ছা—দেবে—যাক—সেই লক্ষ্মী বা কমলা আসছেন আমাদের বাড়ীতে।

—তার মানে ? তিনি সান্ধ্য ভ্রমণে আসবেন ?

—না—তিনি আমাদের গৃহ-সিংহাসনে বসতে আসবেন—মানে আসন নেবেন।

—অর্থাৎ তিনি আমাকে বি—পূর্বক বহ-ধাতু ঘঞ প্রত্যয় করে বিবাহ করবেন ?

—নির্ঘাৎ বুঝে ফেলেছ। অধ্যাপক তাই বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন। বাবা বললেন—ছেলের মতটা পেলেই হবে—আর কোন আপত্তি নেই।

—তুই দেখেছিস সেই কমলা না লক্ষ্মী কি যেন নাম—তাকে?

—হ্যাঁ—খুব ভাল জানি—ওপাড়ার মেয়ে। হলে কি হবে—ওকে একডাকে চেনা যায়।

—বলিস কি?—এমন ডাকসাইটে?—সিনেমা করে নাকি?

—যাঃ। কি যে বলো দাদা—ও খুব গুণের মেয়ে। জান—লেখাপড়ায় সেরা, গান গাইবে তো তোমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে। চেহারাখানা দেখলে কি আর বলবো—মানে—মানে—রূপকথার খাঁটি রূপ।

—ওরে বাপস— থাক অঞ্জনা বাদ দে—অতটা পোষাবে না। বাবাকে বলিস বিলাত থেকে ফিরে না এসে বিয়ে আমি করছি না।

—ঠাকমা জেদ নিয়েছে, বিয়ে দিয়ে তবে বিলাত পাঠাবে তোমায়।

—বেশ, কিন্তু আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার জন্য লক্ষ্মী কেন? কোন অলক্ষ্মীকে দেখ তোরা—ওকে বাদ দে—তোর মতে ও একেবারে বিদ্যা-দিগগজ।

—হ্যাঁ—বুদ্ধিসাগর-বিদ্যাদিগগজ, গানে তানসেন ইত্যাদি। ওরকম একখানা বৌ ঘরের সম্পদ দাদা—বয়স মাত্র কুড়ি-একুশ—তুমি ওকে নিয়েই বিলাত যেতে পার—বাবা তাও বলেছেন।

—পথি নারী বিবর্জিতা—ও হবে না অঞ্জু—বাবাকে বলিস—

—লক্ষ্মীকে বাবার খুব পছন্দ—ওদেরও খুব মত। তাছাড়া ওরা খুব বনেদি পরিবার। বাবা যা চান তাই। অতএব তোমার আর রেহাই নেই। বিয়ে ওখানেই করতে হবে।

—হা ভগবান!

—ভগবান তো আলু—তিনি আর কি করতে পারেন। বড় জোর মাংসের ঝোল কিম্বা সিঙাড়ার ভেতরে থাকবেন তিনি।

—নারে—এ যে আলু-কাব্‌লী করে ফেলছিস—

—আলুকাবলি খেতে খুব ভাল দাদা—অনেকদিন খাইনি। দিও-না একঠোঙা এনে।

—অনেক তো বিক্রী হয় ঐ পার্কের ভেতর। যাস, খেয়ে আসিস।

—ওরে বাপ—তাহলে আর ঠাকুমা বাড়ী ঢুকতে দেবে না। বলবে গঙ্গাজলে পেট ধুয়ে আয়—ওখানে খাওয়া হবে না দাদা—

—তাহলে ?

—তুমি আমাকে চুপেচাপে বেড়াতে নিয়ে যাবে, কেমন—আলু-কাবলি আর ভুট্টাপোড়া অনেকদিন খাইনি।

—আচ্ছা—আচ্ছা—কাল তোকে নিশ্চয় খাওয়াব। কিন্তু লক্ষ্মীকে বাদ দে—যেমন করে পারিস বাদ দে—তোকে আমি ফুচকা খাইয়ে দেব, দৈ-বড়া খাওয়াবো—রামদানা লাড্ডু খাওয়াব।

—ওকে বাদ দিতে আমার ইচ্ছে নেই দাদা—অমন একটা বৌদি···

—ওর থেকে ভাল বৌদি হতে পারে। ও এখন থাক—

অমিয় উঠে চলে গেল চা খেয়ে। অঞ্জনা বসে রইল বাবার অপেক্ষায়। লক্ষ্মীকে বৌদি করতে পারলে সে সুখী হয় কিন্তু দাদা যেরকম বলছে—কে জানে করবে কি না।

দাদাকে নিয়ে কিছুটা মুস্কিল আছে। দাদা বড্ড কেমন খেয়ালী মানুষ—কারো বশ মানে না—কেউ ওকে বাঁধতে পারে নি—কোন মেয়ের পাল্লায় পড়েনি দাদা। বাড়ীতে ঠাকুমা আর অঞ্জনা ছাড়া পৃথিবীতে আর যে কোন মেয়ে আছে—তা দাদার যেন জানাই নেই। আসলে দাদা মেয়েদের ভয় করে।

দাদার ফটো তোলার সখ খুব বেশী—অনেক ভাল ভাল ফটো তুলেছে দাদা—পুরস্কারও পেয়েছে বহু প্রতিযোগিতায়—কিন্তু যে-কোন ব্যক্তি তার এ্যালবাম দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে—দাদার ফটোর এ্যালবামে কোন মেয়ের ছবি নাই—যদি আছে তো শিশু। আট দশ বছরের মেয়ে—তাও খুব কম। অঞ্জনার ছবিও দাদা তোলে না। দাদার সমস্ত ছবি দৃশ্যচিত্র—নাহয় রিক্সাওয়ালা-—নৌকার মাঝি—পথচারী ভিখারী বা মজাদার ফেরিওয়ালা—সাপুড়ে—বাঁশুড়ে অথবা ভবঘুরের অসংখ্য ছবি তোলা আছে দাদার - সুন্দরী কোন মেয়ের নাই নাই কোন অসুন্দর মেয়েরও। বিড়াল কুকুর কাক আছে বিস্তর, ফুলভরা লতা বা শুকনো রুক্ষ গাছ দাদার ছবির বিষয় বস্তু—কিন্তু কোন দিন দাদা অঞ্জনার একটা ছবি তুললো না।

ক্রীকেট খেলার ছবি, ফুটবল মাঠের ছবি—বড়-বড় নেতার বাণী বক্তৃতা দেওয়ার ছবি তোলে দাদা—কিন্তু আশ্চর্য্য যে সেদিন ঐ পার্কে একজন বহুসম্মানিতা নেত্রী মহিলা বক্তৃতা দিলেন—সহস্র ফটোগ্রাফার তাঁর ছবির জন্য প্রাণপণ করলো- দাদা বাড়ীর বারান্দায় বসে দেখলো।

—ওখানে যাবে না দাদা—ছবি তুলবে না?—অঞ্জনা প্রশ্ন করেছিল।

—না—দাদা পরিষ্কার বললো—ওঁদের ছবি তোলার লোক বিস্তর।

—তুমিও তো একটা তুলতে পার।

—আমি তুলবো না—দাদা বলেছিল।

—কেন? আবার প্রশ্নটা করেছিল অঞ্জনা।

—আমার ছোট ক্যামেরায় ওরা ধরবে না—ওদের জন্য বড় ক্যামেরা দরকার।

বলেই চলে গিয়েছিল দাদা। অঞ্জনা আগে ঠিক বুঝতো না এখন বোঝে—তার দাদার—এত লেখাপড়া শিখেছে তবু—দাদার কোন নাবী বন্ধু নাই। দাদার বয়সী যেকোন পুরুষেব আছে অন্তত আধ ডজন নাবী বন্ধু—দাদাব নেই—একটাও নেই। একটা জুটিয়ে দিতে চায় অঞ্জনা—না—দাদা তাও হতে দেবে না। আশ্চর্য্য মন দাদার কিন্তু!

মনের মত বৌ চাই—ভার্য্যাং মনোবমাং দেহি—চণ্ডীর এই শ্লোক পড়েছে নীলু। পড়েছে এবং মনে মনে বহুবার ভেবেছে মনের মত ভার্য্যাই সে পেল। সেই কল্পনার প্রাসাদ এমন নির্ম্মম আঘাতে ধ্বসে পড়বে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই হোল—স্বপ্নের অগোচর ব্যাপারটা ঘটে গেল তার জীবনে। জেলে নানা রকম লোক রয়েছে—বিভিন্ন অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি হয়েছে তাদের। নানা কাজ তাদেব দিয়ে করানো হয়। নীলুকেও কাজ করতে হয় —তবে তার কাজ কিছুটা ভাল—প্রুফ দেখার কাজ। কাজটা জানতো না নীলু—শিখে ফেললো এবং ভালই কাজ করতে লাগলো। একাজে বিদ্যার দরকার—নীলুর তা আছে তাই কাজও ভাল করে সে—ফাঁকি দেয় না। ও যেন ওর এই শাস্তিটাকে আশীর্ব্বাদ বলে মনে করে। মনে করে এটা তার প্রাপ্য—কারণ নীরার মত মেয়ের উপর মোহগ্রস্ত হওয়া তার পক্ষে শুধু অন্যায়ই নয় অপরাধ। এদিকে লক্ষ্মীকে লাভ করবার যোগ্যতাও সে হারালো। জেলফেরৎ আসামীকে লক্ষ্মী বিয়ে করবে—কল্পনার অতীত। আর তাকে বিয়ে করাও উচিৎ হবে না নীলুর পক্ষে।

কাউকেই বিয়ে করা উচিৎ হবে না তার। সে ভদ্র সমাজের বাইরে চলে গেছে।

জেলার সাহেব নীলুর কাজ দেখে খুশী হন—বলেন,

—তোমার মত ছেলের এরকম অপবাদ রটলো—ছিঃ!

—সবই ভাগ্য সার—নীলু বলে—যা ঘটবার তা ঘটবেই। তবে আমি ভুল যে করেছি তা অস্বীকার করবো না। জেনে শুনে ঐরকম একটা মেয়েকে আমার সতী মায়ের পবিত্র ঘরে আমি নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম—নীলুর চোখে জল আসে।

দণ্ডাদেশ তাকে মানতেই হবে—তবু জেলার সাহেব ওর উপর প্রসন্ন—তাই নীলুকে তিনি স্নেহদৃষ্টিতেই দেখেন। নীলু ভাবে—জেলার হলেও মানুষ তো—মানুষের অন্তর সর্ব্বত্র সহানুভূতিশীল কিন্তু মানুষ বড় অসহায়। নীলুর মত ভাগ্যবিড়ম্বিত কত ব্যক্তি মিথ্যা অপরাধের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে জেল ভোগ করছে। তাদের অপরাধ ঠিক অপরাধ কিনা বোঝা শক্ত। আইনতঃ তারা হয়তো অপরাধী কিন্তু আইনের পিছনের ইতিহাস যদি খোঁজা যায় তো দেখা যাবে ওদের জীবনের সেই অংশ হয়তো মানবত্বে সমুজ্জল।

সদানন্দ এই রকম একজন অপরাধী। নীলু জানলো—সদানন্দ তার বৃদ্ধা মার চিকিৎসার জন্য মনিবের দোকানের তহবিল ভেঙেছিল—মনে করেছিল আগামী মাসের মাইনে থেকে তহবিলটা সে পূরণ করে দেবে, কিন্তু পারে নি। ধরা পড়ে জেলে এসেছে। নিষ্ঠুর দোকানী তাকে দোষী সাব্যস্থ করে জেলে ভরেছে। চাকরী তো গেছেই, যে মার জন্য সদানন্দ এটা করেছে সেই মাও গেছে; সদানন্দ তাকে আর দেখতে পেলনা। সে তখন জেলে।

ছেলেমেয়ের খাদ্যের জন্য একজন ধনীর বাজার-সরকার অতি অল্প কয়েকগ্রাম চাল চুরি করেছিল—জেল হয়েছে তার। কাপড়ের অভাব পূরণ করবার জন্য একদিন একখানা পুরোনো শাড়ী চুরি

করেছিল একজন—জেলে এসেছে সে—এমন আরো অনেক। অবশ্য অনেকবারের দাগী গুণ্ডা বা জন্মগত পাপীর সংখ্যাও কম নেই, তবে তাদেরও ইতিহাস কে জানে কেমন?

নীলুর মেয়াদ কম সুতবাং তার ছাড়া পাবার দিন এগিয়ে আসছে। হয়তো বাবা এর মধ্যে ফিরেছেন; হয়তো নীলুর এই অধঃপতনে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন—হয়তো ক্লাবের ছেলে মেয়েরা নীলুকে মহা অপরাধী স্থিব কবে তার নাম পর্যন্ত করা বন্ধ করেছে। হয়তো অধ্যাপক শিববামবাবু এবং তাঁর পবিবারের সকলেই বিশেষত লক্ষ্মী নীলুর নামও করে না।—রাত্রে শুয়ে নীলু ভাবে এইসব কথা। তার জীবনের পরিধিতে যেখানে যে আছে সকলের কথাই ভাবে সে—আর ভাবে, ছাড়া পেয়ে সে করবে কি? যাবে কোথায়? বাবার কাছে কোন্ মুখে আব ফিরবে নীলু!

না—বাবার কাছে সে আর যাবে না—আর যেখানে হোক সে যাবে—বাবার কাছে নয়। বাবার কাছে আর এ জীবনে মুখ দেখাতে পারবে না নীলু। কোন মুখে নীলু তার ঋষিপ্রতিম বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে?—না না—নীলু আর যাবে না।

বিদ্যে কিছু আছে, বুদ্ধিও আছে তাই ভাবছে নীলু চলে যাবে দূরে কোথাও। বহু দূরে যেখানে বাবা বা আর কেউ তার খোঁজ পাবে না। যেখানে নীরা বা তার মত নেই কেউ যে তাকে মোহগ্রস্থ করবে। যাবে যেখানে নারী নেই—হাসলো নীলু—নারী নেই এমন জায়গা তো দুনিয়ায় থাকা সম্ভব নয়, তবে সে সাবধান থাকবে নিজেকে সতর্ক রাখবে। জেলের আইন সুষ্ঠভাবে পালন করার জন্য এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালনের জন্য নীলুর দণ্ডাদেশের মেয়াদ শেষ হবার সঙ্গেই তার মুক্তি পাবার আদেশ হোল। জেলার সাহেব তাকে ডেকে বললেন—

কাল সকালেই তুমি ছাড়া পাবে নীলু—সাবধানে থেকো এবার—

—আপনার আশীর্ব্বাদ—নীলু হাত তুললো কপালে।

পরদিন ভোরেই নীলু খালাস পেল। সূর্যোদয়ের আগেই সে ছাড়া পেয়েছে বেরিয়ে নীলু একবার ভাবলো বাড়ীই সে ফিরবে, বাবার সঙ্গে দেখা করবে—কিন্তু বাবার সামনে দাঁড়াতে তার যেন অতিরিক্ত সঙ্কোচ জাগছে। তার বাবা—যিনি জীবনে শুধু ক্ষমাই করে এসেছেন সকলকে—হয়তো নীলুকেও তিনি ক্ষমা করবেন কিন্তু নীলু সে ক্ষমা সইতে পারবে না না, নীলু যাবেনা।

নীলু ধীরে ধীরে পা বাড়ালো অন্য দিকে, যে দিকে বাড়ী যাবার পথ, তার বিপরীত দিকেই গেল সে। কোথায় গেল. কেউ জানলো না—নীলু হারিয়ে গেল।

যথাসময়ে অসিত বাবু খোঁজ করলেন নীলুর। জেল থেকে তাকে আনবার জন্য লোক গেল—গেল ক্লাবের বন্ধুবাও, নীলু নাই। সে আগেই খালাস পেয়ে বাড়ী চলে গেছে, জানলো সকলে—কিন্তু বাড়ী তো যায়নি—গেল কোথায় তাহলে ?

অসিতবাবু শুনলেন খবরটা—নিশ্চুপ বসে রইলেন তিনি পাথরের মত! দীর্ঘ সময় চলে গেল। অসিতবাবু বসে আছেন। বেয়ারা এসে বললো,

—টেলিফোন—

—বলে দে এখন কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবো না।

কথা তিনি আর বললেন না। ক'দিনই কারো সঙ্গে কথা বলেন নি—হঠাৎ সেদিন এল লক্ষী। বাড়ার গাড়ীতে এসেছে—একা! এ বাড়ীতে আগে সে আসেনি। ইচ্ছে ছিল—এই বাড়ীর বৌ হয়েই আসবে—তা হোল না। তবু সে এল—এল অসিত বাবুকে দেখতে, সান্ত্বনা দিতে। অসিতবাবু নীচের ঘরেই ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন। চোখ বোজা ছিল ঘুমান নি—কোমল করস্পর্শ লাগলো কপালে। চেয়ে দেখলেন লক্ষী।

—তুই এসেছিস মা?

—এলাম—না এসে পারলাম না জেঠামশাই—কোন খবর পান নি?

—না, খবর পাবার আশা আর করি নে মা।

—না না ওকথা বলবেন না—খবর নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিন—লিখুন আপনি অত্যন্ত অসুস্থ।

—না, অসিতবাবু বললেন—কিছুই আমি করবো না মা—বিধাতার যা ইচ্ছা তাই ঘটে—তাই ঘটবে। আমি নির্ব্বিকার।

—কর্ত্তব্য রয়েছে জেঠামশাই!

—না—সে অবুঝ নয়, নির্ব্বোধ নয়, সে আমার একমাত্র সন্তান। আমার দিকটা বিবেচনা না করে যে চলে গেল সে যাক—তার প্রতি কোন কর্ত্তব্য আমার নেই মা—নেই।

লক্ষ্মী আর কিছু বলতে সাহস করলো না। ধীরে সে হাত বুলিয়ে চললো অসিতবাবুর মাথার টাকে। অসিতবাবু বললেন,

—ওর জন্য তোর অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নেই লক্ষ্মী। তুই যোগ্য পাত্রকে বিয়ে কর—তোর জীবন সার্থক হোক।

—ওকথা এখন থাক জেঠামশাই।

—আচ্ছা থাক, কিন্তু শুনলাম অমরবাবুর ছেলে অমিয়র সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। ছেলে খুব ভাল লক্ষ্মী—

—তা' হোক—আমার বিয়ে এখন বন্ধ রইল জেঠামশাই—আমি আরো পড়বো।

—পড়বি? কি পড়বি?

—সংস্কৃত পড়ে উপাধি পরীক্ষা দেব—

—আচ্ছা মা তাই দে—কিন্তু বিয়ে করিস। গার্গী মৈত্রেয়ীও বিয়ে করেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিবাহ-ধর্ম্ম পরম ধর্ম্ম। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ঋষিরাও পালন করতেন।

—গৃহজীবন যদি সুখের হয় তবেই তা ধর্ম্ম জেঠামশাই, নইলে···

—সুখের হবে না কেন মা—?

—কৈ হয়? আপনার কেন হোল না? কি আপনাব অপরাধ?

—হয়তো পূর্ব্ব জন্মের পাপ—

—আমার যে পূর্ব্ব জন্মের পাপ নেই তা কে জানে জেঠামশাই?

অসিতবাবু থেমে গেলেন। ভাবতে লাগলেন লক্ষ্মীকে তিনি পুত্রবধূ করতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্মী অরাজি ছিল না। নীলুই আপত্তি করেছিল কিন্তু লক্ষ্মী দেখছি পূর্ব্বরাগে অভিষিক্তা। কখন এটা হোল? এ তো ভাল হয় নি। নীলু ফিরলে সাদরে তিনি লক্ষ্মীকে আনতে পারতেন বাড়ীতে। কিন্তু একি হোল!

লক্ষ্মী আরো কিছুক্ষণ বসে রইল। বলল,—মাঝে মাঝে আমি আসবো জেঠামশাই—আপনাকে দেখে যাবো।

—আসবি মা—তোর যখন ইচ্ছে আসিস। নীলু যদি ফেরে—

অসিতবাবু আর বলতে পারলেন না। চোখে তাঁর কদিন পরে আজ জল এসে গেল।

নীলু জেল থেকে বেরিয়ে সটান এল গঙ্গার ধারে। স্নান করলো এবং চলে গেল পদব্রজে। যাবার একটা জায়গা অবশ্য সে ঠিকই করে রেখেছিল মনে মনে। সেখানেই গেল।

পূর্ব্বের পরিচয় তার সঙ্গে এদের। এটি একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান। —জীব এবং জীবনের সেবাই এঁদের ধর্ম্ম। কলকাতার কাছে হলেও এদের খবর খুব বেশী লোকে রাখে না। চিদানন্দ নামে

জনৈক মহাপুরুষ তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং চালাচ্ছেন।

অতি সন্তর্পণে তাঁর কাজ চলে। হৈ চৈ বা খবরের কাগজের ঢাক তিনি পছন্দ করেন না। চাঁদা তিনি তুলতে যান না তবে শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি কেউ কিছু দেন তো তা গ্রহণ করেন।

নীলু পৌঁছালো। স্বামী চিদানন্দ তাকে দেখেই শুধোলেন,

—সংবাদপত্রে যে নীলোৎপলের কথা মাসখানেক আগে পড়েছিলাম, সেকি তুমিই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জেল থেকে খালাস পেয়েই আসছি।

—আমি কি করতে পারি তোমার?

—আশ্রয় দিন আমাকে—আপনার কাজে লাগান।

—তুমি তোমার বাবার একমাত্র পুত্র—যোগ্য পুত্র—বাড়ী ফিরে যাও!

—না, এ মুখ আমি বাবার কাছে দেখাতে পারবো না—আশ্রয় দিন আমায়।

স্বামীজী ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু দেখলেন নীলু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সে বললো—সংসারের উপর মোহ সে কাটাতে চায়। নারী সম্বন্ধে তার ধারণা অত্যন্ত কদর্য্য হয়ে গেছে। আর সংসার নারী ছাড়া চলে না—সুতরাং তার আর না ফেরাই ভাল। স্বামীজী তাকে দূর কোন দেশে পাঠিয়ে দিলে সে আশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করবে।—তাকে গ্রহণ না করলে সে অন্যত্র আশ্রয় ভিক্ষা করতে যাবে—বাড়ী ফিরবে না।

স্বামীজী বুঝলেন নীলুর চঞ্চল মনের অবস্থা। এখন তাকে কিছুদিন আশ্রয় না দিলে সে হয়তো বহু দূর দেশে চলে যাবে। অতএব তিনি বললেন,

—থাক—আমার কোন আপত্তি নাই। তবে যখনই ইচ্ছা

হবে জানিও, তোমাকে আমি ছেড়ে দেব।

—আমার সেরকম ইচ্ছে হবার কোন সম্ভাবনাই নাই আর।

নীলু রইল। তিন চারদিন পরে স্বামীজী বললেন,—নাসিকে কুম্ভযোগ এবার। সেখানেই সেবার কাজ করতে যাব—চল নীলু।

—চলুন—নীলু কৃতার্থ হয়ে গেল। পরদিনই ওরা নাসিকে চলে গেল সদলবলে।

নীলুকে কিছুদিন রেখে তার মন কিছুটা শান্ত হলে তাকে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, এই ছিল স্বামী চিদানন্দের ইচ্ছা। কিন্তু নীলু এখানে কাজে যোগ দিয়েই এমন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে লাগলো এবং আশ্রমের আয়ও বাড়িয়ে দিল যে স্বামীজীর পক্ষে তাকে ছাড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। নীলু প্রায় অপরিহার্য্য হয়ে উঠলো তাঁর কাছে। বিদ্যাবুদ্ধি এবং কর্ম্মনিষ্ঠা নীলুর এত বেশী যে স্বামীজী ভাবতে আরম্ভ করলেন, নীলুকেই তিনি তাঁর এই সেবা-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মভার দিয়ে যেতে পারবেন। তবু নীলুর বাবার কথা স্বামীজী ভাবেন। একদিন প্রশ্নই করলেন,

—তোমার বাবার কাছে তোমার ফিরে যাওয়া কি উচিৎ নয় নীলু?

—আমি সেবাব্রত গ্রহণ করেছি দেব। বাবা আমার ধনী ব্যক্তি। তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কোন চিন্তা নেই। তাঁর বিষয় সম্পত্তি বিস্তর—তিনি দত্তক নিতে পারবেন। তাছাড়া তিনি ধর্ম্মভীরু লোক—তাঁর কিছু আটকাবে না। স্নেহ-ভালবাসার দিকটাও হয়তো আছে, সেখানে তিনি খুবই দুঃখ পাবেন আমার জন্য কিন্তু আমি গেলেই তিনি আমাকে সংসারে বন্দী করে ফেলবেন। আমার কিন্তু ইচ্ছে নেই।

—কেন? সংসার করাও ধর্ম্ম নীলু।

—ছিল—আগের যুগে ছিল যখন নারী নীরার মত ছিল না।

— সব নারীকেই তুমি নীরা ভাবছো কেন নীলু?

—ওরা সব সমান—সবই নীরা বা নীরার মা বা নীরার সমধর্মী মেয়ে। প্রভু, নারীকে আমি আর বিশ্বাস করিনে—তাকে নিয়ে যত ইচ্ছে ভোগ করা যায—মানব হয়ে দানব হওয়া যায়—কিন্তু তাকে নিয়ে ধর্ম্ম করা যায—এ বিশ্বাস আমার নেই আর।

—তোমার ভুল হচ্ছে নীলু—হয়তো একদিন কঠোর আঘাতে এ ভুল তোমার ভাঙবে। তাহলে যাবে না বাড়ী?

—না দেব—আমায ও-আশীর্ব্বাদ করবেন না।

—বেশ—থাক—তবে নারী সম্বন্ধে তোমার মত বদলাতে হবে। কারণ সেবার পবিত্র কাজে তারাও পরম সহায়।

—ওসব বেদ ঔপনিষদ গীতা-ভাগবৎ শুনে কিছু লাভ নেই প্রভু—'সারমন' আমি অনেক শুনেছি—নীলু তীব্র প্রতিবাদ করলো, নারীও আমি অনেকগুলো দেখলাম—বর্তমান যুগে তাদের নীতি হচ্ছে—পুরুষকে ধর—নাকানি-চোবানি খাওয়াও তারপর ছেড়ে দাও—ধর আরেক জনকে—পুরুষেরও তাই নীতি, নারীকে নষ্ট কর—তারপর পথে ফেলে দাও—এই দুই-এর মাঝে কচিৎ-কদাচিত কেউ বেদ-ব্রহ্মলোক থেকে যদি খসে পড়ে তো তাকে গণনায় আনা যায় না। সে ডেসিমেলের অঙ্ক—তাছাড়া সব ঐ নীরা—এখানে চানক্যই সত্যি বলেছেন—বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং স্ত্রীষুরাজকুলেষুচ—।

নারী-সম্বন্ধে এই বিদ্বেষ দূর করা সহজ নয়—স্বামীজি আর কিছু বললেন না। বুঝলেন, নীলুকে যদি কেউ ফেরাতে পারে তো কোন নারীই পারবে। নীলু বললো—

আমার শরীর-স্বাস্থ্য চেহারা এবং অর্থ, যা থাকলে নারীসমাজের অন্ততঃ শ'খানেককে জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায়, তার সবই আমার ছিল প্রভু—জেলে বসে ভেবেছিলাম অতঃপর তাই আমি করবো—

করতামও—করলাম না শুধু আমার বাবার কথা ভেবে। নইলে আমি ঐ নীরা-জাতীয়া গণ্ডাকতককে জলে ডোবাতাম। এখন এই পবিত্র সেবাব্রত গ্রহণ করে আমি বুঝেছি—(আত্মাকে আনন্দিত করার চেষ্টা দেহকে আনন্দ দেওয়ার চাইতে মহত্তর, কারণ দেহকে আনন্দ দেওয়ার মধ্যে আছে অবসাদের নৈরাশ্য—আত্মাকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টায় আছে অবিনশ্বর মহিমা যা মানুষকে মানবত্বে উন্নীত করে।)

স্বামীজী বুঝলেন—নীলুকে ফেরানো সহজ হবে না। নীলু আবার বললো—

—প্রেম দিয়ে জীবনকে বেঁধে রাখা যায় প্রভু যা ছিল সীতা সাবিত্রীর মধ্যে কিন্তু সেসব অতীত যুগের কথা অথবা কল্পনার কথা কে জানে। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম ওসব মানে না। ভারতের সতী-আত্মা একদৌড়ে বিদেশের গরম মাটিতে গিয়ে পড়েছে। সেখানে সীতাকে আহাম্মক বলা হয়—সাবিত্রী একটা ককেট। সে দিব্যি কাজ আদায় করে নিল যমের কাছে—যা সীতা পারলো না। ওসব চরিত্র নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি—না—ওগুলো আর নেই। এখন যারা আছে তারা নীরা—সব ঐ নীরার দল। স্বার্থের জন্য তারা খুন করতে একটুও পিছোয় না। আর এসব কথা বলতে গেলে আমাকে তারা—অধ্যাত্মবাদী আহাম্মক বলে গাল দেবে।

—শোন নীলু—নারী সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা ত্যাগ কর। জীবনকে জ্বালাময় করো না। নারীর বিষয়ে তুমি নির্ব্বিকার হয়ে যাও—ভালমন্দ কিচ্ছুই ভেবো না।

—যে আজ্ঞে—তা হতে পারে।

নির্বিকারই হয়ে গেল নীলু নারী-জাতি সম্বন্ধে। আশ্রমে কোন নারী নাই—কয়েকটি যুবক শিষ্য আর স্বামীজী স্বয়ং এই আশ্রম চালান। খুব গরীবানা ধরনেই এতদিন চলছিল—এখন

নীলু এসে এর কাজের কিছু প্রসার করেছে—অর্থাৎ বাড়িয়েছে। একটা অবৈতনিক পাঠশালা সে খুললো—একটা খেলার মাঠ তৈরী করলো এবং ছোট ছেলেদের নিয়ে খেলাধূলো আর সাঁতার শেখাতে লাগল। টাকাকড়িও যথোচিত ভাবে এসে যেতে লাগলো—কারণ ওদের কাজ খুব ভাল—সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন। কলকাতার অত্যন্ত কাছে—তাই প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মত কেউ ওদের দেখে না—প্রচারের ঢাক ওরা একেবারেই বাজায় না। নিঃশব্দে চলছে কর্ম্ম-প্রবাহ।

নাসিক থেকে ফিরে নীলু আরো কয়েকটা কাজ খুললো—কারিগরি বিদ্যার কাজ। সরকারী সাহায্যেরও আবেদন করলো এবং পেলও। নিজের নামকে নির্লোপ করে শুধু স্বামীজীর নামেই সে সব কাজ করছে। আশ্রম ভালই চলছে।

নীলু খবরের কাগজে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দেখে। না—তার বাবা কোন বিজ্ঞাপন দেন নি। তাহলে তিনি ভালই আছেন। চিন্তার কোন কারণ নেই তাঁর জন্য। অন্য আর কারো জন্য ভাববার নেই নীলুর। না—আছে। আর একজন আছে যার কথা নীলু না ভেবে পারে না। লক্ষ্মী আছে তার জীবনের পরিধিতে। লক্ষ্মী বলেছিল,

—জীবনকে মহান আর সুন্দর করতে প্রেম প্রয়োজন—যে প্রেম ত্যাগে আর তপস্যায় মহীয়ান—যে প্রেম শুধু যৌবনধর্মী নয়, যে প্রেম জীবনধর্মী।

—এরকম প্রেম আছে নাকি পৃথিবীতে?—নীলু প্রশ্ন করেছিল। উত্তরে লক্ষ্মী বলেছিল,

—আছে—যৌবনধর্মী প্রেমকে অতিক্রম করে আচ্ছন্ন করে আছে জীবনধর্মী প্রেম যা দেখেছি তোমার বাবার মধ্যে।

নির্বাক হয়ে গিয়েছিল নীলু—হ্যাঁ কথাটা তো সত্যিই—কিন্তু

বাবা পুরুষ মানুষ। তাঁর মধ্যে প্রেম থাকতে পারে—নারীর মধ্যে নেই। নারীরা সব ঐ নীরা—লক্ষ্মীও। না-না—লক্ষ্মীর সম্বন্ধে অবিচার করছে নীলু। লক্ষীর চাপা অন্তর কোন দিন প্রকাশ করে নি নীলুর প্রতি তার ভালবাসা—তারপর যখন দেখল নীলু নীরার প্রতি আকৃষ্ট—লক্ষী নিজেকে গুটিয়ে নিল—সংযত হয়ে গেল, নিঃশব্দে সরে গেল—না, সাবধান সে করে দিয়েছিল নীলুকে।

নীলু শোনে নি তার কথা। এ জগতে যদি সত্যি কেউ নীলুর হিতৈষী বান্ধবী থাকে তো সে লক্ষ্মী।

নীলু তাকে ভুলতে পারে না।

লক্ষ্মী সেদিন চলে এল অসিতবাবুর বাড়ী থেকে। নীলুর সঙ্গে তার পরিচয় দীর্ঘ দিনের। তার কারণ—নীলু তার দাদার সহপাঠী। শুধু সহপাঠিই বলা চলে, সঙ্গী নয়—তার কারণ নীলু দক্ষিণ কলকাতার অধিবাসী আর লক্ষ্মীরা থাকে উত্তর কলকাতায়। ব্যবধান অনেকখানা। তাছাড়া নীলুদের ক্লাব ইত্যাদিতে লক্ষ্মীদের যোগদানের সুযোগ কম। ওরা কিছুটা রক্ষণশীল পরিবার—ওখানে সে-সব বাড়ীতে শাঁখ বাজে, সান্ধ্যদীপ জ্বলে এবং সত্যনারায়ণের পূজা হয়—বার ব্রত উপবাসও আছে। এপাড়ায় ওগুলো কুসংস্কার। এখানে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের লোকই বেশী।

লক্ষ্মী যেভাবে এবং যে আবেষ্টনীতে প্রতিপালিত হয়েছে তাতে পূর্ব্বরাগের সম্ভাবনা কম—কিন্তু মানুষের অন্তর আইন-কানুন মানেনা। সংস্কারকেও অতিক্রম করতে তার বাধেনা—যদি সম্ভাবনার দিকটা শুভ মনে হয়। এখানে তাই হোল—নীলুর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক থেকে আরম্ভ করে বহু বিচিত্র ব্যাপারের আলোচনা

হোত লক্ষীর। কখন যে তার অন্তরে পূর্ব্বরাগ সঞ্চিত হয়েছে লক্ষ্মী জানতে পারেনি—যেন মনের অজ্ঞাতে অত্যন্ত চুপিসাড়ে নীলুর প্রতি তার প্রেম অগাধ হয়ে উঠেছে। লক্ষী জানতে পারে নি—জেনেছেন তার মা। তিনিই স্বামীকে বললেন,

—লক্ষ্মীকে নীলুর হাতে দিলেই তো হয়।

—কথাটা ভেবে দেখবার মত।—লক্ষ্মীর বাবা বলেছিলেন—বেশ বেশ, চেষ্টা করি।

—হ্যাঁ—কর। ঘরেই যখন অত ভাল ছেলে রয়েছে তখন বাইরে কেন খুঁজতে যাব। তাছাড়া ওদের বোধহয় পূর্বরাগও হয়েছে।

অধ্যাপক আর দেরী করলেন না—অসিত বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাব করলেন—কিন্তু তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হোল না। গ্রহণ করলো না স্বয়ং নীলু। দুঃখের কথাই কিন্তু খুব দুঃখিত হবার কি আছে? লক্ষ্মী তাঁদের ভাল মেয়ে। তার বিয়ে আটকাবার কথা নয় এবং বিয়ের ব্যাপারে যেসব খরচ-খরচা আছে তাও করতে অধ্যাপক মশাই রাজি আছেন—সুতরাং দুঃখিত হলেও ব্যাপারটাকে খুব আমল দিলেন না তাঁরা।

আমল দিল লক্ষ্মী। তার নিশ্চয় আশা ছিল নীলু সানন্দে তাকে গ্রহণ করবে। করলো না—এর করণটা তখনো জানেনি লক্ষ্মী—জানলো অভিনয় দেখতে গিয়ে। আঘাতটা সামলাতে যথেষ্ট বেগ পেয়েছে লক্ষ্মী, হয়ত এখনো ঠিকমত সামলাতে পারেনি। ঠিক এই সময় ঘটল নীলুর জীবনে বিপর্য্যয়—সে জেলে গেল।

সাধারণ মেয়ে হলে হয়তো লক্ষ্মী নীলুর এই জেলে যাওয়ায় আনন্দিতই হত—ভাবতো, আচ্ছা হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে; যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। কিন্তু লক্ষ্মী সাধারণ মেয়ে নয়। সে শুধু অসাধারণই নয় অনন্যসাধারণ—তার জোড়া বর্ত্তমান দিনে কমই

পাওয়া যায়। তাই লক্ষ্মী ভাবলো নীলুর এই শাস্তি তারও শাস্তি। কারণ নীলুর সঙ্গে তার অন্তরের অপ্রত্যক্ষ যোগ অপরিম্লান—সেখানে মানুষের আইন প্রবেশ করতে পারে না। নীলুর এই শাস্তি এবং অপমান তারও শাস্তি এবং অপমান এই জন্য যে আপন প্রিয়তমকে লক্ষ্মী রক্ষা করতে পারলো না। তাকে ধরে রাখতে পারলো না। তার অধঃপতন রোধ করতে পারলো না—লক্ষ্মীরই অক্ষমতা এটা।

এতোটা ভাবলো লক্ষ্মী—কারণ সে তার সারা অন্তর দিয়ে নীলুকে ভালবেসে ফেলেছে সে প্রেমের খবর তার নিজেরও জানতে দেরী হতে পারে—কিন্তু যখন জানলো—তখন আর ফেরার উপায় নাই। নীলুর কারাদণ্ডকে লক্ষ্মী নিজের কারাদণ্ডই মনে করলো এবং নীলুর চলে-যাওয়াকে নিজেরই অপরাধ বলে ধারণা করলো।

এর একটা ছোট কারণ আছে। লক্ষ্মীর সঙ্গে নীলুর বিয়ের প্রস্তাব করবার পূর্ব্ব দিন নীলু গিয়েছিল লক্ষ্মীদের বাড়ী। লক্ষ্মীর দাদা বাড়ীতে ছিল না কিন্তু নীলুর কোন অসুবিধা হোল না—সে বসলো লক্ষ্মীর পড়ার ঘরে। লক্ষ্মী তাকে বললো,

—আমাদের শাস্ত্রে আছে নট-নটীরা জনগণকে আনন্দ দেন—তাই তাঁরা নমস্য—তারা দেশের গৌরব—কিন্তু শ্রেণী হিসাবে তাঁরা স্বতন্ত্র শ্রেণীর—জনগণের জীবন-যাত্রায় তারা আদর্শবাদ প্রচার করেন—নিজেদের জীবনাদর্শ কিন্তু তাঁদের ভিন্ন—আপনি একথা মানেন কি না!

—না—মানি না—নীলু বলেছিল—ওটা যদি ঋষি-বাক্য হয় তো ওটা মিথ্যা বাক্য। অভিনয় যাঁরা করেন—তাঁরাও মানুষ। তাঁদের জীবনাদর্শ স্বতন্ত্র হতে যাবে কেন?

—কারণ তাঁদের জীবন থেকে সত্যকার প্রেমানুভূতি চলে যায়।

—তার কারণ কি ?

—বহু ব্যক্তির সঙ্গে বহু রকমেব প্রেমাভিনয়ের মাধ্যমে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রেম হারিয়ে যেতে বাধ্য। কারণ প্রত্যেকটি অভিনয়ে স্বতন্ত্র অনুভূতিকে তাঁদের প্রকাশ করতে হয়। এই বহু আশ্লিষ্টতা অর্থাৎ বহু-পরিচর্যার আবেষ্টনীতে নিজকে ঠিক রাখা যায় না।

—নিশ্চয় যায়—নীলু তর্ক করেছিল।

উত্তরে লক্ষ্মী বলেছিল,—ধরুন—আপনি কোন একটি মেয়েকে ভালবাসেন—এখন অন্য একজনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছেন এবং সেই অভিনয়েব পরিপূর্ণ রূপ দান করতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সেই নাযকে পরিণত করেছেন—কিন্তু তখন আপনার সেই পূর্ব্বরাগের প্রিয়তমার স্থান কোথায় রইল ?

কথাটার ঠিকমত জবাব দিতে পারে নি নীলু। কিছুক্ষণ ভেবে বলেছিল,

—মানুষের মন বর্ত্তমান যুগে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। সেখানে একাধিক পুরুষ বা নারার ঠাঁই হতে পারে—হচ্ছেও তাই।

—হচ্ছে না—লক্ষ্মী বলেছিল—তাই বর্ত্তমান যুগে নিষ্ঠার এত অভাব। তাই ঘরে ঘরে জীবন যন্ত্রনাময়। (প্রেমের জীবনে প্রিয় বা প্রিয়া এক অদ্বিতীয়—দ্বিতীয় এলেই সেটা মলিন ছায়াময় হয়ে যায়।)

নীলু তর্ক করবার জন্য বললো,

—তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ তো হাজার কতক নিয়ে প্রেম করতেন। লক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ বলেছিল,—উদাহরণটা ঠিক হোল না—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। সমুদ্রে বহু নদী আত্মবিসর্জন করে—শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদ্র। তাঁতে সমর্পিতা হলে সব শেষ হয়ে যায়—নদীর মিঠে জল নীল লবনাম্বুতে মেলে—সেখানে আর কিছু নাই—সে মহাপ্রেমে সব প্রেমের বা কামের সমাপ্তি—তাই গোপ-গোপী অর্থাৎ অনন্ত

মানবাত্মা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পন করে—মানুষ তার পার্থিব প্রেমের মাধ্যমে সেই অপার্থিব প্রেমেরই সাধনা করে, বর্ণবোধ শেখে।

নীলু নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছিল। চা খাচ্ছিল সে। লক্ষ্মীর মা কোন একসময়ে এসে ওদের কথার কিছু অংশ শুনেছিলেন। ঐ সব বড বড কথা না বুঝসেও তিনি সাধাবণ ভাবে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিতা মেয়ে। শুনতে পেলেন, নীলু বলছে,

—এসব খুব উচ্চাঙ্গের কথা লক্ষ্মী—জীবনে কি তেমন সঙ্গিনী পাওয়া যায—?

—হয়তো যায়—পাওয়াব চেষ্টা তো করা উচিৎ। তা না করে যদি কেউ যেখানে-সেখানে হাত বাডায় তো তাকে বঞ্চিত হতে হয়।

—না—বঞ্চিত আমি হব না। আমার হাত ঠিক যায়গাতেই বাড়িয়েছি।

লক্ষ্মী আর কিছু বলেনি এর উত্তরে। ওর মা শুনে গিয়েছিলেন। শুনে তিনি ভেবেছিলেন—লক্ষ্মী আর নীলুর মধ্যে কথা প্রায় পাকাই হয়েছে। অতএব আর দেবী করা কেন। লক্ষ্মীও নীলুব ঐ কথাটুকুকে তার ভবিষ্যতের সম্বল মনে করেছিল—ভেবেছিল—নীলুর হাতটা তার দিকে আসছে—পানিগ্রহণের আশায়।

কিন্তু ভুল করেছিল লক্ষ্মী—। নীলুর কথাটা লক্ষ্মীর জন্য নয়, নীরার জন্য—এটা বুঝতে লক্ষ্মীর সময় লেগেছে। কিন্তু যখন বুঝেছে—তখন লক্ষ্মী এগিয়ে পড়েছে অনেকখানি। নীলুকে সে ভালই বেসে ফেলেছিল—এবং ভেবেছিল নীলু তাকে সাদরে গ্রহণ করবে। না—হোল না। আত্মসমর্পিতা লক্ষ্মীর অন্তর অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হোল—কিন্তু সে যে ধরনের মেয়ে—তাতে তার মন বিরূপ হোল না—বরং ভাবলো, তার নিজেরই অযোগ্যতার জন্য নীলুকে

সে লাভ করতে পারলো না। এর প্রতিবিধান আর কি করবার আছে জানে না লক্ষ্মী।

অকস্মাৎ নীলুর কারাদণ্ড—লক্ষ্মী ভাবলো—সে অপেক্ষা করবে। তারপর নীলু নিরুদ্দেশ।

কেউই প্রস্তুত ছিলনা নীলুর নিরুদ্দেশের জন্য। সকলেই ভেবেছিল—মেয়াদ অন্তে নীলু ফিবে আসবে এবং সবই স্বাভাবিক হয়ে যাবে! লক্ষ্মীও তাই ভেবেছিল—এবং ভেবেছিল পুরুষের মতিভ্রম হয়—আবার—সে ভ্রম ভেঙে যায়—তখন সে তার স্বস্থানে ফিরে আসে। নীলুও ফিববে। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই হয়তো সে লক্ষ্মীকে গ্রহণ করবে। অপেক্ষা করেছিল লক্ষ্মী—হঠাৎ শুনলো নীলু নিরুদ্দেশ।

নিজকে সামলাতে সময় অবশ্য লাগলো তার কিন্তু নিজের গভীর দুঃখের ভেতরেও লক্ষ্মী অনুভব করলো নীলুর বাবার অন্তর-বেদনা। স্নেহশীল বৃদ্ধ নিজেকে কতখানি বঞ্চিত করে নীলুকে মানুষ করেছিলেন। অমন একজন প্রেমিক পুরুষের পুত্র নীলু এ কি করলো?

নীলুব বাবার জন্য লক্ষ্মীর কিছু করা নরকার। নিজের জন্য সে খুব ভাবে না। বিয়ে সে এখন করবে না—পড়বে। কিন্তু অসিত বাবুর জন্য ওর মন কাঁদলো—তাই সে এলো অসিত বাবুর বাড়ী। যদি নীলু ফেরে তো হয়তো লক্ষী এই বাড়ীতেই আসতে পারবে—অথবা তা যদি নাও হয়—তবু নীলুর বাবার উপর লক্ষ্মীর কিছু কর্ত্তব্য রয়েছে—সেটা সে করতে চায়।

লক্ষ্মী খুব বেশী আসে না। আসে মাঝে মাঝে। অবশ্য খবর সে প্রায় নিত্যই নেয় ফোন করে। অসিত বাবুর ইচ্ছে যদি নীলু কখনো ফেরে তো লক্ষ্মীকে তিনি আনবেন পুত্রবধূ করে।

কিন্তু মাসের পর মাস গেল—বছর চলে গেল—নীলুর কোন

খবর পাওয়া গেল না। তার জন্য কেন আর হাহুতাশ—অসিতবাবু নিরাশ হয়ে নীলুর ফেরার আশা ছেড়ে দিয়েছেন—এখন তার বিষয় সম্পদ নিয়ে কি করবেন তাই ভাবছেন। কতকগুলো জন-হিতকর কাজ করলেন তিনি। সরকার থেকে তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধি দেওয়া হবে। এই মহাসম্মান গ্রহণের জন্য তিনি দিল্লীতে গেলেন। সম্মানিত হলেন অসিতবাবু—স্বয়ং রাষ্ট্রপতি তাঁকে সম্মানিত করলেন।

এরোপ্লেনে উঠতে চাননা অসিতবাবু। হার্ট ভাল নয় তাই মেল ট্রেনে ফিরছেন কলকাতায়। গাড়ী সবেগে আসছে—ধানবাদ ষ্টেশনে এসে পৌঁছাল।

উলুর বিয়ের আর দেরী নাই—আয়োজন চলছে ইউনিট সাহেবের কোয়ার্টারে। আয়োজন আর কি—কিছু মদ আর মাংস। মাংসটা শূকরের হলেই ভাল হয়। আজকাল যা দাম হয়েছে শূকরের। দেহাত থেকে আনলে কিছু সস্তা পাওয়া যাবে। ইউনিট সাহেব শনিবার ছুটির পর কাছাকাছি গ্রামে গেল ছুটো শূয়োর-পাঁঠা কিনতে। শূয়োর ধরে আনা সহজ ব্যাপার নয়—তাই সঙ্গে তার সঙ্গীরাও গেল কয়েকজন। উলু একা আছে কোয়ার্টারে। রাত প্রায় এগারটা।

উলু ভাবছে—যতটা ভাবনা তার পক্ষে করা সম্ভব ততটাই ভাবছিলো। চিন্তায় কালো হয়ে উঠেছে ওর মুখখানা—দেবকী দোসাদকে বিয়ে করতে হবে। বয়স তার কত কে জানে—চল্লিশতো হবেই তাছাড়া মাতাল এবং অত্যন্ত বদরাগী লোক সে, জানে উলু। এর আগের বৌকে ঠেঙিয়ে মেরেছে। সে খবরও জানা—কিন্তু

মিঃ ইউনিট ওর কাছে অনেক টাকা ধার করেছে। দেবকী ধনী ব্যক্তি—এই ধন তার সাধারণ রোজগার থেকে আসে নি—জুয়া-খেলয়াড়দের চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে এই টাকা তার।

দেবকী লোকটি অতিশয় ধূর্ত্ত আর স্বার্থপর। নিজের কাজ গোছাবার জন্য সে না করতে পারে এমন কাজই নেই। সেই দেবকীকে বিয়ে করতে হবে—এবং তার সঙ্গে ঘর করতে হবে উলুকে।

উলু ভয়ে কাঁপছিল কথাটা ভাবতেই। রাত ক্রমশঃ বাড়ছে। উলু চিন্তা করছে একা—ইউনিট এখনো শূয়োর নিয়ে ফেরে নি। ফিরবে কখন কে জানে, বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ—অন্ধকার রাত। অমাবস্যা নাকি আজ? কে জানে—কে আর তিথির খবর রাখে। মা রাখতো। উলুর মা উৎপলা। আহা! অভাগী কত কষ্টই না পেয়ে গেল ইউনিট সাহেবের হাতে। দুবেলা ভাত, তাও কোন দিন চোখের জল না ফেলে জোটে নি তার। বাবার কথা উলুর মনে পড়ে না কিন্তু মার কথা কি ভোলা যায়?—এই তো সেদিনও মা বেঁচে ছিল। মা মরেছে ভালই হয়েছে। অত কষ্ট করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা ভাল। উলুও মরবে—মরলেই ভাল হয়, মরণকে ত ডাকছে উলু—বাইরে তাকাল।

ওঃ কী অন্ধকার! মৃত্যুর মত কালো অন্ধকার, হিম-শীতল নিবিড় কালো অন্ধকার! মৃত্যুর শীতল কোল—এই স্নিগ্ধ মরণ তো ডাকছে তাকে। এই তো সময়—"মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম-সমান—"আওড়ালো উলু! না—আর দেরী করা চলে না—মরণকে আলিঙ্গন করবে উলু দেবকী দোসাদকে আলিঙ্গনের আগে! মরণের বুকে চলে যাবে সে। ইউনিট হয়তো এখনি এসে পড়বে। উলু উঠলো—দরজাটা ভেজিয়ে দিল—বেরুলো—চলছে। সে জানে রাত বারোটা নাগাদ একখানা মেলগাড়ী যায় কলকাতার দিকে—

গাড়ীটা কী দারুণ জোরে যায়—ওরই চাকার তলায় পড়ে দলিত পিষ্ট হয়ে যাবে উলু! হ্যাঁ, মরণের দ্বার তো খোলাই।

উলু চললো—ষ্টেশন দূরে নয়—রেল লাইন আরো কাছে কিন্তু রেল লাইনটার ধারে কাছে যাবার উপায় নেই। কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া আছে। যেতে হলে ইষ্টিশনের ভেতর দিয়ে ঘুরে যেতে হবে। উলু তাই করবে। ছুটলো সে। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে—ভিজে গেল উলু—যাক—আর কতক্ষণ! এই তো ষ্টেশনে এসে পড়েছে। উলু ষ্টেশনে ঢুকে গেল প্ল্যাট ফর্মে—গেটের টিকিট কালেক্টার ওকে কিছু বলবার অবকাশই পেল না—গাড়ীটা এর মধ্যে এসে পড়লো, দাঁড়িয়ে গেল।

করে কি উলু? এর তলায় তো পড়া হোলো না। লোকেরা নামছে। খুব বেশী লোক নয়—দু' একজন মাত্র নামলো—খুব ভাল গাড়ী—সাদা সুন্দর—কামরাগুলোর জানালা সব বন্ধ।

একটা কামরার দরজা কিন্তু খুলে নামলেন একজন সাহেববেশী আর তাঁর স্ত্রীই হয়তো। দুটো সুটকেশ—বেডিং এবং আরো কিসব খুচরো জিনিস নামালেন- চলে গেলেন কুলির মাথায় মাল চড়িয়ে। দরজাটা খোলা, গাড়ীখানা চলবে, উলু উঠে পড়লো।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে। ওদিকের সাদা ধবধবে বিছানায় টাকমাথা এক ভদ্রলোক শুয়েছিলেন। তিনি চীৎকার করে উঠলেন,

—এ গাড়ী নয়, এ গাড়ীতে চড়তে নেই। নেমে যাও, এক্ষুনি নাম।

—শুনুন বাবু—উলু একেবারে তাঁর পদপ্রান্তে এসে বললো, গাড়ীটা খুব জোরে চলতে আরম্ভ করলে আমি ঝাঁপ দিয়ে নেমে যাব।

—সেকি? জোরে চলতে আরম্ভ করলে ঝাঁপ দিয়ে তুমি নেমে যাবে? তার মানে?

—হ্যাঁ ?

—কোথায় যাবে ?

—শ্বশুর বাড়ী—ওখানেই আমার শ্বশুরবাড়ী কিনা। আমি চলে যাব—আপনার কোনও অসুবিধে হবে না—

উলুর চোখেব জলটা হয়তো বৃষ্টির জল ভেবেছিলেন তিনি—এতক্ষণে দেখলেন, বললেন—আত্মহত্যা করবার মতলব নাকি তোমার ?

—না বাবু, আত্মরক্ষা করবার ইচ্ছে আমার। দয়া করে বাধা দেবেন না। আমি নিঃশব্দে ঝাঁপ দেব, কেউ জানতে পারবে না। গাড়ীটা চলুক।

—শোন—কে তুমি ? কি তোমার নাম—কি তোমাব পরিচয় ? কেন তুমি আত্মহত্যা করবে ?

—অত কথা আপনাকে বলে কি হবে বাবু ? আপনাকে বাবু বলছি—কিছু মনে করবেন না—আমার অভ্যাস কিনা, তাই—বাবা তো নেই মা ছিল—শ্বশুরবাড়ী গেছে। ছিলাম আমি আর মার সেই শয়তান বাবু যে মাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাল। এখন আমাকে পাঠাবার জন্য দেহাতে শূয়োর কিনতে গেছে। আমি সেই সুযোগে চলে এসেছি। আপনি ভাববেন না সাহেব। আমি এক্ষুনি চলে যাব—গাড়ীটা আর একটু জোর দিক—উলু দরজার দিকে এগুচ্ছে। হয়তো ঝাঁপ দেবার জন্যই। অসিতবাবু উঠে এসে ধরলেন ওকে। টেনে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে। বললেন,

—হারামজাদী মেয়ে—বল, কি জন্য তুই আত্মহত্যা করবি ?

—শুনবেন ?

—হ্যাঁ—বল সব কথা।

—শুনুন তাহালে—উলু একবার তাকালো অসিতবাবুর দিকে। বললো,

—আপনার মেয়ে আছে কি না জানিনা—যদি থাকে তো বুঝবেন। যতটা আমি জানি আমার মনে পড়ে, বলছি—।

—বল—

উলু বলে গেল আসামে তার বাবার চাকরী—তারপরের কথা এবং ইউনিট সাহেবের কাহিনী আর শঠতা এবং শেষ পর্য্যন্ত তার মার সতীত্ব হরণ—কিছুই বাদ দিল না। সবই বললো। শেষে বললো,

—মা মরবার সময় বলে গেছে—'মরবি তবু দোসাদকে বিয়ে করবিনে। ও শুধু বদরাগী মাতাল নয়—ও ডাকাত, ও ডাকাতের সর্দার। ওর হাতে পড়ার থেকে যমের হাতে পড়া অনেক ভাল।'

কাহিনীটা শুনে গেলেন অসিতবাবু নিঃশব্দে। আসানসোলে এসে দাঁড়ালো গাড়ীখানা—এতক্ষণে অসিতবাবুর মনে হোল মেয়েটাকে কিছু খাওয়ানো দরকার। দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিছু খাবার কিনে দিলেন তিনি উলুকে। বললেন,

—যা—খেয়ে ঘুমো খানিক—বাকী যা করবার আমি করবো। ঘুমো দেখি।

—ঘুমাবো ?

—হ্যাঁ—কেন ? ভয় করছে ?

—না—আপনিতো বাবা, আপনার কাছে ভয় কি। ঘুমাই।

উলু খেয়েই মেঝেতে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে গেল। অসিতবাবু দেখলেন ঘুমন্ত উলুকে। কী আশ্চর্য্য সুন্দরী মেয়ে উলু ? খুবই ভাল লোকের মেয়ে নিশ্চয়। ওর মা নিজের ধর্ম্ম রাখতে প্রাণপণ করেছিল—কিন্তু বরাত। তবু সে মেয়েকে বলে গেছে, 'মরবি—তবু নিজেকে নষ্ট করবিনে'—উলু তাই মরতে যাচ্ছিল।

ওপাশের বেঞ্চে শুতে পারতো—না—দুঃখ পেয়ে পেয়ে ও এমন

অবস্থায় এসেছে যে এই মূল্যবান গাড়ীর আসনে বসতে ও সংকোচ বোধ করে। করা স্বাভাবিক। অসিতবাবু দেখছেন উলুকে। মুখের উপর আলোটা পড়েছে। কতই বা বয়স? ষোল বা আঠারো। না আরো কম মনে হয়। চোখ দুটো বুজে আছে—টানা লম্বা রেখার মত ভ্রূদুটি—চোখের কালো পাতা—রূপকথার মেয়ে যেন! ঘুমুচ্ছে—নিঃসাড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে—যেন পরম আশ্রয় পেয়েছে। সব উদ্বেগের সমাপ্তি ঘটেছে ওর—হ্যাঁ—ঘটেছে। অসিতবাবু ওর ভার গ্রহণ করবেন। মরতে দেবেন না তিনি মেয়েটাকে। ওর ইতিহাস যাই হোক—ও নিজে খাঁটি, ওর মাও অন্তরে খাঁটি ছিল—নিরুপায় হয়েও সে তার নিষ্ঠাকে অটুট রেখে গেছে—মরেছে সুখের নীড় বাঁধবার চেষ্টা সে করে নি।

গাড়ী চলছে, উলু ঘুমুচ্ছে। অসিতবাবুর আর ঘুম এল না। সদ্য প্রাপ্ত রাজ সম্মান থেকে তাঁর অনেক বেশী পাওয়া মনে হচ্ছে এই উলুকে। উলুকে তিনি গ্রহণ করলেন মনে মনে কন্যা রূপে। হাওড়ায় এসে পৌঁছাল গাড়ী। নামালেন উলুকে।

বেআইনি ট্রেন জার্নির জন্য আগেই তিনি বলে রেখেছিলেন আসানসোলে একজন অফিসারকে। সুতরাং বেশী ঝামেলা পোহাতে হোল না। বাড়ী আনলেন উলুকে নিজের গাড়ীতে চড়িয়ে।

বিশাল তাঁর বাড়ীতে এসে উলু আত্মহারা হয়ে গেল। কিন্তু সে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। জীবনে বহু আঘাত পেয়ে মানুষ হয়েছে। তাই অল্পক্ষণেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিল সকলের কাছে। সকল বলতে দুটো চাকর একটা ঝি—বাকী সবাই তো বাইরের ঘরে থাকে। উলুর আটকালোনা কিছু। অসিতবাবু কন্যা স্নেহে তাকে রেখে দিলেন। ভাবলেন, নীলু তো এলো না—উলুকে পেয়েছেন। সে থাক, তার বিয়ে দেবেন—তার সংসার সুখের

করে দেবেন। তার ছেলেমেয়েকে দেখবেন। উলু তাঁর কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তাঁর ঘরে উলু পরম গৌরবের বস্তু হয়েছে। লোকের কাছে বলেন—উলু তাঁর শালীর মেয়ে। মা বাবা নেই—তাই তিনি ওকে এনেছেন। আর একটু বড হলে বিয়ে দেবেন। উলুই এখন তাঁর কন্যা।

উলুর জন্য টিউটার রাখলেন—গানের মাষ্টার রাখলেন—এবং আর যা যা দরকার সবই করলেন। উলু তাঁকে বাবা বলে—সেটাও মেনে নিলেন তিনি। উলু রয়েছে, বড হচ্ছে—পড়াশুনোও করছে। বছর পার হয়ে গেল। এর মধ্যে লক্ষ্মী অনেক বার এসেছে। উলুর সঙ্গে আলাপও করেছে। সেদিন হঠাৎ উলু বললো লক্ষ্মীকে—

—দাদা কতদিন গেছেন লক্ষ্মীদি?

—আঠার মাস।

—সেই মেয়েটার আর কোন খোঁজ রাখেন না? সেই নীরা না কি নাম।

—না—তার খোঁজে আমাদের কি দরকার?

—না—দরকার নেই। তবে সেদিন কাদের একটি মেয়ে—এসে বাইরের ঘরে খোঁজ করছিলেন—নীলুদা ফিরেছে কিনা। বাবা ছিলেন না—আমাদের সরকার বললেন যে ফেরেন নি। পরে আমি সরকার মশাইকে শুধোলাম তিনি কে। তাতে সরকারমশাই বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন,

—ও একটা হারামজাদী—কোন লজ্জায় যে আসে এখানে আবার! বলেই চলে গেলেন তিনি। আমার মনে হোলো উনিই নীরা।

—তা হবে। ওর সঙ্গে কথা বলো না।

—না দিদি—আমার কি দরকার।

অনেক রাত্রে সেদিন শূয়োর নিযে ফিরলো ইউনিট সাহেব। আনন্দেই ফিবছে, কারণ দেহাতে শূয়োব দুটো যথেষ্ট সস্তায় পাওয়া গেছে। তাছাড়া আরো আনন্দের কারণ—এব সব মূল্যটাই দিয়েছে দেবকী দোসাদ! আধমরা করে বেঁধে আনতে হয়েছে শূয়োরদুটোকে। পাঁচজন লোক সঙ্গে—তারাই এনেছে বয়ে। ইউনিট ঘরের দরজায় পৌঁছাল।

ভেজানো দরজা—ঠেলতেই খুলে গেল। ব্যাপার কি? আলো জ্বলছে অথচ ঘবে লোক নেই। উলুপী কোথায়। গেছে হয়তো কোথাও—কিম্বা বাথরুমে। অতএব সর্ব্বাগ্রে ইউনিট সাহেব শূয়োর দুটোকে একটা ছোট ঘরে বন্দী করে রাখলো, তারপর ডাক দিল—

—উলুপী—উলু?

কোথায় কে? কেউ নেই। কোন সাড়া নেই কোন দিকে। গেল কোথায় মেয়েটা? সঙ্গের লোক পাঁচজন বললো,

—একা ঘরে থাকতে হয়তো ভয় পেয়েছে তাই পাশের বাড়ীতে আছে।

—না—ভয়তো সে পায় না—ইউনিট বললো এবং পাশের বাড়ীতে খোঁজও করলো। না—নাই উলুপী—কোথাও নাই।

বৃষ্টি থেমেছে—জ্যোৎস্না উঠেছে—ইউনিট অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ভাবছে গেল কোথায় উলু! সে যে দেবকীকে বিয়ে করতে চায় না—এতো জানা কথা। তার মা-ই তো দিতে চায় নি—নইলে এতদিন কাজটা হয়ে যেতো। উলু পালালো নাকি?

সঙ্গের লোকরা শূয়োর দুটো বান্দী করে চলে গেছে। তারা

অন্য কোয়ার্টারের লোক—একটু তফাতে কোয়ার্টার তাদের, সেখানে দেবকী দোসাদ থাকে। তারা আপন আপন ঘরে গেল এবং ঘুমুলো। উলু নিশ্চয় অন্য কোন বাড়ীতে আছে, ঘুমিয়ে গেছে—এর বেশী কেউ আর ভাবলো না।

ভাবছে ইউনিট—তার ভাবনা অগাধ। কারণ সে বুঝেছে উলু পালিয়েছে। হয়তো কোনো পুরোনো খাদে ঝাঁপ দেবে—নাহয় রেলে মাথা দেবে—না হয় কোন দূর বিদেশে পালাবে। কোথায় যেতে পারে উলু? কেউ তো তার নেই কোথাও। টাকা পয়সা কিছু নিয়েছে কিনা দেখা যাক।

না—টাকা পয়সা দূরে থাক—সাড়ী ব্লাউজটাও সে নিয়ে যায় নি। যা ছিল সবই ঠিক আছে—খাবারগুলো পর্যন্ত। রাঁধা ভাত এবং আলুর তরকারী ঢাকা রাখা আছে উলু আর ইউনিটের জন্য। খায় নি উলু—নেয় নি কিছুই তাহালে সে করলো কি? আত্মহত্যা? হ্যাঁ—তাই সম্ভব।

ইউনিট সারারাত ভাবলো।

সকালেই এলো দেবকী দোসাদ। খবরটা সে পেয়েছে। এসে দাঁড়াল। ইউনিট তখন একটা নীম ডাল ভেঙে দাঁতন করছে। দেবকী এসে বললো,

—ব্যাপারটা কি, খুলে বলো দেখি।

—ব্যাপার কি—কি করে জানবো! পুলিশে খবর দিতে হবে—আর কি করা যায়?

—পুলিশ-ফুলিশ মানি না আমি—আমার বিশ্বাস তুমিই তাকে সরিয়েছ। ভাল চাও তো বের কর—নইলে দেবকী দোসাদ রক্ষে রাখবে না, বলে দিচ্ছি।

—আমি সরিয়েছি? তার মানে?

—মানে তুমি সরিয়েছ। ঐ সুন্দরী মেয়েটিকে তুমি অন্য

কোথাও বিক্রী করবে। আমার কাছে দুটি হাজার নিয়েছ—আরো নিশ্চয় কারো কাছে হাজার পাঁচ টাকা আদায় করেছ ওর সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে। তুমি যে একটি হারমজাদা—তা আমি ভাল জানি। এখন বের কর তাকে।

—কি সব বলছিস দেবকী।

—যা বলছি ঠিক বলছি। বের কর তাকে—নইলে তোমার বাবাও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমার বিশ্বাস তোমার মনিব সেই বোস সাহেব—যিনি তোমার চা বাগানের এঞ্জিনীয়ার ছিলেন, সেই বোস সাহেবকেই তুমি দিয়েছ। তিনি এখন হিংপুরে রয়েছেন। শোন ইউনিট—যদি তুমি আজ সন্ধ্যার মধ্যে উলুকে না ফিরিয়ে আন তো রাত্রি পার হবে না—তোমাকে যমালয়ে যেতে হবে।

দেবকী গর্জন করতে লাগলো। দাঁতন কাঠিটা সরিয়ে ইউনিট তাকালো দেবকীর পানে। ক্রোধে দেবকীর মুখ কালো হয়ে গেছে। ইউনিট বললো,

—শোন দেবকী—বোস সাহেব আমার কেউ নয়—অবশ্য নজর তার ছিল উলুর দিকে—কিন্তু উলুকে আমি মানুষ করেছি মেয়ের মত—তাকে কোনো সাহেবের রক্ষিতা আমি কখনো করবো না। বিশ্বাস কর—তাকে আমি তোর বউ করতে চেয়েছি—আর তাই করবো।

—কখন করবে? কি করে করবে? কোথায় সরালে তাকে?

—সরাইনি, সে চলে গেছে। যদি বেঁচে থাকে তো আমি তাকে খুঁজে বের করবো। দরকার হয়—পুলিশি কুকুর নিয়ে আসবো—তুই ভাবিসনে দেবকী। মাইরি বলছি, তোকে ফাঁকি দেবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। তবে আজ আমি এখনি কি করতে পারি। সে টাকাপয়সা বা কাপড় জামা কিছুই নিয়ে যায় নি। তাই ভাবছি, আত্মহত্যাই করলো নাকি।

—না—তাহালে সে ঐ হিংপুরে বোস সাহেবের কাছে চলে গেছে। চল, খোঁজ করা যাক—

—হ্যাঁ—তা যেতে হবে বৈকী। চল—নটার ট্রেনেই যাই দুজনে।

—না, ট্রেনে যাওয়া হবে না। বাসে যাব—বেলা দেড়টার বাস-এ যাব—চারটায় পৌঁছাব। কারণ বোস-সাহেব কাঁচা ছেলে নয়—দিনে সে উলুকে নিশ্চয় বের করবে না।

—ঠিক কথা, তাই চল।

অতঃপর খাওয়া সেরে শূয়োর দুটোকে পাশের বাড়ীর লোকের জিম্মায় রেখে ইউনিট আর দোসাদ বেরুলো বেলা দেড়টার সময়। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের বাস ধরে দুজনে চলে এল—নামলো এসে হিংপুরের এলুমিনিয়ম ফ্যাক্টরীর কাছাকাছি। কয়েকটা ধান-ক্ষেত আর একটা ছোট নদী, তার ওপারে কারখানার কোয়ার্টার-গুলো ঐ নদীর কিনারেই—নদীটা শুকনো তবে গর্ত খুব।

বোস সাহেব পূর্ব্বে চা বাগানে ছিলেন, চীনের আক্রমণের পর তিনি ওখানকার চাকরী ছেড়ে চলে আসেন এই কারখানায়। এই চাকরী কয়েক বছর করছেন তিনি। লোকটা একটু সৌখিন প্রকৃতির—বিজলী এঞ্জিনীয়ার। ইউনিট সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল আসামেই—এ দেশে এসে হঠাৎ একদিন ইউনিটের দেখা পান তিনি ধানবাদ বাজারে। ইউনিট তাঁকে তার কোয়ার্টারে আনে। উলুকে ছোটতেই দেখেছিলেন তিনি আসামে। এখন দেখলেন ষোড়শী উলুকে। বোসসাহেব জানেন উলুর মার ইতিহাস—সুতরাং তাঁর বুঝতে কিছুই বাকী থাকলো না। ইউনিটের কাছে তিনি প্রস্তাব করলেন উলুকে দেওয়া হোক। তিনি রাখবেন। ইউনিট রাজি হয় নি—কারণ দেবকীর কাছে সে অনেক টাকা খেয়েছে। তাছাড়া বোস সাহেব উলুকে রক্ষিতা

করবেন, দেবকী করবে বৌ। দুটো সম্পর্কে বিস্তর তফাৎ। ইউনিট উলুর মাকে নিয়ে যাই করুক—উলুর উপর তার কন্যাস্নেহ বর্ত্তমান। উলুকে সে তার মেয়ের মতই ভালবাসে। তাকে একেবারে কারো রক্ষিতা করে দিতে মন চাইল না ইউনিটের। তাই বলেছিল,

—না স্যার—ওর আমি বিয়ে দেব—ভাল ছেলে খুঁজছি।

—বিয়ে! ওকে কে বিয়ে করবে? ওর মার ইতিহাস তো জানা সকলের!

—ওর মা খারাপ ছিল না—ভালই মেয়ে ছিল সে। খারাপ তাকে আমি করেছিলাম—কিন্তু উলু সতী মার সন্তান। তাকে আমি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেব না।

—শোন ইউনিট, বোস সাহেব বলেছিলেন—বাড়াবাড়ি করো না। আমার কাছে ও খুব ভাল থাকবে। তোমাকে আমি হাজার অনেক টাকা দেব।

—না—ইউনিট সাহেব জবাব দিয়েছিল।

এখন সেই বোস সাহেবই হয়তো কোনরকমে উলুকে বের করে নিয়ে গেছে। এ ছাড়া আর কি হতে পারে? সুতরাং সেখানেই খোঁজ করা দরকার। দিনের আলোয় খোঁজ করা ঠিক হবে না। ওরা রাত্রির জন্য অপেক্ষা করলো—এবং সন্ধ্যার পর গেল বোস সাহেবের বাংলোয়। বোস সাহেব নেই। তিনি গতরাত্রে কলকাতা গেছেন কোম্পানীর কাজে। অর্থাৎ উলুকে নিয়ে পালিয়েছেন—ইউনিট বললো কথাটা দোসাদকে।

—হুঁ—

দোসাদ আর কিছু বললো না। ছোট কল্কেটা বের করে গাঁজা তৈরী করতে লাগলো ওখানেই একটা গাছতলায় বসে। তৈরী হলে টান দিল কয়েকটা—ধোঁয়াটা গিলে প্রায়-নিঃশেষ কল্কেটা

দিল ইউনিটকে। ইউনিট গাঁজা খায় না। মদই তার প্রিয়—তাই নিল না—ফিরিয়ে দিল। বাকী যা ছিল কল্কেতে শেষ করে দোসাদ বললো,

—চল—ফেরা যাক—

—হ্যাঁ—চল।

দুজনে ফিরছে আকাশে মেঘ, বৃষ্টি হবে বোধ হয়। নদীর ওপারে যেতে হবে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে বাস ধরতে হবে গিয়ে। ইউনিট তাড়াতাড়ি হাঁটছে—পিছনে দোসাদ। দোসাদ ভাবছে হাজার খানেক টাকা নিয়ে এই হারামজাদা ইউনিট বিক্রী করেছে উলুকে। কিনেছে ঐ বোস—। নিশ্চয় তাই!

—শালা—কাহাকা!

দোসাদের ছোট লাঠিখানা সজোরে পড়লো ইউনিটের মাথায়। ব্যস—একটি ঘায়েই পড়ে গেল ইউনিট সেই নদীর কিনারে বালির বিছানায়। অজ্ঞান? নাকি মরেই গেল লোকটা? দোসাদ দেখলো। গাঁজার নেশা থাকলেও তার ভুল হয় না কিছু। বেশ টনটনে জ্ঞান আছে। 'মরে গেছে শালা ইউনিট—মরেছে—মরুক—!!'

দোসাদ সটান গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর এসে বাস ধরে ফিরলো আপন কোয়াটারে। এসে শুলো। যেন কোথাও কিছু ঘটে নি। এরপর আর কিছু করবার নেই।

ইউনিট মরেনি, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি হোল খানিক—ইউনিটের কপাল ভাল, ভগবান তার গায়ে মাথায় জল দিলেন। জ্ঞান ফিরে পেল ইউনিট। মনে পড়লো সব তার। উঠে দাঁড়ালো দেখতে পেল—এখনো বাস চলছে। রাত বেশী হয়নি—মাথার কাটা জায়গাটায় জল দিয়ে ধুয়ে রুমাল বেঁধে ইউনিট চলে এল—বাস ধরে ফিরলো কোয়াটারে। কিন্তু সে বুঝলো এখানে থাকলে

দেবকী দোসাদ তাকে বাঁচতে দেবে না। দেকীর নিশ্চিত ধারণা—উলুকে ইউনিটই বিক্রী করে দিয়েছে বোসসাহেবের কাছে। অতএব ইউনিটকে এখান থেকে সরতে হবে। কোম্পানীর কাছে কিছু পাওনা আছে তেমনি ধারও কিছু আছে কোম্পারীর লেবার অফিসে। আর দোসাদ তো মোটা টাকাই পাবে ইউনিটের কাছে। ঘুরে গড়ে সমান। সুতরাং ঘরে পোঁছে ইউনিট দেখলো—উলুর কয়েকটা শাড়ী ব্লাউজ আর তার হাফপ্যাণ্ট সার্ট ছাড়া নেবার কিছু নেই। থালা বাটি গেলাস সবই এলুমিনিয়ম আর কাচের। টাকা পয়সা আর কাজের সার্টিফিকেট ক'খান এবং অতিসামান্য জামা কাপড়—টাকা যা ছিল সবই নিয়ে ইউনিট বেরুবে—মনে পড়লো, আর একটা জিনিস তার আছে—একটা পিস্তল। বহুদিন আগে চাবাগানের এক সাহেবের ঐ সম্পত্তিটি ইউনিট পেয়েছিল। অতি গোপনে তাকে সে এই দীর্ঘকাল রেখে এসেছে। নিল সেটি বের করে।

ইউনিট সটান এলো ধানবাদ ষ্টেশনে। ভোরের কোলফিল্ড এক্সপ্রেস ছাড়ছে। টিকিট কিনে বসে পড়লো ইউনিট একটা বেঞ্চে।

কলকাতা যাবে সে—উলুর খোঁজ করবে। তারও ধারণা বোসই উলুকে নিয়ে পালিয়েছে।

ওর বন্ধুরা জানে—ও হিৎপুর গেছে দোগাদের সঙ্গে, তাই কেউ এলো না আজ আর খোঁজে।

পড়াশুনো ভালই করছে উলুপী। পড়াবার জন্য ভাল মাষ্টার রেখে দিয়েছেন অসিতবাবু—উলুকে তিনি যথেষ্ট যত্নে তৈরী করবেন—করছেনও তাই, কিন্তু উলু খুব ছোটতে তাঁর কাছে আসেনি—তার বয়স হোল, বিয়ে দিতে হবে।

অসিতবাবু উলুকে দেখেন আর ভাবেন—তাঁর অন্ধকার ঘর আলো করে আছে উলু—বিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় করতে হবে না—এ চিন্তাও তিনি করতে পারেন না। ভাবেন—তাঁর তো অঢেল সম্পদ রয়েছে। নিজের ছেলের কোন খোঁজ নেই। উলুকেই তিনি দেবেন তাঁর সম্পদ—এবং বিয়ে দিয়ে উলুকে বাড়ীতেই রাখবেন—মেয়ে জামাই থাকবে এখানেই। অর্থাৎ ঘরজামাই খুঁজছেন তিনি মনে মনে। কোন ভাল ছেলে যার কেউ কোথাও নেই এমন একটি সুশ্রী লেখাপড়াজানা ছেলে পেলে তিনি উলুর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে উলুকে বাড়ীতেই রাখতে চান।

নীলুর আশা আর করেন না তিনি। নীলু গেছে, চির দিনের জন্যই তাঁকে ত্যাগ করে গেছে। উলুই এখন তাঁর কন্যা এবং পুত্রও। কোথাকার কে উলু অসিতবাবুর অন্তরে এতখানা যায়গা জুড়ে বসেছে কি করে, কে জানে। অসিতবাবুর স্নেহক্ষুধিত প্রাণ তৃপ্ত হয়েছে। তাঁর বঞ্চিত বুকের ব্যথাবেদনা সবই যেন প্রশমিত হয়ে গেছে উলুকে পেয়ে। উলুকে তিনি দূরে সরাতে পারবেন না—পাত্র খুঁজতে লাগলেন।

হঠাৎ সেদিন এল একখানা নিমন্ত্রণ পত্র—অমরবাবুর মেয়ে অঞ্জনার বিয়ের নিমন্ত্রণ। বিয়ে হচ্ছে অধ্যাপক শিবনাথবাবুর ছেলের সঙ্গে। অনেকদিন অমরবাবুর ওদিকে যাননি অসিতবাবু। খেয়ালেই ছিলনা তাঁর কথা। অমরবাবু বহুদিনের বন্ধু তাঁর। অঞ্জনাও স্নেহ-পাত্রী। অসিতবাবু খবরটা নেবার জন্য গেলেন অমরবাবুর বাড়ী। বিয়ের এখনো দেরী আছে দিন সাত—তবে আয়োজন চলছে সেখানে। অমরবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করলেন বন্ধুকে। বললেন, —ছেলের কোন খবর তো পাও নি?

—না ভাই, তার আশা আর করিনে। যদি বেঁচে থাকে তো থাক যেখানে হোক।

—বেঁচে নিশ্চয় আছে। ফিরেও আসবে। যাক—অন্য কি খবর?

—খবর আর কি! ঈশ্বরের কৃপাই বলবো—আমার শালীর মেয়েটাকে এনে রেখেছি বাড়ীতে।

—বাড়ী ছিল কোথায়?

—বাড়ী বা মা—বাবা কেউ নেই। বর্ত্তমানে আমিই হয়েছি তার মা বাপ।

—কত বড় মেয়ে?

—তা হোল বছর আঠারোর—তারও বিয়ে দিতে হবে। ভাবছি।

—আঠারো হোল! বেশ—অঞ্জনারও তাই বয়স। মেয়েদের বিয়ে আমি ঐ বয়সেই দেবার পক্ষপাতী—অমরবাবু বলে চললেন, —শিবনাথবাবুর মেয়ে লক্ষ্মীকে পত্রবধূ করতে চেয়েছিলাম, তার মেয়ে লক্ষ্মী রাজি হোলনা। সে নাকি পড়বে। শিবনাথ বাবু কলেজের বন্ধু। বললাম, তোমার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধটা তাহলে হবে না?—'কি করে আর হয়'—বলে তিনি কাটিয়ে দিতে চাইলেন; আমি ধরে বসলাম অঞ্জনার জন্যে তাঁর ছেলেকে। বললেন, —খুব ভাল প্রস্তাব। তারপর ঠিক হোল। এখন আয়োজন চলছে।

—খুব ভাল—খুব ভাল। ছেলেও খুব ভাল। আমি জানি তাকে। নীলুরই বন্ধু—সহপাঠি। তোমার ছেলে ওদের থেকে ছোট।

—হ্যাঁ কিছু ছোট। তবে আমার ইচ্ছে ছিল তার বিয়ে দিই। কারণ মার শরীর আর খুব ভাল যাচ্ছে না ভাই। আমিও ওদের ব্যবস্থা করে ছুটি নিতে চাই এবার। বৃদ্ধা মা কান্নাকাটি করছেন। বলেন 'নাতবৌ দেখা আমার কপালে নেই।' তাই চেয়েছিলাম ছেলের বিয়ে দিতে—হোলনা।

ঐ—আমিও মেয়েটাকে নিয়ে জড়িয়ে পড়েছি।—অসিতবাবু বললেন।

—জড়াবার কি আছে? ভাল মেয়ে—দাও না, আমিই পুত্রবধূ করে আনি।

প্রস্তাবটা অতর্কিত কিন্তু খুবই ভাল প্রস্তাব। অগ্রাহ্য করা উচিৎ তো নয়ই করা চলেও না। অসিতবাবু একটু ভেবে বললেন,—মেয়ে খুবই ভাল, আর সে এখন আমারই মেয়ে। দেখ যদি পছন্দ হয় তো হোক বিয়ে। তোমার ছেলের মতামত তো জানা দরকার?

—না—আমাদের পাড়ায়, অন্ততঃ আমার বাড়ীতে ওসব নেই। অমিয়র ঠাকুমার আর অঞ্জনার পছন্দ হোলেই হবে।

—বেশ—কালই দেখানো হোক—অসিতবাবু সম্মতি দিলেন। কারণ অমিয়কে তিনি চেনেন, খুবই ভাল ছেলে। যেমন তার রূপ তেমনি গুণ—'স্মার্ট' 'সোবার' ইত্যাদি ভাল ভাল ইংরাজী কথাগুলো মনে আসছিল। কিন্তু বাংলাটাই বললেন,

—অমিয় চরিত্রবান ছেলে, তার হাতে মেয়ে দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

—খুব ভাল কথা ভাই, কালই তাহলে মেয়ে দেখা হোক—পছন্দ হলে পাকা দেখা হবে। আর পছন্দ না হবার কি আছে? তুমি যখন বলছো ভাল তখন নিশ্চয় ভাল।

—তবু তোমরা দেখে নাও। রূপগুন-স্বভাব ইত্যাদিতে সে এবাড়ীর অযোগ্যা হবে না।

—তাহলেই হোল।

এর পর অঞ্জনাকে ডেকে তাকেও মেয়ে দেখতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে অসিতবাবু বাড়ী ফিরলেন। উলুকে দেখতে আসছে; আনন্দের কথা, বাড়ীতে অন্য কোন মেয়ে নেই। একজন অন্ততঃ থাকা দরকার। অসিতবাবু লক্ষ্মীকে ফোন করে বললেন,

—কাল শনিবার মা—উলুকে দেখতে আসবে। তুই যদি আসিস।

—আমি নিশ্চয় যাব জেঠামশাই। এ খুব ভাল হবে, ভাল বর। খুব ভাল হচ্ছে—আমি যাব—বেলা দু'-তিনটের মধ্যে পৌছাব; আপনি কিছু ভাববেন না। যা-কিছু করবার আমি করবো গিয়ে।

লক্ষ্মী সম্মতি দিল এবং পরদিন যথাসময়ে এসে পৌছাল। উলু এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল তার নিজের ঘরে—ভাবছিল কোথাকার মেয়ে সে কোথায় এসে পড়েছে। জীবনের ইতিহাসটা আগাগোড়া আওড়াচ্ছিল উলুপী। ছিল সে চাবাগানের নগণ্য এক কেরাণীর কন্যা—বাবার মৃত্যুর পর ইউনিট সাহেবের সহযোগিতায় অথবা শঠতায় তার প্রতারিতা মা দেহরক্ষা করলো। স্বজনহীন উলুকে প্রায় বিক্রীই করতে চেয়েছিল ইউনিট সাহেব। সেই দুর্যোগ রাত্রে উলু বেরিয়ে পড়েছিল আত্মহত্যার জন্য—ঈশ্বরের অনুগ্রহ, উলু এমন একজনের পদপ্রান্তে এসে পৌছাল যাঁর অপার স্নেহ-সদিচ্ছা উলুকে রাজকুমারী করে তুলেছে। নিজেকে কিন্তু ভোলেনি উলু। সে জানে—তার জীবনের উপর কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মার কথা মনে হয়। উলু কাঁদে, ভাবে তার জননী যদি কোন অপ্রত্যক্ষলোকে থাকে তো দেখবে মেয়ে তার আজ রাজকন্যা—অবিলম্বে রাজবধূ হবে।

—উলু—লক্ষ্মী এসে ডাক দিল।

—এসো দিদি —উলু সাদর আহ্বান জানালো—বললো, তুমি যাকে নিলে না, তারই সঙ্গে নাকি আমার বিয়ের ঠিক হচ্ছে।

—আমি নিলাম না বলে সে খারাপ কিছু নয়। খুব ভাল ছেলে। খুবই ভাল বর হবে তোর। আমি নিলাম না, তার কারণ,

...কথাটা চেপে গেল লক্ষ্মী।

—জানি—উলু করুণ হাসল—কতদিন তুমি থাকবে দিদি এভাবে ?

—জানিনা—আয়, তোকে সাজিয়ে দিই।

উলুর চুলের বেণীটা খুলতে বসে গেল লক্ষ্মী। উলু বললো, —বিয়ে যে কার সঙ্গে কার হবে কেউ জানেনা দিদি—শুনেছি দাদার জন্য নাকি সেই নীরাকে ঠিক করা হয়েছিল, তারপর তোমার সঙ্গে—

—থাক ওসব কথা। তোর ভাল বর হবে। আনন্দ কর। ওর বোন অঞ্জনা আমার বৌদি হবে—আমরা তিনটে পরিবার একত্র হলাম।

—তোমার বিয়েটা দাদার সঙ্গে হলেই তবে সব ঠিক হোত।

—চুপ্ করল উলু—যে যেমন ভাগ্য করে সে তেমন ফল পায়।

উলু আর কিছু বললো না। লক্ষ্মীর করুণ মুখের দিকে চেয়ে দেখলো। লক্ষ্মী তাকে সাজালো—নিজে দেখলো এবং আয়নার সামনে এনে উলুকেও দেখতে বললো। উলু বললো—আমাকে আমি কোনদিন দেখিনে দিদি—ও থাক। যদি ওঁদের পছন্দ হয় তো ভালই, নাহয় তো নাহবে।

—তোকে পছন্দ হবে না? কুমার কার্তিকেরও তোকে পছন্দ হবে—বুঝলি ?

যথাকালে এলো অঞ্জনা সঙ্গে বৃদ্ধা ঠাকুমা তার। অমরবাবু আসেননি। কারণ তাঁর পছন্দ-অপছন্দের কোন মূল্য নেই। বৃদ্ধা মার পছন্দই চলবে এবং পুত্র অমিয়ও তার ঠাকুমার পছন্দের উপর নির্ভর করে। অমরবাবু একেবারে পাকা দেখা দেখতে আসবেন ঠিক করেছেন।

পছন্দ হোতে কিছুমাত্র বিলম্ব হোল না। বৃদ্ধা ঠাকুমা শুধু দেখলেন উলুর প্রণাম করার ভঙ্গী—তার অনবদ্য দেহসৌষ্ঠব—

সুন্দর নমনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর চোখের উজ্জ্বল কালো তারাদুটি—ব্যাস। বললেন,

—তোকে আমি নিলাম— চল আমার শূন্য ঘরে,—যে-ঘর ফেলে আমার রাজরাণী বৌমা অকালে পালিয়ে গেছে। তুই তার ঠাই নে দিখিনি।

জলযোগ আপ্যায়ণ ইত্যাদি সেরে অঞ্জনা যাবার সময় বলল,—দাদার জন্য আমার পছন্দ করা মেয়েকে তো পেলাম না। ঠাকুমার পছন্দ করাই আসুন।

কথাটা লক্ষ্মীর প্রতি বলা হোল। বুঝলো লক্ষ্মী। বললো—তোর থেকে ঠাকুমার অভিজ্ঞতা বেশী। তাঁর পছন্দের মূল্যও বেশী, বুঝলি?

—বেশ তাই হোক।—আজকার মত 'তুমি' বলে নাও। দিন সাত পরেই তোমার গুরুজন হয়ে বসবো গিয়ে—বুঝলে লক্ষ্মীরাণী?

—হ্যাঁ—সেদিন তোর পায়ে হাত দিয়ে নাহয় প্রণামটা করা যাবে।

—না না না—ওকাজ করতে হবে না—নীলুদা ফিরলে তুমি আবার আমার····

—চুপ—লক্ষ্মী ঠোঁটদুটো চেপে ধরলো অঞ্জনার। বললো,

—ওই কথা শুনলে উলু কাঁদে, বুঝলি অঞ্জনা? নিজের দুঃখ চেপে আছি। অপরকে দুঃখ দিতে চাইনে।

উলুকে পছন্দ করে চলে গেল ওরা। লক্ষ্মী তখনো [illegible] অসিতবাবু বললেন তাকে,

—তাহলে কথা পাকা করব মা?

—হ্যাঁ—জেঠামশাই—ঘর বর সবই ভাল। ওরা বনেদী পরিবার বংশতো দেখতে হবেনা—আর ছেলেও খুব সুন্দর····

—তুই তাহলে পড়াশুনো নিয়েই থাকবি?

—হ্যাঁ—আমি এখন কিছুদিন বিয়ে করবো না।

—থাক—নীলু যদি ফেরে তো তোকে আনবো মা আমি—

লক্ষ্মী আর কথা বললো না, চোখের জলটা লুকিয়ে সরে গেল।

অসিতবাবু সবই শুনেছেন এবং বুঝেছেন লক্ষ্মী কেন অমিয়কে বা অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায় না। নীলুকে সে ভালবাসে। এমন একটি অপরূপ মেয়েকে ছেড়ে নিলু যে কেন ঐ নীরাকে চেয়েছিল—ভগবান জানেন। অসিতবাবুও তো চেয়েছিলেন। এই প্রচণ্ড ভুল পিতাপুত্র দুজনেরই হয়েছিল—

লক্ষ্মী প্রণাম করে চলে যাচ্ছে বাড়ী। অসিতবাবু দেখলেন। কিছু তিনি আর বলতে পারলেন না।

বিয়ে হয়ে গেল উলুর। বসলো সে এসে অমরবাবুর প্রাসাদে রাজরানী হয়ে। উলুর মাঝে মাঝে মনে হয় সে খুব লম্বা টানা একটা স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু স্বামী অমিয়র অগাধ ভালবাসা পেয়ে ভাবে—স্বপ্নটা সত্যি, নইলে এ কি করে হয়!

এ-জীবন কোনদিন আশা করে নি উলু। বিশাল এই বাড়ীর অধিশ্বরী সে। বাড়ী-বাগান-ঠাকুরঘর এবং গ্যারেজ ঘোড়াশালা চাকরদের থাকবার যায়গা সব মিলিয়ে বিঘে দশ জমির ওপর এই প্রাসাদ। ওদিকে নাকি কাছারী বাড়ী আছে, জমিদারী যখন ছিল তখন ওখানে নায়েব গোমস্তা কাছারী করতেন। এখন আছেন ম্যানেজার তহশীলদার বাজার সরকার টাইপিষ্ট এবং খাজাঞ্চীগণ। অমরবাবুর এষ্টেট যথেষ্ট বড়—আয়ও ভাল। বাড়ীই আছে তাঁর বেশ কয়েকখানা যা ভাড়ায় খাটে। তাছাড়া

কোম্পানীর শেয়ার এবং নিজস্ব কারবারও আছে তাঁর। অমরবাবু বেশ ধনী ব্যক্তি—পুরুষানুক্রমে ধনী তাঁরা। বাড়ীতে এখনো দোল-দূর্গোৎসব হয়, গৃহদেবতার মন্দিরে নিত্য পূজা আছে। সেখানে আছেন অমরবাবুর বৃদ্ধা মা ইন্দ্রানী দেবী। অতিশয় বুদ্ধিমতী বয়স্কা মহিলা—উলু এসে তাঁর হাতেই পড়লো।

উলুর প্রথম জীবন তার মার হাতে গড়া। সুতরাং দেশীয় ভাব তার মজ্জাগত। পূজাপার্বন বা মাঙ্গলিক কাজ সে ভালই শিখেছিল ছোটবেলায়। যদিও ইউনিটের সাহায্যে ওদের সংসার খানিকটা ইউরোপীয় ঢংএ চলতো তবু উলুর মা তার সেই কোয়াটারেও সন্ধ্যাদীপ জ্বালতো শাঁখ বাজাতো। ইউনিট এ নিয়ে কোনদিন কিছু বলেনি তাকে। উলু সেই মার মেয়ে তাই বৃদ্ধা ইন্দ্রানী দেবীর মন পেতে তার দেরী হোল না। শীগ্রি সে বশ করে ফেললো বৃদ্ধাকে। তিনি বললেন, শোন অমর—বৌ যা হয়েছে লাখে একটা মেলে—বৌমা যদি আজ থাকতো তো···· বৃদ্ধা আর বলেন না, কেঁদে ফেলেন। অঞ্জনাও খুব সুখ্যাতি করে উলুর। বলে—বৌদি খুব গুণের মেয়ে। গরব অহঙ্কার কিছু নেই, যেন মাটির মেয়ে—এমন বৌদি পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা। খুব ভাল বৌদি হয়েছে বাবা।

অমিয় যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে। লক্ষীকে বিয়ে তার করবার সত্যি ইচ্ছে ছিল না। কারণ লক্ষ্মী অসাধারণ রকমের বিদূষী আর শালীনতা সম্পন্না মেয়ে। অমিয় চেয়েছিল,—খুব সুন্দরী না হলেও হবে—গঠনটা ভাল আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন নমনীয় হয়, তা সে পেয়েছে। সে চেয়েছিল—খুব বেশী বিদূষী বৌ যেন না হয়, মাঝামাঝি লেখাপড়া হলেই হবে। তাও সে পেয়েছে। অমিয় চেয়েছিল—অত্যন্ত আধুনিক মেয়ে যেন না হয়—একটু পুরোনো—একটু নতুনের ছোঁয়াচ লাগা চাই—তাও

সে পেয়েছে। শুধু একটা গুণ উলুর মধ্যে পায়নি অমিয়—উলুর ব্যক্তিত্ব! না, ব্যক্তিত্ব কিছু নেই উলুর। সে এমনভাবে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে যেন তার কোন ব্যক্তিস্বত্ত্বাই নেই। এই গুণটা দোষ হয়ে মাঝে মাঝে পীড়া দেয় অমিয়কে।

সেদিন অমিয় তাই বললো উলুকে,

—আমাকে এমন ভাবে সমর্থন কেন কর উলু? তোমার ব্যক্তি-স্বত্ত্বাও তো কিছু থাকা দরকার—তোমার পৃথক স্বত্ত্বাও থাকবে তো?

—না নেই, থাকবে না—উলু উত্তরে বললো—তোমার স্বত্ত্বাতেই আমি স্বত্ত্ববতী। তোমার অস্তিত্বতেই আমার স্থিতি আমার পরিণতি। তোমাকে ছেড়ে আমার কিছু নেই, কিছু থাকবেনা।—উলু হাসে।

—অর্থাৎ তুমি একটা আয়না। আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখি।

—হ্যাঁ তাই; তোমার আলো নিয়েই আমার আলো, তোমার জ্যোতিতেই আমি উজ্জ্বল।

—কথাটা ভাল নয় উলু—বর্তমান এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের যুগে যখন মেয়েরা সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে পুরুষের সঙ্গে, ডানা মেলে মহাকাশ জয় করে তারা যখন সম্মান অর্জন করছে, পর্বত জয় করে পার্বতীকে হারিয়ে দিচ্ছে তুমি সেই যুগে জন্মে এমন স্বামীপরায়ণা হবে, এটা ঠিক হচ্ছে না। এটা ব্যতিক্রম।

—তুমি কি চাইছ? কি আমাকে হতে বল?

—তোমার তুমিকে জাগাও—তোমার মধ্যে যে আত্মা আছে তাকে বের করে আন। মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে তর্ক কর, যুদ্ধ কর।

—না, আমি পারবো না। আমার সে শিক্ষা নেই। আমার নেই সেই আত্মগৌরব যাকে আমি 'অহমিকা' বলি।

—কেন নেই উলু ?

—নেই, কারণ আমি উপলব্ধি করেছি দুটি জীবন যতক্ষণ এক হয়ে মিলে না যায় ততক্ষণ অমৃত ক্ষরণ হয় না। স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি খুব বড় কথা—মহান সাহিত্যের কথা—তা দিয়ে মনের সাহিত্য কাব্য ইত্যাদি সৃষ্টি করা যায় কিন্তু জীবন সৃষ্টি করা যায় না। জীবন কাব্য হলেও ঠিক কাব্য নয়—কাব্যের রংটা বাদ দিলে যা হয়, জীবন তাই। স্বাতন্ত্রের রঙিন শাড়ী পরিয়ে তাকে সাজানো চলে কিন্তু স্বামীর কাছে সে যখন উন্মুক্ত তখন তার সত্যরূপ প্রকাশ হতে বাধ্য। স্বামী তখন বুঝবেন, সে কতখানা মেকী—কাব্য তখন কলুষ হয়ে উঠবে।

তর্ককে চিরদিন ভয় করে অমিয়, তাই উলুর সঙ্গে অর্থাৎ ঘরের বৌএর সঙ্গে তর্ক করে অভ্যাস করে নিতে চেয়েছিল। এখন বুঝলো উলুর কাছেও যুক্তিতে সে হারছে। অতএব আর কোন কথা না বলে মেনে নিল এবং বললো যে—অমিয় তার ব্যক্তিস্বাধীনতা কোথাও ক্ষুণ্ণ করবে না। এখন উলুর যেমন ইচ্ছে চলবে। উত্তরে উলু শুধু বললো যে তার ব্যক্তি-স্বাধানতা নেই। সে ওটা কোনদিন অর্জন করেনি, করবে না। কারণ তার জীবনে ওটার প্রয়োজন নেই।

প্রেম করে বিয়ে করেনি উলু বা অমিয়। প্রাচীন প্রথামত ওদের দুটি জীবন মিলিত হয়েছে এবং ওরা সানন্দে তাকে গ্রহণ করেছে। অমিয় যে উলুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র চায়—সেটা ঠিক চাওয়া নয়—বরং উলুর সেটা না থাকায় অমিয় খুসীই আছে। তবু এই ব্যতিক্রমটা তার মনে লাগে। তাই ঐসব কথা বললো সে সেদিন। উলু এড়িয়ে গেল। আমলই দিল না তার স্বাতন্ত্রের—বরং বললো যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ওবস্তুটা থাকা সে অন্তরায় বলে মনে করে। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে স্বামীকে আঘাত দেওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যে-সব মেয়ে

জন্মেছে উলু তাদের দলের নয়—সে প্রতিযোগিতা না করে প্রতিপালনের দক্ষতা অর্জন করতে চায়—চায় সে প্রতিরক্ষা করতে তার স্বামী-সংসারকে—সে চায় স্বামীর প্রিয়তমা আর সন্তানের জননী হয়ে জীবনকে ভোগ করতে নয়—জীবনকে অর্পণ করতে জীবনদেবতার পাদমূলে। তার নৈবেদ্য গৃহীত হোক। এই তার প্রার্থনা—এবং সে প্রার্থনা তার পূর্ণ হয়েছে!

অমরবাবু সম্প্রতি একটা নতুন কারবার আরম্ভ করেছেন—একটা কারখানা স্থাপন করেছেন। এর জন্য যে ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছে, সে অমরবাবুর আত্মীয়, সম্পর্কে ভাগনে। ছেলেটী বিলাত ফেরৎ এঞ্জিনিয়ার—বয়স মাত্র ত্রিশ—অমরবাবুই তাকে বিলাত পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন তার। ফিরে এসে সেই উদ্যোগ-আয়োজন করে এই কারখানাটা করালো অমরবাবুকে দিয়ে। হারাধন নাম, অমিয়র থেকে প্রায় তিন-চার বছরের বড়—অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং অতিশয় বাকপটু। জার্মানী থেকে টিনপ্লেটিং শিখে এসে এই কারখানা করেছে। অমরবাবুর সঙ্গে অর্ধেক সেয়ারে এই কারখানা। মূলধন অমরবাবুর।

হারাধন নাম অত্যন্ত পুরানো এবং অতিশয় বিশ্রী তাই হারাধন তার নাম কোন সময়ই বলে না—বলে এইচ, ঘোষাল। সইও করে, 'এইচ ঘোষাল',—তার সত্যি নাম তাই বহুলোকের অজ্ঞাত। কারখানাটা কলকাতার বাইরে, হারাধন সেখানেই থাকে, মাঝে মাঝে আসে—বৃদ্ধা ইন্দ্রানী দেবীর কাছে থায়—আবার চলে যায়। ঘরে যখন আসে ঘরেই থাকে—বাইরের ঘরে বাইরের লোকের মত নয়—বাড়ীর ছেলের মতই থাকে। সে সম্পর্কে উলুর ভাসুর। তাই

উলু তার সঙ্গে আলাপাদি বিশেষ করে নি—কিন্তু হারাধনের ইচ্ছে উলুর সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করে। তার সুযোগ খুব কম। হারাধন এখনো অবিবাহিত। সে দেশে না থাকায় তার বিয়ের চেষ্টা করেননি অমরবাবু। তাছাড়া হারাধন ঠিক অমিয়র মত নয়—সে কোর্টশিপ করে বিবাহের পক্ষপাতী—তাই অমরবাবু বিশেষ চেষ্টাও করেন না।

উলু এমন ভাবে অমরবাবুর সংসারে জড়িয়ে পড়লো যে পালক অসিতবাবুর কাছে সে কদাচিত আসতে পায়। বৃদ্ধা ঠাকুমা তাকে ঘিরেই রেখেছেন। অসিত বাবুই খবর নেন। আসেন প্রায়ই, শুনেন উলু সুখে আছে। আনন্দে বাড়ী ফিরে যান। উলু চলে আসায় তাঁর সংসারের সকল আনন্দই চলে গেছে। লক্ষ্মী মাঝে মাঝে আসে কিন্তু লক্ষ্মী তো বিষাদ-প্রতিমা। অসিতবাবু তাকে দেখে কেঁদে ফেলেন। লক্ষ্মী বলে,

—আমি বেদান্তের মায়াবাদ নিয়ে আছি জেঠামশাই—আমার জন্য ভাববেন না। ওটা এমন একটা বস্তু যা নিয়ে অনেকদিন কাটান যায়—

—তাই কর মা—কি আর বলবো!

—শুনলাম—উলুর বর বিলাত যাবে?

—হ্যাঁ—ও ডাক্তারী পড়বে। দরকার ছিলনা তবু যাবে।

—যাক-না—ভাল করে কিছু শিখে আসুক। উলু তা'হলে ওখানেই থাকবে?

—হ্যাঁ—তার আর এবাড়ী আসার উপায় নেই। থাক—সুখে থাক। অনেক দুঃখ ও পেয়েছে জীবনে—সুখী হোক!

—হ্যাঁ—জেঠামশাই—খুব ভাল বর পেয়েছে উলু। ওর জীবন পূর্ণ হয়ে উঠলো।

—না-মা—একটা ছেলে-মেয়ে কিছু হোক।

—হবে—তাড়া কি! এই তো মাসকতক বিয়ে হোল।

—তোদের ঐ এককথা। আমরা চাই বিয়ে হোক—পুত্রকন্যা আসুক—সংসার ভরে উঠুক।

লক্ষ্মী আর কিছু বললো না। অসিতবাবু জানালেন—আগামী সাতই যে অমিয় বিলাত যাবে পড়তে। বছর দুই-তিন তো লাগবার কথা—ঠিক জানিনা কতদিন লাগে।

—না-না—উনি এখানকার পাস করে যাচ্ছেন। অত বেশী দিন লাগবে কেন? মাস ছয় লাগবে শুনেছি।

—জানিনা মা—শুধোবো।

লক্ষ্মী চলে গেল তাঁকে বৈকালিক চা খাইয়ে। অসিতবাবু সন্ধ্যায় গেলেন উলুকে দেখতে। শুনলেন, আগামী সাতই অর্থাৎ আর দিন পাঁচ পরেই অমিয় যাবে বিলাত। ওখানে সে গিয়ে শিক্ষালাভ করে ভালয়-ভালয় ফিরে আসুক।

মানুষের জীবনে যা প্রয়োজন উলু তার সবই পেয়েছে। এত দুঃখের পর এতখানা সুখ সৌভাগ্য কটা মেয়েই বা পায়? প্রেমিক স্বামী অঢেল ধন সম্পদ স্নেহশীল শ্বশুর আর স্নেহময়ী ঠাকুমা—সবগুলিই তার মনের মত। অসিতবাবু এই বনেদী পরিবারে ওকে দান করেছেন যা উলু চেয়েছিল তার প্রাণ-মনে। এখন শুধু একটি মাত্র দুঃখের ছায়া তার অন্তরে—অমিয় বিলাত যাবে, ফিরতে হয়তো লাগবে বছর দুই। এই বিরহটা কি করে উলু সহ্য করবে ভেবে পাচ্ছে না।

যথাদিনে জেটপ্লেনে অমিয় যাবে, সবই ঠিক আছে। বন্ধু বান্ধব এসে সাক্ষাৎ করলো মালা দিল। সকলেই যাবে তাকে

সী-অফ্ করতে। সব শেষে অমিয় এলো উলুর ঘরে। নিঃশব্দে বসেছিল উলু। অমিয় বললো,

—অমন করে মন খারাপ করো না উলু। প্রতি মেলে আমি চিঠি দেব।

—না, মন খারাপ কেন ··

উলুর আব কথা বেরুলো না—চোখেব জলে তার গণ্ড প্লাবিত হযে গেল। অনেক কষ্টে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বাববার প্রতি মেলে পত্র দেবার প্রতিশ্রুতি দিযে অমিয় গেল প্লেনে চড়তে। উলু নিঃশব্দে শুয়ে রইল বিছানায়। তার বিচিত্র জীবনের কথাই ভাবছে সে। কোথায় ছিল, কোথায় সে আজ এসেছে। নিতান্ত সামান্য এক কেরানীর মেয়ে উলু—তার বাবা নাকি দেড়শ' টাকা মাত্র মাইনে পেতেন, মার কাছে শুনেছে উলু—আজ উলুর আয়াই ঐ বকম মাইনে পায়। উলু ভাবছিল প্লেনে চড়ে অমিয়র যাবার কথা। কত জোরে যায় ঐ প্লেন! কী সংঘাতিক শব্দ! এতক্ষণ কতো দূরে গেল? কোথায় নামবে? কখন খাবে ঘুমোবে ইত্যাদিই ভাবছিল সে—ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে গেছে। সকালে উঠে বেরুতেই ঠাকুমা বললেন,

—শোন বৌ, অমন কবে মন খারাপ করবি না। একরাত্রে তুই আধখানা হয়ে গেছিস—এরকম করলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। ধমকটা স্নেহের অভিযোগ—উলু চুপ করে রইল। ঠাকুমা বললেন—তোদের আমলে সুবিধে কত—ক'ঘণ্টাতেই তো পৌঁছে যাবে। আমাদেব আমলে জাহাজে যেতে হোত। তোর ঠাকুরদা যখন যান, সেকি ব্যাপার! শুনলাম জার্মানী নাকি মাইন পেতে একখানা জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে—কি যেন বলে 'টর্পেড' নাকি তাই দিযে আর দু'খানা ডোবালো। খবর শুনে দিন চার পাঁচ বাড়ীতে হাড়ি চড়েনি আমাদের। অমর এই সেদিন বিলাত ঘুরে এলো কত

সহজে—গেল, কাজ সারলো, ফিরলো—এখনকার যুগ তখনকার যুগ অনেক তফাৎ। কাঁদিসনে, বিকালেই খবর পেয়ে যাবি।

উলু চুপ করে রইল। কিইবা বলবার আছে! ঠাকুমা বললেন,

—শোন উলু, তোর ঠাকুরদার দেওয়া যে লাখ কয়েক টাকা আমার ছিল তা সবই আমি অমিয়কে দিলাম। ব্যাঙ্কের কাগজপত্র কি তোব কাছে সে রেখে গেছে?

—না ঠাকুমা, আমি ওসব কিছু জানিনা—

—তাহলে হয়তো কাছারীতে রেখেছে কিংবা ওর বাবার কাছে রেখেছে—শুধোবো।

উলু চুপ কবে বইল। সে জানে ঠাকুমা তাঁব সমস্ত সঞ্চিত অর্থই উলুর স্বামী অমিযকে দিলেন সে বিলাত যাবার আগে। বললেন—বযস পঁচাত্তর পাব হোল—তুই ফেরা পর্য্যন্ত কি থাকবো? নে, যা-কিছু আছে আমার তোকেই দিয়ে রাখি। বলে আবার বলেছিলেন—তোর মা যখন যায় তখন তোর বযস মাত্র বারো পাব হয। অঞ্জনাকে নগদ কিছু আর গহনা কিছু দিয়েছি—বাকী ব্যাঙ্কের টাকা তোকেই দিলাম। উলুর জন্য রাখলাম গহনা আর টাকা কিছু।

কথাগুলো শুনেছিল উলু। কিন্তু তাব তখন বিরহাশঙ্কায় ওসব শুনবার মত মনের অবস্থা ছিল না। আজ আবার ঠাকুমা তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন,

—এইখানে সিন্দুকের চাবি থাকে, বুঝলি? আর এই নে তোর জন্য জমা আমার পঁচিশ হাজার টাকা। বাকী যা রইল থাক সিন্দুকেই। ওটার ব্যবস্থা আমার ছেলে অমর করবে। শ্রাদ্ধশান্তি ইত্যাদিতে তো খরচ আছে ভাই উলু।

উলু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু ঠাকুমা ওর শুকনো মুখ—বিরহতপ্ত মলিন দেহ দেখেই কিছু নগদ টাকা ওর হাতে দিয়ে

ওর মনটা ভোলাতে চাইছেন। তাই তিনি জোর করে উলুর হাতে টাকা-ভরা ক্যাস বাক্সটা তুলে দিয়ে বললেন,

—যা, তোর সিন্দুকে রাখগে। টাকা খুব দরকারী জিনিষ বুঝলি? ওকে রাখলেই ও তোকে রাখবে।

উলু কিছু বললো না। কিন্তু ওর মন থেকে কে যেন বললো, —টাকা রাখে আবার টাকাই মারে মানুষকে। টাকাই সব, রাজা করে—আবার সর্ব্বনাশও ঘটায়। টাকাই মানুষের পরম মিত্র আবার পরম শক্র।

কিন্তু কিছুই সে বললো না। নিঃশব্দে চলে এল ক্যাসবাক্সটা হাতে নিয়ে। নিতে হোল—নইলে ঠাকুমা রাগ করবেন। উলু নিল কিন্তু কি আছে কতটাকা আছে খুলেও দেখলো না। নিজের ঘরে এসে বিয়েতে পাওয়া নতুন লোহার সিন্দুকটা খুলে একটা তাকে রেখে দিল ক্যাসবাক্সটা। তার পর নিজের চিন্তায় ডুবে গেল।

হারাধন অর্থাৎ মিঃ এইচ ঘোষাল থাকে তার টিনপ্লেটিং কারখানাতেই তবে সময় সময় সে আসে, থাকে এই বাড়ীতে। অমরবাবুর সঙ্গে তার নানা পরামর্শ হয়। নতুন স্থাপিত কারখানাটা ক্রমশ বাড়ছে—আরো কিছু টাকা অর্থাৎ মূলধন নিয়োগ করলে ওটা আরো ভাল ভাবে চলতে পারে। বর্তমানে সরকারও চাইছেন যে নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। অমরবাবুও রাজি হয়েছেন আরো কিছু টাকা বিনিয়োগ করতে। তিনি কথায় কথায় বললেন,

—মার তো কিছু টাকা রয়েছে তবে সেটা মা অমিয়কেই

দিলেন ; নইলে ঐ টাকা থেকেই এই কারবারে কিছু দেওয়া যেত।

—অমিয়রই থাকবে একটা শেয়ার—মিঃ ঘোষাল বললো—ওর থেকেই দিন না কিছু। কারবারটা বাড়াই আমি।

—সে আব কি করে হবে? অমিয় তো বিলাতে। সে টাকাতো আব আমি তুলতে পারবো না। অমিয়ই তার মালিক এখন।

—কত টাকা,

—তা হবে কযেক লাখ—অমববাবু বলে ফেললেন। কিন্তু তিনি ভাবলেন—ঘরের গোপন কথাটা তাঁর না বলাই উচিৎ ছিল হারাধনকে। যাক্—হারাধনও তার ছেলের মত। বললেন, —সেটাকা আর এখন তোলা যাবে না। অমিয় এসে তুলবে। আপাততঃ মোটা কিছু টাকা তোমাকে দেওয়া যাবে না—কারণ সেরকম টাকা এখন হাতে নেই। পরে নিও।

ঘোষাল আর কিছু বললো না তখন। কিন্তু খাবার সময বললো,

—ঠাকুমার কাছে নিশ্চয় আরো কিছু টাকা আছে। আপনি নিয়ে দিন আমায়—কারখানাটা বাড়াই। সেয়ারটা নাহয় বৌমার নামেই করে দেওয়া যাবে।

—প্রস্তাবটা তুমিই তোমার ঠাকুমার কাছে করবে। যদি থাকে তাঁর আরো কিছু টাকা তো দিতে পারেন।

প্রস্তাব করবার জন্যই রয়ে গেল সেদিন হারাধন। রবিবার ছিল—সুতরাং তার ফ্যাকটরী বন্ধ। বিকেলে বা সন্ধ্যার পর কথাটা ঠাকুরমাকে বলা যাবে এই ভেবে হারাধন সাজপোষাক পরে বেরুবে একটু বেড়াতে। অনেক দিন সে দেশে ছিল না। এসেই কারখানা খোলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল—বন্ধু বান্ধবের খোঁজ খবর নিতে পারে নি—তাই আজ একবার ক্লাব ইত্যাদিতে

যাবে। 'লন' এ চা খাচ্ছেন অমরবাবু। উলু খাওয়াচ্ছে। হারাধন এসে বসলো। বললো,

—চা এক কাপ নিশ্চয় পাব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়। বসো।—অমরবাবুই বললেন।

উলুকে বললেন—ওকে চা দাও বৌমা—

উলু নিঃশব্দে চা পরিবেশন করলো হারাধনকে। মুখকান্তি তার করুণ কোমল তখনো। হাসি যেন নাইই। দেখলো ঘোষাল। অকস্মাৎ কি-জানি-কি ভেবে বলে বসলো,

—ও যেরকম মন খারাপ করে রয়েছে, ওতে তো অসুস্থ হয়ে পড়বে মামাবাবু।

—হ্যাঁ—সত্যি! যাওনা মা কোথাও একটু বেড়িয়ে এসো।

—না বাবা—উলু জবাব দিল।

—কেন? চল, তোমাকে আমাদের ক্লাবে নিয়ে যাই চল, কথাগুলো বললো হারাধন। সে ভাসুর কিন্তু বর্ত্তমান দিনে ওসব ভাসুর-ভাদ্রবধূর সম্পর্কে আর বিধিনিষেধ কিছু নেই। সবাই বন্ধু আর দাদা পর্য্যায়ে পড়ে এখন। হারাধন তার উপর বিলেত ফেরৎ লোক; অনায়াসে বলে ফেললো কথাগুলো। উলু রাজি নয়। বললো,

—আমি বরং একবার ওপাড়ায় বাবার কাছে যাব—

—তাই যাও—তোমার ঠাকুমাকে বলে যাও। কখন ফিরবে?

—তাঁকে বলেছি। ফিরবো ওখানে খেয়ে রাত বারোটা নাগাদ।

—বেশ—তাহলে আজ নাহয় নাইবা ফিরলে। সকালে ফিরো।

—আপনার অসুবিধে হবে বাবা।

—না মা—না—সে যাহয় হবে। তুমি সকালেই ফিরে এস।

হারাধন সুযোগ পেয়ে বললো,

—তা বেশ—আমাদের ক্লাব তো ওদিকেই। চল, আমিই তোমায় পৌঁছে দিই আমার গাড়ীতে—ওখান থেকে কাছেই।

—আমি খানিক পরে যাব বাবা—উলু আবার জবাব দিল।

—না না পরে কেন আবার? যাও—হারু যাচ্ছে পৌঁছে দেবে। সকালে তোমার বাবার গাড়ীতে ফিরবে।

উলু আর কিছু বলতে সাহস করলো না। কারণ আর কিছু বললে হারাধন অপমান বোধ করতে পারে। কিন্তু হারাধনের সঙ্গে যাবার তার ইচ্ছে নেই। হারাধন আবার বললো,

—চলো উলু—

—চলুন—উলু এসে ভেতরের সীটে বসতে যাবে হারাধন তার হাত ধরে চালকের আসনের পাশে বসিয়ে দিল।

—ওখানে কেন—এখানে বসো।

গাড়ী চলেছে—হঠাৎ হারাধন বললো—অতখানা বিরহিনী হবার কি দরকার? বৈষ্ণবকবির যুগ নেই এখন।

উলু চুপ ক'রে রইল। হারাধন একটু তাকিয়ে বললো, —তোমার মত সুন্দর মেয়ে পৃথিবীতে কমই জন্মায়, বুঝলে উলু। অনর্থক বিরহ জ্বালিয়ে তাকে, শুকিয়ে দিও না। ওটা আহাম্মুকী। যৌবন ক'দিনের? তাকে যথাসাধ্য ভোগ করে নিতে হয়। এসো, ক্লাবে এসো।

উলু দুঃখের মধ্যে বড় হয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ বুঝে নিল হারাধনের উদ্দেশ্য। আস্তে বললো—বাবা আমার জন্ম চিন্তা করবেন। তিনি জানেন আমি এখনি পৌঁছাব।

—চিন্তার কি আছে? তাঁকে ফোন করে বলে দাও তোমার একটু দেরী হবে। হাত ধরে বিলাতী কায়দায় নামিয়ে দিল সে

উলুকে। নিরুপায উলু নামলো, এটা কি ক্লাব জানে না উলু। এর নামই শোনেনি কখনো।

নাম না শুললে কিছু এসে যায় না ক্লাবটা বর্ত্তমানে খুব নাম করা ক্লাব। 'যুবশ্রী সঙ্ঘ'—নাম কিন্তু ওরা বলে 'যৌবনশ্রী সঙ্ঘ'। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাত্রী একজন মহাধনী মহিলা যিনি তিনবার বিলাত, ডুবার আমেরিকা ঘুবে এসেছেন এবং বার পাঁচ সাত পৃথিবীর আরো নানা দেশে ঘুরেছেন। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর সুপ্রচুর কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাবতে ভ্রমণ তিনি করেছেন মাত্র চাবটি জাযগায়। কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এছাড়া তাঁর নিজদেশ যেখানে তিনি কোন দেশীয় রাজ্যেব রাণী ছিলেন। বর্ত্তমানে সরকারি বৃত্তিতে আছেন। তাঁব স্বামী পঙ্গু অর্থাৎ ইনভেলিড। কোথায় কোন একটা একসিডেন্টে পড়ে ভদ্রলোকের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। বেঁচে তিনি আছেন তবে ওরকম বেঁচে থাকার থেকে মরে যাওয়া ঢেব ভাল।

কিন্তু এগল্প তাঁর গল্প নয়; তাঁর গল্প স্বতন্ত্র একখানা বড় গল্প হবার আবেদন রাখে। তাঁর ঐ বাঙালী স্ত্রী শুধু সুন্দরী নন পরম বিদূষী এবং বাণী-বক্তৃতায় বিশেষ দক্ষা। বর্ত্তমান দিনে যখন ভাষণ দেওয়া এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়াই একটা বিশেষগুণ হয়ে উঠেছে সে সময় এই রাণী নিপুনিকাইবা চুপচাপ বসে থাকবেন কেন? তাঁর কলকাতার প্রাসাদে তিনি কিছু একটা করতে চান; ঠিক এই সময় নীরার সঙ্গে হোল তাঁর আলাপ এবং সৌহার্দ।

ওরকম একজন মহাধনবতী মহিলার সঙ্গে নীরার মত মেয়ের আলাপ এবং সৌহার্দ হোল কি করে? হয়েছিল আমেরিকায় যখন নীরা নিকোর সঙ্গে যুক্ত ছিল। ধনী নিকো নানা জায়গায় নীরাকে ঘুরিয়েছে। সেই সময়টা নীরার জীবনের এক বিশেষ

৲

অধ্যায়। ঐ মাসকয়েক সে সাম্রাজ্ঞীর মত জীবন যাপন করেছে। তারপর পড়লো পথে। ঐ সময়ই রাণী নিপুনিকার সঙ্গে তার দেখা আলাপ এবং দেশে ফিরে ক্লাব খুলবার কথা পাকা হয়। নীরা অবশ্য সাধারণ ভাবে ফিরে এসেছে দেশে, আছে বাড়ীতে ভাবছে কি এখন সে করবে। মাতা দু'বেলা তাকে গঞ্জনা দেয় নীলুকে ছেড়ে শিকোকে ধরবার জন্য। কিন্তু ঐ মাই তাকে শিকোর দিকে এগিযে দিয়েছিল। যাক সে কথা।

হঠাৎ নীরা চিঠি পেল রাণী নিপুনিকার। তিনি দেশে ফিরেছেন—পূর্ব্ব সংকল্পমত ক্লাব খুলবেন। নীরা যেন দেখা করে। নীরা সুসজ্জিতা হয়ে সেই দিনই দেখা করলো গিয়ে রাণী নিপুনিকার সঙ্গে। কথাবার্ত্তা তো হয়েই ছিল আমেরিকায়, নামটাই ঠিক করতে যা সময় লাগলো। নীরাই ভেবে চিন্তে নাম ঠিক করে বললো,

—নাম দেব 'যুবশ্রী-সঙ্ঘ'!

—বাঃ সুন্দর নাম! রাণী নিপুনিকা অনুমোদন করলেন। এব কয়েকদিনের মধ্যেই যুবশ্রী সঙ্ঘ স্থাপিত হোল। তার সদস্যা ও সদস্য সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চললো কারণ এই ক্লাবের প্রধান আকর্ষণ শুধু নৃত্য গীত অভিনয় নয় এর আর একটা বেশী আকর্ষণ আছে তা হচ্ছে "ইনটারন্যাশনেল হওয়া" বা আন্তর্জাতিক হওয়ার শিক্ষা। ভারতে বসেই সারা পৃথিবীর সকল দেশের রীতিনীতি এবং সমাজ সম্বন্ধে সকলরকম জ্ঞান অর্জন এবং নিজেকে আন্তর্জাতিক করে গড়ে তোলার এ একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান। এখানে চল্লিশ পার হলে কোন মেয়ে বা পুরুষ সদস্যা হতে পারেন না। তবে যাঁরা সদস্যা আছেন তাঁদের বয়স যাই হোক তাঁরা থাকবেন। বিলাত আমেরিকা ফেরতদের এখানে প্রচুর সম্মান এবং যাঁরা ঐ সব দেশে যান নি তাঁদের যাওয়ার ব্যবস্থাও এঁরা করেন।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই যুবশ্রী সঙ্ঘ বেশ নাম করা ক্লাব হয়ে উঠেছে অভিজাত মহলে। এখানে সবরকম খেলাধূলা সাঁতার এবং সংগীত নৃত্য অভিনয় তো হয়ই, জার্মান রাশিয়ান এবং ফরাসি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে অর্থাৎ ক্লাস আছে।

উলু গিয়ে পড়লো এমন একটা জায়গায়। চক্‌চক্ ঝকমক করছে সব আসবাব, তার সঙ্গে ঝিলিক দিচ্ছে সুন্দরী তরুনী আর সুন্দর তরুন সুন্দর বেশভূষায় সেজে। উলু নেমেই বুঝলো এমন একটা জায়গায় তাকে আনা হয়েছে যেখান থেকে আত্মরক্ষা করে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন হবে।

কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল এবং বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, ঘাবড়ালো না—সে বুঝলো এখন কোন কিছু বললে বা অস্বীকার করলে তার অবস্থা খুব বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে কারণ জায়গাটা একটু দূরে—কাছাকাছি ট্রাম বাস লাইন দেখেনি উলু। বেশ খানিকটা মাঠ পার হয়ে তবে ওরা এলো এই যুবশ্রী ক্লাবে।

—আসুন—আসুন—।

সাদরে অভ্যর্থনা করলো ওদের নীরা এবং আরো কয়েকজন। বোঝা গেল মিঃ এইচ ঘোষাল এখানে সবিশেষ পরিচিত। নীরা বললো,

—এঁর পরিচয়টা।

—ও আমার নিকট আত্মীয়া নাম উলুপী—মন খারাপ করে দিনরাত বসে থাকে তাই আনলাম একটু আনন্দের আমেজ দিতে।

—কেন? মন খারাপ কেন।

—ওর স্বামী গেছে বিলাতে পড়তে। তাই মন খারাপ।

—ও—তা মন খারাপের কি আছে। আসুন, মেম্বার হয়ে যান।

—না—এখন থাক—উলু আস্তে বললো কথাটা।

—কেন? স্বামী নেই বাড়ী—এতো খুব ভালকথা- সুযোগ।

কথাটা কে যে বললো জানতে পারলো না উলু। কিন্তু উপস্থিত এরা সকলে হেসে উঠলো উলু অমন কথা আগে শোনে নি—কিন্তু উলু অনেক জানে—অনেক দেখেছে। সে বুঝলো এখানে তাকে আনার কি অর্থ হতে পারে।

ঐ সব জায়গায় সুন্দরী মেয়ে নিয়ে গেলে তার সম্মান বাড়ে—হারাধনেরও বাড়ছে। নারী বললো,

—ক্লাবে ভর্তি হয়ে যান—রোজ আসুন। আপনার ভাঙা মনটা আমরা রিপেয়ার করে দেব তিনদিনেই।

—আজ থাক অন্য দিন মেম্বার হব।

হারাধন কথাটা লুফে নিয়ে উলুকে বললো,

—না না অন্যদিন না—আজই হয়ে যাক। অনর্থক বসে বসে শরীর খারাপ করোনা—এখানে তুমি খুবই ভাল থাকবে উলু।

—বাবাকে না জানিয়ে কিছু করা ঠিক হবে না।

—বাবাকে মানে তোমার কোন বাবাকে? মামাকে?

—হ্যাঁ—আর আমার বাবাকেও জানাব আমি।

— তুমি এখনো নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে আছ। শুনছো উলু—এসব ব্যাপারের তাঁরা কি বুঝবেন! "ওল্ড ফুল" সব। না—আজই আমি তোমাকে মেম্বার করে দিচ্ছি এখানে। অনুন তো মেম্বারশিপ্ ফর্ম—সই করিয়ে নিন, আমি টাকা চ্ছি।

—শুনুন—উলু হাসলো একটু। হেসে আবার বললো সব কাজে গোঁড়ামি আর গোয়ারতুমি আমি পছন্দ করিনে। আমার স্নেহশীল বাবা যখন শুনবেন, আমি তাঁকে না জানিয়ে কোনো ক্লাবের মেম্বার হয়েছি তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখ পাবেন। অকারণ তাঁকে আমি দুঃখ দিতে চাইনে। কারণ তিনি এমনিতেই শোকগ্রস্ত। দাদা আমার

বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন। অতএব বেশী জেদ করবেন না আপনি।

উলু শক্ত হয়ে বললো কথাগুলো। হাবাধন কি যেন বুঝে আর বেশী কথা বললো না।

উলুই বললো—হয়ে যাব মেম্বার কিন্তু এই ক্লাবের কর্ত্রী কে? তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই আজ।

—বেশ তো—আসুন—নীরা ডাকদিল—তিনি ওঘরে আছেন।

—যান-যান ওকে রাণী সাহেবাব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন—হরিধনই বলল্গো—ওখানেই মেম্বর করিযে নেবেন। টাকা নিন।

টাকা দিচ্ছে হরিধন—অল্প নয়—ভর্তিফি একশ। এবং মাসিক বার টাকা, তাছাড়া প্রত্যেকটি বিভাগেব জন্য আলাদা ফি আছে যেমন খেলার জন্য দশ—সাতারের জন্য পনের—গানেব জন্য কুড়ি। উলুই নিল টাকাটা হাত পেতে। হাবাধন কৃতার্থ হয়ে গেল। বললো,

—এইতো লক্ষ্মী মেয়ের কাজ। যাও—রাণী সাহেবার সঙ্গে আলাপ করে মেম্বার হয়ে যাও—প্রতিদিন ঘণ্টা তিনচাব এখানে আসবে। বিস্তর আনন্দের খোরাক রয়েছে এখানে—যা চাও—যা চাইবে—পাবে সবই।

উলু মৃদু হেসে চলে গেল নীরার সঙ্গে। প্রকাণ্ড একটা টেবিলের এক পাশে বসে আছেন রাণী নিপুনিকা—নীরা নিয়ে এল উলুকে।

—এই মেয়েটি নতুন এলো—ওপাড়ার খ্যাতনামা ধনী অমর-বাবুর পুত্রবধু—স্বামী গেছে বিলাতে পড়তে। ও থাকে একা—মন গুমরে থাকে—তাই আমাদের মেম্বর মিঃ ঘোষাল ওকে এনেছেন।

—খুব ভাল—খুব ভাল! কি নাম তোমার?

—উলুপী—আমি কিন্তু বিলাত ফেরৎ নই ; লেখাপড়াও বেশী জানিনে।

—তাতে কি। বিলাত ফেরুত্তের বৌ তো তুমি। লেখাপড়া অবশ্য কিছুটা জানা দরকার—তা কতটা জানো।

—প্রায় কিছুই না—স্বামীকে চিঠি লিখতে পারি—বানান ভুল হয়। তিনি রেগে যান—বলেন বাংলা ভাষাটাও জান না। প্রিয়তম লিখতে পিরতম লেখ—তোমাকে নিয়ে কি যে আমি করবো। নীরা হাসতে লাগলো। রাণী নিপুনিকাও হেসে বললেন,

—প্রিয়তম থেকে পিরতম কিছু খারাপ কথা নয়—পিরতম তো খুবই ভাল কথা। তিনি ফিরবেন কখন?

—এই তো মাসখানেক গেছেন।

—কি পড়বেন?

—ডাক্তারী—আমি বলেছিলাম যেতে হবেনা—কবিরাজী না-হয় হোমিপ্যাথি শেখ—তা উনি রাজি হলেন না। বললেন যে বাবার যখন টাকা আছে আর আমার যখন শরীর স্বাস্থ্য বিদ্যা সবই আছে তখন না-যাব কেন। আমি ডাক্তার হয়ে ফিরে তোমাকে বিদ্যাসাগরের কথামালা পড়াব—'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল ..... নাকি যেন বলেছিলেন—'

হা হা হি হি করে হাসতে লাগলেন রাণী নিপুনিকা এবং নীরা। অতঃপর রাণী সাহেবা হাসি থামিয়ে বললেন,

—তাঁকে আর কিছু করতে হবে না—আমরাই তোমাকে দুরস্ত করে দেব—নাও—মেম্বার হয়ে যাও দেখি লক্ষ্মী মেয়ে।

—মেম্বার হবার আগে আমার একটা নিবেদন আছে।

—বল।

—আমার মা নেই। বাবাই একা ; তাঁকে ফোন করে আমি

জানিয়ে রেখেছি—'আমি যাচ্ছি' তিনি হয়তো আমার জন্য না-খেয়ে বসে থাকবেন।

—তাঁকে ফোন করে জানিয়ে দাও।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

উলু ফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে ডাকলো অসিতবাবুকে—আমি উলু—বাবা—আমি একটা ক্লাবে রয়েছি—ঠিকানা—কি এই যায়গার ঠিকানা?—প্রশ্নটা করলো উলু নীরাকে। নীরা বললো এখানকার ঠিকানা। উলু এরপর অসিত বাবুকে বললো—তেইশ বাই চার—শ্রীরঙ্গপত্তন রোড্—টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে বিজনপার্ক পার হয়ে—আরো আধমাইল পথ—বাবা আপনি গাড়ী পাঠান।

—হ্যাঁ—বলে আরো কয়েকটা কথা বললো অসিতবাবু উলুকে।

ফোন রেখে উলু বললো,

—রাণী সাহেবা—আমার বাবা যথেষ্ট ধনী ব্যক্তি। তিনি বললেন—অত তাড়াতাড়ি মেম্বার হোস নে। আমি তাঁদের কাগজপত্র দেখবো—দরকার হয় কিছু মোটাটাকা ডোনেশন দেব। তুই তাঁদের লিটারেচার নাকি যেন বললেন সব নিয়ে আয় আমার কাছে। দেখে আমি কাল নিজে গিয়ে তোকে মেম্বার করে দেব। নিজে না দেখে আমার মেম্বার হওয়াটা তিনি পছন্দ করছেন না।

—খুব ঠিক কথা—তা বেশ—তিনি কাল আসুন।

—হ্যাঁ—আমার জন্য গাড়ী এখুনি এসে যাবে।

—আচ্ছা;—যাও—ঘরটা ঘুরে দেখ গে।

—আপনার কাছে থাকলে কি আপনার অসুবিধা হবে কিছু?

—না—না কিছু না। সবটা তোমাকে দেখতে বলছি—তোমার যদি ইচ্ছা হয় তো বসো এখানেই।

—মেম্বার না হয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঘুরতে চাইনে। যদি কেউ আমাকে বলে বসেন 'কে তুই?'

—না না—সেরকম কেউ বলবেনা। বেশ তুমি অপেক্ষা কর গাড়ীর জন্য। নীরা চলে গেছে। উলু বসে রইল। আধঘণ্টা পরে গাড়ী এল—উলু নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। ঘোষালের সঙ্গে দেখা করলো না।

সহরের কাছেই সেবাশ্রম নীলুদের। টাকাপয়সা আজকাল ভালই আমদানী হচ্ছে ওখানে, কারণ আর কিছু নয়—প্রচার। বেশ কিছু টাকা ইদানিং এসে গেল একটা বড়রকম সেবাকাজের জন্য। কাজটা বন্যাত্রান—মেদিনীপুরএ কাঁথি অঞ্চলে বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করতে গেল ঐ আশ্রম থেকে নীলু এবং আরো কয়েকজন।

এই আশ্রমের বিশেষত্ব হচ্ছে—কোন নারী নেই এখানে। সকলেই পুরুষ এবং যুবক। এই আইনটা নীলুই চালু করেছে। কেন করেছে, তা যাঁরা তার ইতিহাস পড়েছেন তাঁরা বুঝবেন। নীলু যখন এখানে এসেছিল, তখন এখানে ছিলেন মাত্র স্বামীজী আর তাঁর তিনজন শিষ্য যারা প্রায় উপাসনা—এবং যোগ সাধনার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ সেবামূলক কাজও করতেন। এখন কিন্তু এর অবস্থা অন্যরূপ। নীলু সেবাব্রতটাই মুখ্য করে আশ্রমটি খাড়া করেছে। কয়েকটা আইন বিধিবদ্ধ করেছে এবং টাকাপয়সার জন্যও সে কিছু ব্যবস্থা করেছে। প্রচার কিছু না করলে বর্ত্তমান যুগে কোন কাজ করা সম্ভব নয়—তাই প্রচারও কিছু করার ব্যবস্থা সে করেছে। সবই কিন্তু স্বামীজীর নামে। নীলুর নিজের নাম কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা এখানে।

. নীলু আইন করেছে—এখানে কোন নারী থাকবে না। সেবার কাজে নারীর যতই দক্ষতা থাক—পুরুষের সঙ্গে তার একত্রে কাজে বিস্তর বিড়ম্বনা জাগায়। নারী তার কর্ম্মক্ষেত্র নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই বেছে নিক—পুরুষের সঙ্গে মিশে তার কাজ বাধাই আনে—বিপর্য্যস্ত করে তোলে কর্ম্মকে। নীলু কি নারী-বিদ্বেষী হয়ে উঠলো নাকি ? হ্যাঁ—কতকটা তাই। তার ধারণা জন্মেছে ওজাত যেখানে যাবে অঘটন ঘটাবে; ওরা মাতা-কন্যা-বধূ—ওরা-স্বসা বা শশ্রুমাতা হতে পারে—ওরা বান্ধবী নয়—ওরা বান্ধবী হতে পারে না। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার অর্থ নিজেকে নষ্ট করা—নিজেকে জাহান্নামে দেওয়া। ওরা যেখানে থাকবে জ্বালিয়ে ছাড়বে।

ঐ একই ক্লাবে আরো কয়েকটি পুরুষের জীবনকে জ্বালিয়ে দিতে দেখেছে নীলু। দেখেছে নারী কিভাবে ধীরে ধীরে অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে পুরুষকে অধিকার করে—তারপর অকস্মাৎ অতর্কিতে সেই প্রাপ্ত পুরুষকে পদাঘাত করে অপর পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্ত্তমান যুগে অন্ততঃ সভ্যতার আওতায় যারা এসেছে তারা নারীকে বান্ধবী করছে—বঞ্চিতও হচ্ছে। না—নারীর কোন সাহায্য এ আশ্রমে গ্রহণ করা হবে না।

নীলু তাই আইন করেছে—আশ্রমের কোন কর্ম্মী যদি বিবাহ করতে চান তো তিনি আগে পদত্যাগ করবেন। প্রেমে যদি পড়েন তো তাঁকে আশ্রম ত্যাগ করতে হবে। এখানে প্রেম শুধু কাজের সঙ্গে। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করাই হচ্ছে প্রেমের পরম পাথেয়।

নীলুর মত্ অন্য সকলের মনোমত না হলেও এটা যখন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম—এবং সেবার প্রতিষ্ঠান তখন সকলেই মেনে নিল তার কথা। আশ্রমের কর্ম্মী সংখ্যাও বাড়লো। বেশীর ভাগ কলেজের

ছাত্র। ছাত্রীরাও আসতে চেয়েছে কিন্তু এখানকার আইন জেনে আর এগোয়নি।

উপর্য্যুপরি কয়েকটা ভাল কাজ করে প্রচারের মাধ্যমে এই সেবাশ্রম বেশ খ্যাতি অর্জন করলো। কয়েকজন বদান্য ব্যক্তি বাণী তো দিলেনই অর্থও কিছু দান করলেন। সরকারী সাহায্যও পাওয়া যেতে লগলো। বছব দুই-এর মধ্যে আশ্রমটি বেশ নামকরা আশ্রমে পরিণত হোল।

কয়েকটা ভাল কাজ এঁরা করেছেন—যথা আরোগ্যালয়—কারিগরী শিক্ষা—কৃষি শিক্ষা—এবং সাধারণ শিক্ষাও। এসব কাজে টাকার অভাব হয় না—হচ্ছে না। জমজমাট অফিস করে নীলু এই আশ্রম চালায়। স্বামীজী স্বয়ং কিছু করেন না—করবার দরকার হয় না। নীলুই সব—সেই জন্য এখানকাব সকলে নীলুকে অধ্যক্ষ বলে জানে। এখানে ওরা যে-কজন আছে সকলেই 'স্বামীজী'—নীলুও স্বামীজী—নাম—স্বামী আগমানন্দ।

আগমানন্দ নামটা নিজেই নিয়েছে নীলু—কারণ এমন একটা নাম সে নিতে চায় যার সঙ্গে তার পূর্ব্বের নামের কিছুমাত্র মিল নেই। বাপের বিশাল প্রাসাদ ছেড়ে চলে এসেছে নীলু—জীবনের উপর ওর সেদিন কোন মমতাই ছিল না—সঙ্গীদের উপর তো নয়ই! কিন্তু নীলু চিন্তাশীল—বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান যুবক। সে ভাবলো জীবনটাকে নষ্ট না করে কোন সৎকাজে সে দান করবে। তাই সে এই আশ্রমে এসেছিল—এবং এখানকার কাজে যোগ দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছে। মানুষের সেবার মধ্যে যে আনন্দ এবং আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায়—তার মূল্য সাধারণ ভোগী-জীবন থেকে কম কিছু নয়—অন্ততঃ নীলু কম মনে করেনা।

স্বামী আগমানন্দকে কেউ কেউ আগমবাগীশও বলে। অথচ আগম শব্দটার মানেই হয়তো নীলু ভালকরে

বোঝে না। কিন্তু কিছু তাতে এসে যায়না। নীলুর কাজ ঠিকিই চলছে।

মাঝে মাঝে বাবার কথা এবং বাড়ী ঘরের কথাও তার মনে যে না জাগে তা নয়। ভেবে রেখেছে বাবার সম্পত্তিটাও নীলু এই আশ্রমেই দান করবে, কারণ জীবনকে সাধারণ লোকের মত ভোগ করবার ভাব আর ইচ্ছে নেই। তবে নীলুর অন্য একটা মহৎ ইচ্ছে আছে—সেটা দেশ ভ্রমণ।

এইটা সে করতে চায়। অবশ্য বাপের পয়সায় অনায়াসে সেটা সে করতে পারতো। বিলাত আমেরিকা ঘুরে আসা তার পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না। নীরাই সর্ব্বনাশ করলো, জীবনটাকে জাহান্নামে দিল নীলুর।

কিন্তু না—জাহান্নামে যায়নি নীলু। তার জীবনকে সে ভাল কাজেই লাগিয়েছে।

তার ঈশ্বরবিশ্বাসী বাবা নিশ্চয় ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে ভালই থাকবেন। নিত্য শিবপূজা করেন তিনি। হয়তো মাঝে মাঝে নীলুর কথা ভাবেন। তিনি খুব বেশী ভেঙে পড়বেন না—জানে নীলু। ভাঙ্গলে নিশ্চয় তিনি নীলুকে ফিরে পাবার জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন কাগজে। সেরকম কিছুই নীলু দেখলো না এত দিনেও। বাবা কি তার কথা ভুলেই গেলেন নাকি?

মাঝে নীলু খবর পেয়েছিল—কি একটা বিশেষ কাজের জন্য তার বাবা রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করেছেন। সেও তো হোল বেশ কিছুদিন। তারপর সংবাদপত্রে আর কোন খবর পায়নি নীলু তার বাবার। আজ হঠাৎ খবরের কাগজে দেখলো নীলুর বাবা অসিতবাবু স্ত্রীরোগ চিকিৎসার জন্য একটা বিশেষ কেন্দ্র স্থাপনের তহবিলে একলক্ষ টাকা দান করেছেন। খবরটা মোটা অক্ষরে প্রথম পাতাতেই ছাপা হয়েছে।

তবে আর কি! বাবা তাঁর সমুদয় সম্পদ দান করেই, আনন্দ লাভ করুন। নীলুর কোন দুঃখ নাই। কারণ সে আর ধন-সম্পদের প্রার্থী নয়। জীবনকে ত্যাগদিয়ে ভোগ করবার সাধনা ত্যাগেন ভুঞ্জিথা—এই ঋষিবাক্য সে পালন করবে। নীলু আশ্বস্ত হোল। ভাবলো বাবা তাহলে ভালই আছেন। দানধ্যান এবং পূজাপাঠ নিয়ে ভালই থাকবেন তিনি—নীলু নিশ্চিন্ত হোল।

—উত্তর ভারতটা আমার একেবারেই দেখা হয় নি—নীলু বললো স্বামীজীকে—যদি অনুমতি করেন তো একবার ঘুরে আসি। আশ্রম তো ভালই চলছে।

—হ্যাঁ যাও ঘুরে এসো। দেখে এসো দেশের কোথায় কি আছে। অতীত ভারত বর্ত্তমান ভারত এবং ভবিষ্যতের ভারত গঠনের কাজ দেশভ্রমন না করলে বুঝবে কি করে! যাও তুমি, মাস দুই ঘুরে এসো।

—তাহলে আপনাকে সব কাজ দেখতে হয়!

—আমি দেখবো। তাছাড়া ওরাতো আছে, বেদানন্দ, বিদ্যানন্দ এবং আরো সব।

—আমি তাহলে কবে যাব?

—পাঁজিখানা আন। আমি বলে দিচ্ছি।

পাঁজি দেখে দিন ঠিক করে দিলেন স্বামীজী। আর ছয়দিন পরে নীলু যাবে উত্তর ভারত প্রদক্ষিন করতে। এর মধ্যে তার প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করে নিতে হবে। নীলু সব ঠিক করে নিল এবং যথাদিনে বেরিয়ে গেল ভারত ভ্রমণে। টাকাপয়সা সামান্যই নিল সে। খরচও তার সামান্য তবে যানবাহনের খরচ এবং দর্শনীর খরচ তো চাই। স্বামীজী বললেন,

—বিশেষ বিশেষ যায়গায় তিনি টাকা পাঠাবেন নীলুর নামে।

নীলুর নাম অবশ্য এখন আগমানন্দ স্বামী, এই নামেই চলছে।

দূর দূর হয়ে গেল বাংলা দেশ—কলিকাতা সহব—নীলুর বাড়ী। কেদার বদরীর তুষারাচ্ছন্ন পথের যাত্রী হবে সে। গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী দেখবে আর দেখবে হিমালয়ের রূপ যা দেখবার জন্য নালুর এই ভ্রমণ। সে সটান হিমালযেব পাদমূলে হরিদ্বারে এসে পৌছালো।

সাধুর বেশ তার অঙ্গে—সুতরাং সাধরণ ব্যক্তি তাকে সাধারণ মনে করে না—সাধুই মনে করে। তাই একটা আশ্রমেই উঠলো এসে নীলু। একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী সাধু এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। বহু বাঙ্গালী শিষ্যও করেছিলেন তিনি। নীলু সেখানে সাদবে ঠাঁই পেল।

ওখান থেকে নানা যায়গা দেখে বেড়ানো সহজ এবং চিঠিপত্র ওখানকার ঠিকানায় আসতে পারবে নিরাপদে। নীলু তাই করল।

ওর একজন সঙ্গীও জুটলো, এক বাঙালী যুবক নাম রঞ্জিত কুমার—নীলু তাকে শুধু কুমাব বলে। তার বাবা নাকি ঐ আশ্রমের শিষ্য ছিলেন। কুমাব খুব ভাল ছেলে। বিয়ে এখনো করেনি। দেশভ্রমণে বেরিয়েছে। নীলুর সে খুব ভাল সঙ্গী হোল। দুজনে বেরিয়ে পড়লো পথে। কুমারের সঙ্গে একখানা ট্রানজিষ্টার রেডিও আছে। দেশের খবর তারা ওর মারফৎ পায়—নীলু দেশের খবরগুলো শোনে।

উলু চলে এলো অসিতবাবুর বাড়ী। পরদিন সকালেই তার ফিরে যাবার কথা, কিন্তু উলু ফোন করে ঠাকুরমাকে জানালো যে তার বাবার শরীর ভাল না থাকায় সে এবেলা যেতে পারবে না। কথাটা হারাধনও শুনলো। সেই ফোনটা ধরেছিল। উলুর কথা শেষ হলে শুধোলো,

—কাল আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে এলে ক্লাব থেকে ?

—আপনার খোঁজ করেছিলাম আপনি ছিলেন রিহার্সেলরুমে।

—ও আচ্ছা—আজ আসছো তো ক্লাবে ?

—ঠিক বলতে পারবো না। বাবা যদি ভাল থাকেন তো যাব।

—কি অসুখ তাঁর—জ্বর ?

—না—হার্টের ব্যাপার—খুব সাবধানে থাকতে হয়।

—ও—আচ্ছা—আশা করি তিনি শিগ্রি সেরে উঠবেন।

—ভগবান মালিক—উলু বললো এবং নমস্কার জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিল। অতিশয় অস্বস্তি লাগছে তার। চিন্তাও খুব হচ্ছে। করবে কি সে ? আত্মরক্ষা করা যায় কি করে ?

চিন্তা করে কোন কিছুই ঠিক করতে পারলো না উলু। অসিতবাবু অসুস্থ তবে মারাত্মক কিছু নয় সাধারণ ভাবে শরীর তাঁর মাঝে মাঝে খারাপ হয় আজকাল। বয়স তো হোল। তারপর জীবনভোর দুঃখই তিনি পেয়ে আসছেন। যৌবনে স্ত্রীবিয়োগ তারপর একমাত্র পুত্রের গৃহত্যাগ—ওরকম একজন লোকের পক্ষে খুবই দুঃখদায়ক। তবে খুব বেশী আমল তিনি দেন না দুঃখকে। ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি তিনি। পূজা আহ্নিক এবং আরো কয়েকটা সৎকাজ নিয়ে থাকেন। টাকা তাঁর আছে সদ্ব্যয়ও করেন তার। এই সেদিন তিনি দিলেন একটা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ টাকা। মনে মনে ভেবে রেখেছেন উলুর তো খুব ভাল ঘর বরেই বিয়ে দিয়েছেন। তার জন্য আর কিছু লাগবে না। সামান্য কিছু রেখে বাকী সব সম্পদই তিনি জনসেবায় দান করবেন। যদি নীলু কোন দিন ফেরে তো ঐ সামান্য যা থাকবে তাই নেবে।

সংকল্পটায় বাধা দিয়েছিলেন তাঁর পুরাতন ম্যানেজার। তিনি

বলেছেন, যে-কারবার আপনি করেছেন তার আয় যথেষ্ট, চলছেও ভাল—সেখানে আপনার শ'খানেক লোক কাজ করে। সবই যদি আপনি উঠিয়ে নেন তো ঐ একশ' লোককে বেকার হয়ে যেতে হয়। ভেবে দেখুন, সেটা কি ঠিক হবে ?

—না, নিশ্চয় না—অসিতবাবু বলেছিলেন—কাউকে বেকার করে জনসেবা করা যায় না উপেনবাবু, কিন্তু কে চালাবে এই কারবার ? আমি বৃদ্ধ হলাম আপনিও যুবক নেই। কার উপর ভার দেব এই কারবাবের। ছেলে চলে না গেলে ভাবতাম না।

—সে কথা ঠিক স্যার—নীলু আমাদের সকলকে অতল জলে ডুবিয়ে গেছে।

কথাটা ওঁর অফিসের বাবুরা শুনলেন। বহু কর্ম্মচারী সব মিলিয়ে প্রায় একশ'। তাঁরা চিন্তিত হয়েই ছিলেন। ম্যানেজার উপেনবাবুই বললেন তাঁদের সব কথা। সকলেই চিন্তিত। এমন মালিক কমই হয়। অতি সুখে তাঁরা চাকরী করেন এখানে। এই কারবার যদি অসিতবাবু উঠিয়ে দেন—বা বিক্রী করে দেন তাহলে কি যে হবে কে জানে। একজন বললেন,

—ওঁর মেয়ে উলু দেবীর জন্য কি কিছু রাখবেন না ?

—উনি তো মেয়ে নন পালিতা—ওঁর শালীর মেয়ে। তাঁর যে ঘরে বিয়ে হয়েছে আর যে রকম ছেলের সঙ্গে বিয়ে উনি দিয়েছেন, তাতে তাঁর জন্য আর কিছু লাগবে না। হয়তো নগদ কিছু দেবেন তাঁকে—কারবার নিয়ে উলু দেবী কি করবেন ?

—হ্যাঁ—তা ঠিক কথা। কিন্তু এ কারবার আমরা নষ্ট করতে বা বিক্রী করতে দিতে পারবো না। চলুন সকলে মিলে আবেদন করা যাবে।

এলেন কয়েকজন অসিতবাবুর বাড়ী। অসিতবাবু তাঁদের বসালেন—এবং প্রশ্ন করলেন কি তাঁরা চান।

—শুনলাম আপনি কারবার গুটিয়ে দিতে চান।

—না, এখনি কিছু ঠিক করিনি তবে কি করব বলুন। কে দেখবে এইসব ? করেছিলাম যার জন্য সে তো পলাতক—

—তিনি নিশ্চয় ফিরবেন—আমরা আশা করছি স্যার।

—বেশ ; আজই আমি কারবার তুলতে যাচ্ছি না। তবে আমার শরীরের যা অবস্থা খুব বেশীদিন টিকবার আশা নেই। তাই সময় থাকতে সাবধান হতে চাই।

—আপনার কথা ঠিক কিন্তু আমাদেরও আবেদন, এই কাজে আমরা বিশ পঁচিশ বছর আছি, তুলে দিলে আমরা বেকার হব।

—না—বেকার আপনাদের করবো না আমি। কারবারটা যদি আপনারাই পারেন তো চালাবেন—আমি উলুকে ওর মালিক করে যাব। সেই থাকবে—আপনারা দেখবেন তাকেও।

—নিশ্চয়—স্যার—এ খুব ভাল কথা।

—হ্যাঁ, আর যদি কখনো নীলু ফেরে তো তাকে দেবেন তার প্রাপ্য পৈত্রিক যা আছে। অবশ্য সে ফিরবে বলে আমি আর আশা করিনে।

—নিশ্চয় তিনি ফিরবেন স্যার।

—না, কেন যে সে গেল তাই আমি জানলাম না। আমি তো তাকে কোনদিন কিছু বলিনি।

—জেল থেকে তিনি বেরিয়েই নিরুদ্দেশ হয়েছেন স্যার।

—হ্যাঁ—কোন কারণ কেউ জানেন ?

—আমার বিশ্বাস স্যার—উনি লজ্জায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি।

—এ কি রকম কথা উপেন বাবু ? আমি তার বাবা, সে আমার একমাত্র পুত্র—তাকে বাদ দিলে আমার অবশিষ্ট কি থাকে তা সে বুঝবেনা ? এ কি রকম শিক্ষা তার—এ কিরকম মন তার ?

আমার দুঃখের দিকটা সে ভাবলো না? যাক্—যা গেছে যাক উপেনবাবু—জীবনে বহু দুঃখই পেলাম—এখন এই মেয়েটাকে পেয়েছি—ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো ধরবার মত ওই বেঁচে থাক—সুখে থাক.......

উলু চা দিচ্ছিল অসিত বাবুকে। আর সকলকেও দিতে আরম্ভ করলো। অসিতবাবুর কথা শুনে উলুর চোখ ছলছল করছে। নীলুকে সে দেখেনি—কিন্তু যে পুত্র এই স্নেহশীল বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে তার প্রতি উলু আর শ্রদ্ধা রাখতে পারছেনা।

লক্ষ্মী এসে পৌঁছাল ঠিক এই সময়। এদের দেখে শুধোলো,

—কি ব্যাপার উলু?

—না—কিছু না! ওঁরা সব কারবারের কর্ম্মী—এসেছেন দেখা করতে।

—শুনলাম আপনার শরীর ভাল নাই জেঠা মশাই!

—হ্যাঁ—একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছে। কোথায় শুনলে মা?

—উলুই ফোন করে বললো।

—না এমন কিছু না। বসো—চা খাও।

কর্ম্মীরা বিদায় নিলেন। অসিতবাবু উলুকে বললেন,

—তুই কোন ক্লাবের কথা কাল কি বলছিলি উলু?

—হ্যাঁ বাবা—কিন্তু আমার ওখানে যাবার ইচ্ছে নেই। কি করবো কি জবাব দেব তাই ভাবছি। আমার ভাল লাগেনি।

—ভাববার কি আছে। বলে দে তুই যেতে পারবি না।

—একটা অসুবিধা আছে বাবা—

—কি!

উলু বললো যে তার ভাসুর হরাধন তাকে ঐ ক্লাবে নিয়ে যেতে চায়। সে না গেলে হরাধন চটবে। শুনে অসিতবাবু কিছুক্ষণ থেমে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,—শোন মা উলু—

ক্লাবে গিয়ে নীলু আমার হারিয়ে গেল। তুই বলে দিস, বাবা যেতে দিতে চান না।

উলু চুপ করে রইল। সে বুঝেছে ঐ ক্লাবে না গেলে হারাধন কতখানি চটবে। কারণ হারাধনের মতলব উলু এর মধ্যেই জানতে পেরেছে।

ভগবান আমাকে রক্ষা করুন—ভাবতে লাগলো উলু। লক্ষ্মীকে নিয়ে সে উপরে গেল। লক্ষ্মী প্রশ্ন করলো,

—কি ভাবছিস্ উলু? এতো কি চিন্তার বিষয় ওটা।

উলু বললো লক্ষ্মীকে সব খুলে। শুনে লক্ষ্মী বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলো। দীর্ঘকাল চিন্তা করলো লক্ষ্মী। তারপর একটা শুভ বুদ্ধি বের করে বললো উলুকে,

—তুই ঠাকুরমার আশ্রয় নে গিয়ে। তাঁকে বল, তিনি যেন তোকে ক্লাবে যেতে না দেন। তাঁর অসুবিধা হবে।

বুদ্ধিটা ভাল এবং জোরালো। উলু বিকালে এল শ্বশুরবাড়ী। এসেই ঠাকুমাকে বললো যে হারাধন তাকে ক্লাবের মেম্বার করতে চায়। তিনি যেন যেতে না দেন। বৃদ্ধা হারাধনকে খুব ভাল চোখে দেখেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন,—ওসব হবে না। ও কেলাবে গেলে আমায় দেখে কে? আমার কি গতি হবে? আমি কার সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাব? কে আমার পূজোপাশার যোগাড় করবে? না হারাধন—ওসব বায়না ছাড—তোমাদের অনেক বান্ধবী আছে, তাদের নিয়ে যাও—উলুর যাওয়া হবে না—

ব্যাস-হারাধন মুষড়ে পড়লো। এ এমন একটা যায়গা যেখানে হারাধন কেন স্বয়ং অমরবাবুও কিছু করতে পারবেন না। তবু হারাধন বললো,

—মন খারাপ করে থাকে তাই আমি বলেছিলাম দিদিমা—

—তা থাকে তো থাক মন খারাপ করে। ওরকম থাকা ভাল। ও:তে স্বামীনিষ্ঠা বাড়ে। কেলাব-টেলাব আমার আমলে চলবে না। অমুকেও আমি কোনদিন যেতে দিইনি—না, ও হবে না।

হারাধন আর কিছু বলতে সাহস করলো না—কিন্তু রাগ তার যা হোল এই বুড়ির উপর তা আর বলার নয়। হাতের শিকার ফসকে যায়—ওর কি ব্যবস্থা করবে হারাধন ভাবছে।

ক্লাবে সে যাবামাত্র নীরা প্রশ্ন করলো তাকে—

—কৈ সেই উলু এলোনা ?

—না—সে একটা হারামজাদী মেয়ে।

—কেন! কি হোল ? কি করলো সে ?

—দিদিমাকে বলেছে। তিনি তাকে ছাড়বেন না; তাই এলোনা।

—তা ভাল। ওসব মেয়েরা দিদিমাদের কাছেই থাকে ভাল।

—ওকে আমার দরকার ছিল।

—তা বুঝেছি—নীরা হাসলো। বললো—বহু নৌকায় পা দিছেন, সামলাতে পারবেন না। এবার থেমে যান। উলু আপনার ভালই করলো না-এসে।

—কেন ? কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে উঠলো হারাধনের।

—স্বয়ং রাণী সাহেবা আপনার জন্য অপেক্ষমানা—আর আপনি উলুর পিছনে ঘুরছেন।

কথাটা জানত না হারাধন। অতত: বোঝোনি এতদিন। চুপ করে রইল—অনেকক্ষন পরে বললো,

—আপনাকে ধন্যবাদ;

—না, আমাকে কেন, উলুকেই ধন্যবাদ দিন।

নীরা জানিয়েদিল জানিয়ে দিল হারাধনকে—স্বয়ং রাণী নিপুনিকা তার প্রত্যাশী। কথাটার মধ্যে কতটা সত্য আছে ভাবতে লাগলো হারাধন। রাণী অবশ্য খুবই যোগ্যা সঙ্গিনী হতে পারেন হারাধনের। যদিও রূপ-যৌবনের দিক থেকে বিচার করলে রাণী নিপুলিকা উলুব থেকে অনেক খাটো তবু রাণীর অন্য নানা দিকেব যোগ্যতা অপরিমেয়। প্রথম•ঃ তিনি ধনী মহাধনী। কোন এক দেশীয রাজাকে বিযে কবে তিনি বাণী হযেছিলেন। সে প্রত্নতত্ত্বেব কথা, কিন্তু তিনি এখনো বাণীই আছেন আর আছে সেই রাজাব অগাধ অর্থ-সম্পদ যার উপরে লোভ যে কোন মানুষের হতে পাবে। বিবাহবিচ্ছিন্না অথবা বিধবা এই রাণী তা ঠিক জানেনা হারাধন—তবে তাঁর রূপযৌবন এখনো যে-কোন পুরুষের কাছে লোভের বস্তু। উলুর মত তারুণ্য তাঁব দেহে না থাকতে পারে—যা আছে তা হচ্ছে প্রগাঢ় যৌবন—মার্জিত রুচি এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা—যা পেলে হারাধন কৃতার্থ হয়ে যাবে।

অতএব হাবাধন এ সুযোগ ছাড়বে না। উলু তো আছেই। তাকে আয়ত্তে আনা খুব বেশী সাধ্যসাপেক্ষ নয। সে তো প্রায় এসেই গিয়েছিল কিন্তু উলু তো আর কোটিখানেক টাকা আনবেনা যা রাণী নিপুনিকা আনতে পারে। টাকারই দরকার হাবাধনের। টাকা থাকলে কি না থাকে।

ফ্যাকটারীটা ভালই চলছে। ওকে বড় করে চালাবার যে পরিকল্পনা করেছিল হারাধন তা হয় নি টাকারই অভাবে। ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ পরে রাণীর খাস কামরায় এল সে।

—নমস্কার।

—আসুন হারাবাবু। কি খবর?

—খবর একটু আছে। বৈষয়িক—অনুমতি করেন তো বলি।

—বলুন। আপনার সেই মেয়েটি কৈ এলনা তো? কি হোল তার?

—সে আসবে না। তার ঠাকুরমা ছাড়বে না; যাক্ গে। ওসব প্যান্‌প্যানে পাড়াগেঁয়ো মেয়ের এখানে না আসাই ভাল।

হারাধন নাক সিঁটকে বললো কথাগুলো, যেন উলুর উপর তার কিছুমাত্র মোহ বা আকর্ষন নেই। একটু থেমে আবার বললো,

—বুঝলেন, ওরা সব শাঁখ উলু আরতির দল—বাদ দিন। তিনদিনে ফুরিয়ে যায়—ওরা আবার মেয়ে নাকি?

—কি তবে ওরা? রাণী প্রসন্ন হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন।

—ছবি—ছায়াছবি—কায়া নেই ওখানে। যাকগে—শুনুন।

রাণী অবহিত হলেন শুনবাব জন্য। বললেন,

—বলুন!

—আমার একটা ফ্যাকটরী আছে জানেন তো?

—হ্যাঁ জানি—শুনেছি ভালই চলে।

—হ্যাঁ চলে কিন্তু ছোট ফ্যাকটরী। জার্ম্মনী থেকে যে বিদ্যে আমি শিখে এলাম তার অর্দ্ধেকও ওতে কাজে লাগানো যায় না। তাই ভাবছি ওটাকে বাড়াবো। কিন্তু টাকা তো চাই।

—তা চাই। আপনার মূল প্রস্তাবটা কি?

—আপনি ওর একটা শেয়ার নিন—অর্দ্ধেক ক্যাপিটেল দিন আমাকে।

—ওটাতে তো আপনার মামার শেয়ার রয়েছে।

—এই বিভাগ আমি আলাদা করে করতে চাই। আপনি আর আমি দুজনে।

—কত টাকা হলে হবে?

—অন্ততঃ দু'লাখ।

—দু'লাখেই হয়ে যাবে?

—এরপর যদি দরকার হয় তো ব্যাঙ্ক থেকে ধার নেওয়া যেতে পারে।

—আপনার সব স্কিম আর ডিটেল খরচ আমাকে দিন দেখি।

—আমি কালই আপনাকে দিতে পারবো আমার তৈরী আছে।

—দেবেন—দেখবো! কিছু একটা করা আমিও দরকার মনে করছি। বসে বসে জমানো টাকা ওডানো তো কাজের কথা নয়। দেবেন আপনার স্কিম—দেখি যদি সম্ভব হয় তো লেগে পড়া যাক।

—অসম্ভব কিছু না। খুব লাভের কারবার। এ দেশে বেশী নেই ওটা। যে কোন ব্যবসায়ীকে বললে এখুনি বাজি হয়ে যাবেন। কিন্তু আমি আপনাকেই চাইছি।

—বুঝলাম—বাণী হাসলেন মৃদু—বললেন, আমার দিক থেকে অন্য কোনো আপত্তি নেই। একটা ছোট্ট স্বর্ত্ত আছে।

—বলুন—

হ৻ —কাজ করতে হলে ঐসব উলু-টুলুর দিকে নজর দেওয়া লে না। ওগুলো বাদ দিতে হবে যাদ পারেন তো বলবেন। আচ্ছা নমস্কার। আমাকে এখুনি যেতে হচ্ছে এক যায়গায়। পরে কথা হবে।

রাণী সাহেবা চলে গেলেন। হারাধন রাণীর টেবিলেই বসে রাণীরই একটা সিগারেট নিয়ে ধরালো। রাণী এই দামী সিগারেট খান। কেউ এলে অফার করেন। লেডিজ সিগারেট কিন্তু জেন্টেসবাও খেতে পারে। বেশ কড়ামিঠে। হারাধন টানছে ধোঁয়া ছাডছে—মিনিট খানেক কাটলো, নীরা এল গম্ভীর মুখে—এসেই একটা সিগারেট নিয়ে ধরালো।

—হ্যাঁ— তারপর? কথাটা সে বললো হারাধনকে।

—কি তারপর?

—জমলো তো?

—না—জমার মত কিছু এখনো দেখলাম না।

—জমাট বেঁধে যাবে দু'দিনেই ভাববেন না। তবে একটা উপদেশ দিই।

—দিন—হারাধন সাগ্রহে জানালো।

নীরা একটু হেসে বললো,

—রাণী নিপুনিকার স্বভাব কেমন তাই বলছি। নিউইয়র্কে ওর সঙ্গে আমার আলাপ—সেই থেকেই জানি—যদি ওকে চান তো শুনুন—পুরুষ যেমন চায় তার প্রিয়তমা সতী হোক অন্ততঃ একনিষ্ঠা হোক—রাণী নিপুনিকাও তেমনি চান যে তিনি যাকে নেবেন তাকে সৎ অর্থাৎ একনিষ্ঠ হতে হবে। আপনি উলু বা টুলুর দিকে নজর দেবেন—এ তিনি সইবেন না।

—হ্যাঁ, সেকথা তিনিই আমাকে প্রকারান্তরে জানালেন।

—তাই নাকি! তাহলে আর আমার বলার কি আছে। উনি এই জন্য এক সুযোগ্য পুরুষকে গ্রহণ করলেন না আমেরিকায়। তাকে পরিস্কার জানালেন বহু নারীর দিকে যার লক্ষ্য তাকে তিনি গ্রহণ করবেন না—এরপরই তিনি চলে এলেন।

—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ! ভাল, আপনার এ বিষয়ে মতামত কি?

—সেটা আপনার জানবার কি দরকার? আমি তো তৃতীয় পক্ষ।

—কে কোন পক্ষ তা জানা অত সহজ নয়। বলুন আপনার মতামত।

—না—আমার মতামত জানাবার সময় যদি হয় তো বলবো।

নীরা চলে গেল। হারাধনের প্রথম সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয়টা ধরালো। টানছে। ক্লাবের লেডী খানাঞ্চী এসে বললো,

—আপনার দু'মাসের চাঁদা বাকী আছে স্যার।

—ও হ্যাঁ—আচ্ছা—কাল দেব।

লেডী খানাঞ্চী চলে গেল। হারাধন ভাবতে লাগলো, উলুর হাতে সে অনেকগুলো টাকা দিয়েছিল। খামোকা। সে টাকা তো উলু ফিরিয়ে দেয় নি। চাইবে কি করে হারাধন? মেয়েজাত টাকা পেলে ছাড়ে না। উলু হয়তো দেবেই না আর টাকাগুলো। ঐতেই ক্লাবের চাঁদা দেওয়া চলতো। উলুর উপর রাগটা বাড়ছে হারাধনের। সুযোগ পায় তো তাকে একবার দেখে নেবে হারাধন।

নীরা চলে গেছে। হারাধন সিগারেট টানতে টানতে ভাবলো, নীরা সত্যি আশ্চর্য্য মেয়ে। সেই জানিয়ে দিল রাণীর অন্তর আবার সেও তো যা বলে গেল তাতে বোঝা যায় সেও চায় হারাধনকে। হারাধন এখন করবে কি?

—নাঃ! এই নারী-জাতিকে নিয়ে সত্যি বিব্রত হতে হয়। কার কি মতলব কে কোন ধাঁজে কথা বলে কি জানাতে চায় বোঝা খুবই মুস্কিল। তবে পুরুষ—পুরুষই। তার কাজ তাকে করে চলতেই হবে। অতএব ওসব সেন্টিমেণ্টেলিটির ছোঁয়াচ বাদ দাও। রাণীর আছে অগাধ টাকাকড়ি—রূপ যৌবনও কম নেই। সৌভাগ্যক্রমে হারাধন আজও অবিবাহিত—কপালে লেগে যায় তো যাক—রাণীর মন যুগিয়ে জীবনটা ভালই কাটাতে পারবে হারাধন। সে খুসীই হচ্ছে—আর ভাবছে নীরাও কিছু মন্দ মেয়ে নয় যদিও টাকার দিকটা তার শূন্য। কিন্তু অমন চাতুর্য্য কম মেয়ের মধ্যেই দেখা যায়—নীরাও ভাল। কিন্তু নীরার দিকে এগোলে রাণীকে ছোঁয়াই যাবে না। না, এখন ওসব না—রাণীকে বাগিয়ে ফ্যাকটরীটা আগে করে নিতে হবে। কারণ মামা অমরনাথ আর টাকা দেবেন না। উলু হারামজাদী এলোনা। এখন ঐ রাণীই ভরসা। দেখা যাক—বরাত কি করে।

হারাধন উঠলো—বেরুচ্ছে তার গাড়ীর দিকে।

—আমাকে পৌঁছে দেবেন ? নীরা বললো ওকে।

—হ্যাঁ—আসুন—হারাধন তৎক্ষণাৎ রাজি হোল।

—চলুন।

গাড়ীতে বসলো দু'জনে। নীরা চালাচ্ছে, চালাতে চালাতে নীরা বলল,—যদি এ্যাকসিডেণ্ট বাধাই ?

—বাধুক না, দুজনেই একসঙ্গে স্বর্গে যাওয়া যাবে।

—কিন্তু যদি আমিই যাই আপনি থেকে যান এই মর্ত্তে।

—সে বড় দুঃখের ব্যাপার হবে।

—দুঃখ কি ? রাণী নিপুনিকা তো থাকবেন।

কথাটার মধ্যে রহস্য ? রসিকতা ? নাকি অভিমান ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হারাধন কিঞ্চিৎ বিব্রতবোধ করলো। অভিমানই হবে। বললো—তুমি যদি এসো আমার জীবনে তো রাণী মেথরাণী হয়ে যাবে—নীরা ··

—বলেনকি—সত্যি ?

—হ্যাঁ—অবশ্য ওর আছে টাকা, তাছাড়া আর আছে কি তার ?

—আমার তো তা নেই।

—না থাক, টাকা আমি রোজগার করতে জানি। আসবে তুমি ?

—এসেছিলাম—ফিরে যাচ্ছি।

—কেন ?

—কারণ তুমি ফিরিয়ে দিলে—তোমার উলু চাই শাঁখ চাই সিঁদুর চাই আলতা চাই।

—না—না—না—ওসব কিছু চাইনে আমার। আমি চাই নীর—জল সুন্দর শীতল পানীয়—যা ক্ষীরের থেকে সরস—বা মধু থেকেও মধুর।

কষ্টে পড়েছে ইউনিট-সাহেব। কাজকর্ম্ম কোথাও জোটাতে পারেনি সে। কাজ অবশ্য পাওয়া কঠিন হোতনা, কিন্তু ইউনিট কলকাতায় এসেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল—এখন একটু সুস্থ হয়েছে, কিন্তু হাতে তার যেকটা টাকা ছিল তা ফুরিয়ে গেছে। এখানে ওর বন্ধু-বান্ধব খুব বেশী নেই। পরিচিতের সংখ্যাও কম। সুতরাং সে আবার আসামেই ফিরে যাবার মতলব করছে। কিন্তু যাওয়ার জন্য ভাড়া চাই। কি করে ভাড়া যোগাড় করবে ইউনিট ভাবতে ভাবতে পকেট তার একেবারে শূন্য হয়ে গেল দিন কয়েকের মধ্যে। কাল থেকে ইউনিটের খাওয়া হয় নি। ক্লান্ত পায়ে ইউনিট ঘুরছে ফুটপাতে। চেহারা তার এতো খারাপ হয়ে গেছে যে সহজে চেনা যায় না। ভিক্ষাই আজ করবে ইউনিট। —কোথায় কার কাছে ভিক্ষা চাইবে—তাই ভাবছে।

লাল রংএর বড় বাড়ী—বাগান—এদিকে মন্দির। উত্তর দিকে গলি-পথ—দক্ষিণে বড় রাস্তা। দক্ষিণ দিকের কোণায় দাঁড়িয়ে ইউনিট হঠাৎ দেখতে পেল একখানা বড় গাড়ী ঢুকছে ঐ বাড়ীটায়। গাড়ীতে বসে আছেন এক বৃদ্ধা আর পাশে কে—উলু নয় তো? হ্যাঁ—উলুই তো।

সন্ধ্যা এখনো হয় নি। ইউনিটের সতেজ চোখ ঠিকই দেখেছে! উলুই ঢুকলো বাড়ীতে। ইউনিট যেন হাতে স্বর্গ পেল। সেও আস্তে আস্তে ঢুকলো বাড়ীর বাগানে। গাড়ীটা দাঁড়িয়েছে। উলু নামালো বৃদ্ধাকে হাত ধরে—তারপর ঢুকলো গিয়ে মন্দিরে। ঠাকুরঘর—প্রকাণ্ড সিংহাসনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ রয়েছেন। উলু আর বৃদ্ধা সেইখানেই গেল—দেখছে ইউনিট কিন্তু উলুর কাছে এগুন যাবে কি করে? দারয়ান রয়েছে—ওকে তো ঢুকতে দেবে

না। ইউনিট অপেক্ষা করে রইল বাগানের একটা যায়গায়। ওর পাশেই বড় বাড়ী—লাগাও বললেও চলে—সেখানে কান্না শোন রয়েছে। কিন্তু ইউনিট উলুকে পেয়েছে—আর উলু যে এখন ধনা, তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। অতএব ইউনিট আর অপরের কাছে যাবে কেন? ঈশ্বর সদয়—উলুর কাছেই চাইবে কিছু টাকা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আরতি চললো। ইউনিট অপেক্ষা করছে। অবশেষে বেরুলো উলু—ইউনিট ত্বরিতে কাছে গিয়ে ডাকলো,

—উলু।

চমকে চাইল উলু—চিনতে কষ্ট হলেও চিনলো। আশ্চর্য্য সে! ইউনিট এখানে আসে কেন? কি এখন করবে উলু।

—উলু? তুই এখানে আছিস—খুব ভালকথা মা—আমার বড্ড অববস্থা-বিপাক চলছে। কেমন আছিস!

—ভালই—উলু আস্তে বললো।

তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছে। সে ভাবছে—ইউনিট যদি জানিয়ে দেয় তার পূর্ব্ব জীবনের কথা এখানে তাহলে কি যে হবে ভাবা যায়না। কারণ অসিতবাবু উলুকে তাঁর শালীর মেয়ে বলে পরিচিত করে এখানে তার বিয়ে দিয়েছেন। কি এখন করবে উলু। তাড়াতাড়ি আবার বললো,

—এখানে তুমি এসো না কাকা—যাও, চলে যাও।

—যাব-মা কিছু টাকার দরকার। তোর ভয় নেই। আমি কাউকে কিছু বলবো না—থাক—ভাল থাক। আমাকে কিছু টাকা দে—অন্ততঃ শ'খানেক দে!

—দেব—কিন্তু আঁচলে তো বাঁধা নেই। ঘণ্টা তিন পরে—এগারটা নাগাদ তুমি ঐ গলির মোড়ে মন্দিরের ছোট

জানালায় এসো—আমি ঐ ছোট্ট জানালা দিয়ে তোমাকে কিছু টাকা দেব, কিছু বেশীই দেব—আর কিন্তু এসোনা।

—আচ্ছা—

ইউনিট চলে এলো তৎক্ষণাৎ। বৃদ্ধা ডাকছেন,

—কোথায় গেলি ? ও উলু ? আয় শিগগির।

—এই যে ঠাক্‌মা—

—কে ঐ লোকটা!

—ও আমার বাবার কারখানায় চাকরী করতো। চাকরী গেছে তাই আমাকে বলতে এসেছিল—বাবাকে বলে ওকে আবার চাকরীটা দেওয়াই।

—তুই কি বললি ?

—বললাম—বাবাকে বলবো আমি।

বৃদ্ধা খুসী হলেন—আর কিছু শুধোলেন না। উলুর উপস্থিত-বুদ্ধি তাকে বাঁচালো। কিন্তু উলু ভাবতে লাগলো ইউনিট যখন জেনেছে যে সে এখানে আছে তখন কি যে হবে কে জানে। ইউনিটকে ভয় করে উলু। ইউনিট তার জীবনের নাড়ী-নক্ষত্র সবই জানে। যদি সে প্রকাশ করে দেয় তো অমরবাবু তাকে নিয়ে কি যে করবেন—ভাবতেও ভয় করে উলুর। অমরবাবু যতখানি ভদ্রলোক ততখানি কড়া লোক। তিনি যদি জানেন, উলুর মা ইউনিটকে আশ্রয় করে জীবন কাটিয়েছে তো অমরবাবু তাকে বাড়ীতে রাখবেন না। এবাড়ীতে ওরকম মেয়ের ঠাই হবেনা—অমরবাবু বা বৃদ্ধা কেউই তাকে গ্রহণ করবেন না। উলু কি করবে ?

ভয়ে ভয়ে ঘণ্টা তিন কাটালো উলু। রাত প্রায় এগারটা—একটা খবরের কাগজ জড়িয়ে পাঁচখানা একশ টাকার নোট মুড়ে উলু গিয়ে দাঁড়ালো সেই ছোট জানালার কাছে। হ্যাঁ—ইউনিট ঠিক

সময়ই এল। উলু দিল টাকা। বললো—আর যেন এসোনা—আর দিতে পারবো না—বুঝলে ?

—না মা—না—তবে যদি খেতে না পাই তো আসতেই হবে।

—না—আর দিতে পারবো না।

উলু চলে এলো।

গলিটা গঙ্গায় স্নানে যাবার পথ—অন্ধকার। এদিকে সন্ধ্যের পর বড় কেউ হাঁটে না। কিন্তু এটা বড় রাস্তায় এসে পড়েছে। সেই বড় রাস্তার আর গলির মোড়ে উলুদের এই মন্দির। গাড়ীতে ফিরছিল হারাধন সঙ্গে নীরা। দেখতে পেল, একজন লোক ঐ মন্দিরের ছোট জানালার কাছে দাঁড়িয়ে যেন কার অপেক্ষা করছে। জানালা খুললো—উলু এসে টাকার প্যাকেটটা দিল লোকটিকে। দেখলো হারাধন আর নীরা। কথা কিছু শুনতে না পেলেও চোখে তারা সবই দেখলো।

—ব্যাপার কি—হারাধন বললো।

—ব্যাপার সতী-সাবিত্রীর অভিনয় চলছে।

—হুঁ—অভিনয়টা আর চলতে দেওয়া হবে না। চল দেখি! ওর শেষ করবো তবে আমার নাম হারাধন।

—হারাধন কেন ? মিঃ এইচ ঘোষাল!

—হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক।—হারামজাদীকে এবার দেখে নিচ্ছি। পথের কুকুর পথে গিয়ে এঁটো পাত চাটবে—কালই দেখে নিও।

নীরার সঙ্গে আরো কিছু কথা হোল হয়তো। নীরাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরলো হারাধন গভীর রাত্রে। তখন সব শুয়েছে। উলু আছে জেগে। তার ঘরে একা জেগে আছে উলু। সে জেনেছে তার টাকা দেওয়া হারাধনের নজরে পড়েছে। হারাধন এমনিতেই প্রসন্ন নয় উলুর উপর। না জানি কি সে করবে। ভয়ে ভাবনায় রাতটা কাটালো উলু কিন্তু সকালেই ডাক এল শ্বশুরের কাছ থেকে।

উলু নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালো। বৃদ্ধা ঠাকুমাও রয়েছেন আর আছে হারাধন। অমরবাবু বললেন,

—কালরাত্রি এগারটার সময় তুমি মন্দিরে কি জন্য গিয়েছিলে ?

—আমাব বাবার অফিসের একজন দুস্থ লোক বড় কষ্ট পাচ্ছেন....

—তাকে আমার কাছে আনলে না কেন ?

—আমিই কিছু দিলাম তাকে।

—না—তোমার সঙ্গে তার অবৈধ সম্বন্ধ আছে, স্বীকার কর।

—বাবা!

উলু বসে পড়লো। অসিতবাবুকেও ডাকা হয়েছে ফোন করে। তিনি এসে পৌঁছলেন। কিছুই তিনি জানেন না। এসে দেখলেন উলু মেঝেতে বসে। তার চোখে জল আর সব গম্ভীর মুখে বসে। অমরবাবু বললেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে,

—বন্ধু হিসাবে আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। বলেছিলেন উলু আপনার শালীর মেয়ে—না, ও রাস্তার মেয়ে।

—থাম অমর, ব্যাপারটা আমাকে জানতে দাও।

—বাড়ী নিয়ে গিয়ে জানবেন। আমার বাড়ীতে কোন চরিত্রহীনার ঠাঁই হবে না। যান—এখুনি নিয়ে যান।

হারাধন বললো,

—আমি জানি আপনার কোন শালী ছিলনা। আপনি উত্তরপাড়ার ঘোষালদের একমাত্র কন্যা অরুন্ধতীকে বিয়ে করেন। শালী কোত্থেকে এলো আপনার ? জোচ্চুরি ব্যাপার।

অপমানটা হজম করে অসিতবাবু বললেন,

—ব্যাপারটা আমাকে ঠিক ভাবে জানতে কিছু সময় দাও অমর।

—সময় অনন্ত পড়ে আছে। নিয়ে যান, বাড়ী গিয়ে জানবেন এখানে ওর আর থাকা হবেনা।

—তুমি হারাধনের কথাটাই বিশ্বাস করলে ?

—আলবাৎ করবেন। আমার থেকে আপনি ওঁর বেশী আত্মীয় নাকি ?—হারাধন বললে।

—আমার তরফের কিছু বলবার আছে হারাধন।

—না নেই। আপনি প্রতারণা করেছেন আমাদের সঙ্গে। ও আপনার রক্ষিতার মেয়ে।

—একথা বলবার পূর্ব্বে আমার বয়সের সম্মানটা তোমার দেখা উচিৎ ছিল হারাধন।

—সম্মান! আপনার আবার সম্মান কি। আপনি প্রতারক। রাস্তার মেয়েকে এনে আপনি বাড়ীতে ঢুকিয়েছেন মিথ্যে কথা বলে! সম্মান চাইতে লজ্জা করে না আপনার ?

—উলু—অপমানিত অসিতবাবু শুধু ডাকলেন—উলু ?

—বাবা—উলুর কাতর কণ্ঠস্বর অতি আস্তে বেরুলো।

এই বানবিদ্ধা হরিণীর দিকে কেউ চাইলেন না। অমরবাবু বললেন—কথাকাটাকাটি আমি করতে চাইনে অসিতবাবু। আপনার মেয়ে যেই হোক আর যাই হোক এখানে সে আর থাকবে না। যদি চান তো খোরপোষ কিছু দেওয়া যাবে।

—থাক ধন্যবাদ—কিছু লাগবে না—আয় উলু, আয় মা আমার। বিশ্ব তোকে ফেলে দিলেও আমি ফেলবো না।

অসিতবাবু কোলেই তুলে নিলেন উলুকে। বললেন,

—শাঁখা আর নোয়া রেখে সব গহনা খুলে দে।

—বাবা—

—নীলু গেছে যাক্, তুই থাক। যতদিন আমি আছি তুই থাক। আমার সর্ব্বস্বের মালিক আমি তোকেই করে যাব—চলে আয়। যেখানে মানবত্ব এমন নিষ্ঠুর ভাবে লাঞ্ছিত হয় সেখানে তোকে দেওয়াই ভুল হয়েছিল। আচ্ছা—নমস্কার—

উলুকে নিয়ে অসিতবাবু বেরিয়ে গেলেন। কঠোর হয়ে বসে রইলেন অমরবাবু। বৃদ্ধা কাঁদছেন।

উলুকে নিয়ে বাড়ী এলেন অসিতবাবু। পথে কোন কথা হয় নি। উলু গাড়ীর এক কোণায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিতবৎ পড়েছিল—অসিতবাবু নিঃশব্দে বসেছিলেন। চালক বহুদিনের পুরোনো লোক। সে বুঝেছে ব্যাপার কিছু একটা গুরুতর ঘটেছে তাই যত দ্রুত সম্ভব গাড়ী নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিল। হাত ধরে নামালেন অসিতবাবু উলুকে।

উপরে গিয়েই উলু শুয়ে পড়লো একটা সোফায়। ওর দেহমন যেন আর ওর ভার বহন করতে পারছে না। সর্ব্বাঙ্গ ওর এলিয়ে পড়েছে। দেখলেন অসিতবাবু তাকিয়ে। বিষাক্ত শরবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় উলু কাঁপছে। কান্না ওর চোখে নেই—যা আছে তাকে কি বলা যায় কে জানে। হয়তো একেই সর্বহারা উদাস দৃষ্টি বলে! উলু বাঁচবে তো? অসিতবাবুর মনে অকস্মাৎ এই চিন্তাই ভেসে এল। উলুর মুখ যেন মৃত্যু পাণ্ডুর। কেন? কি এমন হয়েছে উলুর? অসিতবাবু বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে আবার বিয়ে দেবেন উলুর। না—না—না—উলু তা করবে না। উলু সতী—উলু সাবিত্রী।

—উলু!—ডাকলেন অসিতবাবু তাকে সস্নেহ সেই ডাক। উলু সাড়া দিল শুধু চোখ খুলে। কথা সে বলতে পারলো না। লক্ষ্মীকে ডাকবেন নাকি অসিতবাবু। কে এখন দেখবে উলুকে? কিন্তু ব্যাপারটা কি ঘটেছে অসিতবাবুই এখনো জানেন না। আগে তিনি সবটা জানবেন, তারপর যা হয় করবেন। লক্ষ্মীকে

এখন ডাকা ঠিক হবে না। যতই হোক লক্ষ্মী এখনো পর—সম্পর্ক কিছু নেই তার সঙ্গে অসিতবাবুর।

—আমাকে সবটা খুলে বল উলু—কি হয়েছে? কি ঘটেছে?

—বাবা! উলু যেন কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বললো—এই পৃথিবীতে আমার আর থাকা চলে না। জীবন ভোর আমি একা কষ্ট পেলাম না, যেখানে আমি গেলাম সেখানেই আমাকে ঘিরে দুর্ভাগ্য। বাবা আমাকে ছেড়ে দাও—আমি চলে যাই....

—কোথায় যাবি মা?

—এই পৃথিবী ছেড়ে যাব বাবা—উলু উঠে বসেছে, যেন এখুনি চলে যাবে।

—থাম থাম্—অসিতবাবু ওকে ধরে ফেললেন—আমাকে বল সব।

—বলবার কিছু নেই বাবা, এ শুধু ভাগ্যের খেলা—বিধাতার অভিশাপ।

—তবু বল শুনি।

—ইউনিট সাহেব কোত্থেকে কে জানে কাল সন্ধ্যায় এসে বললো 'কিছু টাকা দাও—আমি খুব দুঃখে পড়েছি।' আমি ভাবলাম এই উপদ্রবকে এখানে আসতে দেওয়া ঠিক হবে না কারণ যদি কেউ জানতে পারে ওরই আশ্রয়ে আমি প্রতিপালিত তাহলে আমার ঠাঁই তো হবেই না, তোমারও বদনাম হবে—তাই ওকে টাকা দেব বলেছিলাম তখন।

—তারপর?

—তারপর রাত প্রায় এগারটার সময় মন্দিরের ঐ ছোট জানালাটা খুলে টাকা আমি তাকে দিয়ে বলে দিয়েছি সে যেন আর না আসে। এই ঘটনাটা আমার দুষমন হারাধনের চোখে পড়েছে।

সে তখন নীরা নামে একটা মেয়েকে নিয়ে ক্লাব থেকে ফিরছিল—দেখতে পেল। আমি তখুনি জানি, কিছু ঘটবে।

—নীরা? কে সেই নীরা—বউবাজারে যার বাড়ী সেই? যে আমার নীলুকে জেলে দিয়েছে?

—আমি তো তা জানিনা বাবা, শুধু জানি ওর নাম নীরা। যুবশ্রী ক্লাবের সেক্রেটারী আর হারাধনবাবুর বান্ধবী।

—হ্যাঁ—ও আর বলতে হবে না। আচ্ছা মা ভয় কি, ভাবনা কি? তুই সব কথা জানিয়ে অমিয়কে চিঠি লেখ।

—না বাবা না—ইচ্ছা থাকলেও তিনি আমাকে আর গ্রহণ করতে পারবেন না। হয়তো ইচ্ছেও তাঁর থাকবে না। বদনাম বড় সাংঘাতিক জিনিষ বাবা। মহাসতী সীতা তাঁর বদনাম ঘোচাতে পারেন নি। মেয়ের চরিত্রে বদনাম লাগলে তা আর ছাড়ানো যায় না। দুনিয়ায় আর আমার ঠাঁই নেই বাবা। আমাকে ছেড়ে দাও।

—না—তোর ঠাঁই আছে আমার বুকে। তোকে দুনিয়া ছাড়লেও আমি ছাড়বো না—আয় খাবি আয়।

—বাবা—এ জীবন আর রাখতে চাইনে আমি!

—উলু—নীলুর সঙ্গে আমার সবই গেছিল। তারপর তোকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি পথে। তোকে অবলম্বন করে কোন রকমে আমি টিকে আছি এই সংসারে। তুই গেলে কি আর আমার থাকবে উলু?

অসিতবাবুর চোখের কোণায় জল চকচক করছে। নিঃশব্দে চাইলেন তিনি উলুর পানে। উলু দেখলো।

—আমার মত অভাগী তো তোমার দুঃখেরই হেতু হবে বাবা!

—তবু বাবা তার সন্তান ছাড়তে চায় না, ছাড়বে না।

—আমাকে নিয়ে কি তুমি করবে? এ জীবনটাকে তো আর সাধারণ সংসারীর পর্য্যায়ে আনা যাবে না বাবা!

—সন্ন্যাসীর পর্য্যায়ে আনা যাবে। চল, কিছুদিন দুজনে তীর্থ ভ্রমণ করে আসি। ঈশ্বরে আত্মসর্পণ কর মা উলু—এই দুর্দ্দিনে তিনিই আশ্রয়।

—আমার কিছু তোমাকে বলবার নেই বাবা, জানিনা আমার কোন জন্মের বাবা তুমি, কত জন্মের বাবা—শুধু জেনেছি, তোমার আশ্রয়ে আমি ঈশ্বরের আশ্রয় পেয়েছি। বেশ, বাবা তাই কর।

—হ্যাঁ—আয় খেয়ে ঘুমো খানিক—আমি ম্যানেজারকে বলে সব দেখাশোনার ভার দিয়ে তোকে নিয়ে ভারত ভ্রমণে বেরুবো—তীর্থ দর্শন, দেবদর্শন—সাধুদর্শন করে কাটিয়ে দেব জীবনটা—

—আমার জীবনটার এখনো অনেক বাকী বাবা!

—হ্যাঁ—তুই থাকবি—তুই থাকবি আমার সর্ব্বস্বের মালিক হয়ে!

—কি আমি কববো বাবা অত ধনসম্পত্তি নিয়ে?

—দান করবি—দেবসেবা করবি—তোর যা ইচ্ছে করবি।

উলু আর কিছু বললো না। খেতে বসালেন অসিতবাবু তাকে। কিন্তু এ অবস্থায় খাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। খেতে বসে উলু আবার বললো,

—তুমি ছাড়া দুনিয়ায় আমার ঠাঁই হোল না বাবা।

—আমার বিশ্বাস অমিয় নিশ্চয় তোকে নিয়ে যাবে।

—হয়তো সেটা সম্ভব হোত—যদি ঐ হারাধন না থাকতো। সে হয়তো আমার নামে অপবাদ দিয়ে এর মধ্যেই তাঁর মনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। সে আর সম্ভব নয় বাবা।

—তুই চিঠি তাহলে লিখবি না তাকে?

—না—উলু বললো—অপমান আমি অনেক সয়েছি বাবা আর না—তিনি যদি এই অপবাদ অবিশ্বাস করেন—নিজে আসেন আমাকে নিতে তবেই আমি যাব—নইলে এ-জীবনে আর নয়।

—কাজটা কি ঠিক হবে না ?

—হ্যাঁ—যদি সত্যি আমার উপর তাঁর বিশ্বাস থাকে—যেমন তোমার মধ্যে আছে—তাঁর বাবার মধ্যে নেই—তাহলে তিনি নিজেই আসবেন। নইলে বাবা, অনর্থক ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নাকাটি করে চিঠি লিখে তাঁর করুণা আদায়ের জন্য আমি আমার আত্মসম্মান খোয়াব না—কারণ আছে।

—কি কারণ মা ?

—কিছুদিন আগে ঐ হারাধন আমাকে তাদের ক্লাবে নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি করতে চেয়েছিল—দু'একটা কথাও বলেছিল—যার অর্থ যে-কোন মেয়ে বুঝতে পারে। আমি ক্লাবে গেলাম না—ঠাকুরমার শরণ নিলাম ; হারাধন তার আশায় বঞ্চিত হয়ে আমাকে যে-কোনরকমে জব্দ করতে চেয়েছে। এই ঘটনাটি আমি সংক্ষেপে বিলাতে লিখে জানিয়েছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে ধমক দিয়ে লিখেছেন—তাঁর মামাতো ভাই হারাধন অতিশয় সৎ ব্যক্তি—আমার ভালর জন্যই তিনি আমাকে ক্লাবে নিয়ে যেতে চান। তাঁর উপর আমাব অভিযোগ আমার অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনোবৃত্তির পরিচায়ক—আমার শিক্ষা-সহবতের অভাব—আমার অযোগ্যতা ইত্যাদি। তারপর আবার লিখেছেন, অকারণ মানুষের উপর অবিশ্বাস যেন আমি কখনো না করি—কারণ এটা বর্ত্তমান যুগজীবনের পরিপন্থী।

—ও—তাহলে হারাধনকেই ওরা বিশ্বাস করে আর সবকে করে অবিশ্বাস।

—হ্যাঁ বাবা—এখন আমার আর কিছু লিখবার নেই। যা-কিছু লিখবার ওরাই লিখুক—শ্বশুরমশাই আর স্বামীমশাই—সেসব জেনেও যদি স্বামী আমার কাছে কিছু জানতে চানতো তখন আমি বলবো—নইলে আমার অপমান -শুধু নয় বাবা—তোমার সম্মানও

কিছু রাখবে না। তোমাকে কি রকম নিদারুণ অপমান করলো হারাধন। শ্বশুর মশাই নিঃশব্দে বসে রইলেন—এতটুকু প্রতিবাদ করলেন না। ওঁর বনেদী বংশ যতই বড় হোক বাবা—মনুষ্যত্ব ওখানে লাঞ্ছিত—

—হ্যাঁ—মা—ঠিক।

—মানুষের উপর মানুষের দরদ যেখানে নেই—শুধু আছে বংশের অহঙ্কার—অর্থের আভিজাত্যবোধ আর মেকী সতী-মহিমার চটক—সেখানে আমার মত মেয়ের না-যাওয়াই ভাল। দুঃখ এই যে এই লাঞ্ছনা আমার সঙ্গে তোমাকেও সাইতে হোল।

—বাবা!

—বল—।

—কোথায় যাব? কোথও গিয়ে আমার ঠাঁই হবেনা। আমাকে ছেড়ে দাও বাবা—জন্মটা আমি বদলে আসি। আসছে জন্মে যেন ভাল ভাগ্য নিয়ে তোমার মেয়ে হয়ে জন্মাই—

উলুর চোখের জলটা গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে। অসিতবাবু অত্যন্ত চিন্তিতঃ হয়ে উঠলেন উলুর জন্য। উলুর মনে আত্মহত্যার আকাঙ্খা জেগেছে—এটা খুবই খারাপ ব্যাপার—বিশেষতঃ মেয়েদের জীবনে। শেষ পর্য্যন্ত তারা আত্মহত্যাই করে বসে। জানেন অসিতবাবু—এরকম ঘটনা বহু শুনেছেন।

উলুর মলিন ক্লান্ত রিক্ত মুখখানা গভীর বেদনা জাগিয়ে তুললো তাঁর অন্তরে। বেশী দেরী তিনি করবেন না। মাত্র দুটোদিন পরেই তিনি উলুকে নিয়ে দেশ ভ্রমণে যাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু খবর পেলেন—উলুর দিদিশাশুড়ী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। খবরটা অমরবাবু বা হরিধন দেয়নি—দিয়েছেন খবরের কাগজওয়ালারা। তাঁরা লিখেছেন,

"বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী ও বনিয়াদী পরিবারের মহিয়সী

মহিলা ইন্দ্রাণী দেবী অকস্মাৎ দেহরক্ষা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স একাশী হইয়াছিল জীবনভোর বহু দান এবং সৎকার্য্য তিনি করিয়াছিলেন। একমাত্র পুত্র শ্রীঅমরনাথ, নাতি অমিয় ও নাত্‌নী অঞ্জনাকে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।"

'আশ্চর্য্য। উলুব নামত' নাই! উলুকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে তাহলে। তবু অশৌচান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলেন অসিতবাবু। না—ওঁ'রা ডকলেন না উলুকে।

সেদিন উলু চলে যাবার পর অমরবাবু কাঠ হয়ে বসে আছেন। বৃদ্ধা মাব চোখে জল গড়াচ্ছে দেখেও দেখছেন না তিনি। দেখবার মত মন নিয়ে তিনি জন্মান নি। চিরদিনের অভিজাত ধনী এই ব্যক্তিটি নিজকে সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের থেকে বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলে মনে করেন। তাঁর করুণার আশ্রয়ে যারা এসেছে যেমন হারাধন, তাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তারা পরম আত্মীয় কারণ তারা কৃতজ্ঞ। এমন কি নিজের পুত্র কন্যার কাছেও তিনি কৃতজ্ঞতা দাবী করেন কারণ তারাও তাঁর আশ্রিত। এই ব্যক্তিটির জীবনে পত্নী-বিয়োগ ছাড়া আর কোন দুঃখ আসেনি। দুঃখ কি বস্তু তা তিনি জানেন না—জানেন না জীবন কি দিয়ে গড়া—কি রস তাকে মধুর করে, কি রস তাকে তিক্ত করে বিস্বাদ করে। নিজেকে তিনি এতই বড় মনে করেন যে পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়! অমরবাবু এই প্রকৃতির লোক।

উলুর গহনাগুলো পড়ে আছে টিপয়ে। ঝকঝক করছে হীরে বসান নেকলেশটা কানের দুল দুটোতেও হীরে। চুড়িগুলো—রুলী আংটি সবই খুলে দিয়ে গেছে উলু। শুধু সাড়ী ব্লাউজ পেটিকোট

পরে গেছে। জুতো? হ্যাঁ, জুতোও নিয়ে যায় নি. খালি পায়ে চলে গেল—দেখছিলেন বৃদ্ধা।

হারাধন চীৎকার করে বলে চলেছে অনর্গল কথাগুলো—উনি যে কতবড় শয়তান মামা—তা ঐ থেকেই বুঝবেন শালী দূরে থাক ওর স্ত্রীর কেউ কোথাও নেই। উত্তরপাড়ার ঐ ঘোষালদের সব সম্পত্তির মালিক ওর ছেলে নীলু—জানেন, মামা, নীলু কেন চলে গেল। বাবার চরিত্রহীনতার জন্যই লোকের কাছে মুখ দেখাবার জো ছিল না তার....

—থাম্ হারাধন—বৃদ্ধা যেন হুংকার ছাড়লেন।

—থামবো কি দিদিমা—পাঁচশো বছরের পুরোনো এই পরিবারে উনি একটা বেশ্যার মেয়েকে বৌ করে ঢুকিয়েছেন। জান দিদিমা তোমার ঠাকুরের অভিষেক কর—পঞ্চগব্য না কি বলে তাই করাও। আমি পুরোত ঠাকুরকে ডেকে পাঠাই। ঠাকুরকে শুদ্ধ কর—বুঝলে! জাত জন্ম ধর্ম্মকর্ম তোমার সব পণ্ড করে দিয়ে গেল ঐ উলু না শুলু কি যেন নাম। সব ব্যবস্থা আমি আজই করে দিচ্ছি।

—চুপ কর, যা করবার আমি করবো।

—কাঁদছো কেন তুমি? কাঁদবার কি হয়েছে? মামা যা করেছেন ঠিকই করেছেন। ওকে এবাড়ীতে রাখা মানেই বাড়ীর অপমান। ও যাক—খোরপোষ দেওয়া যাবে অথবা ডাইভোর্স করিয়ে সব ব্যবস্থা আমি শিগ্রি পাকা করে দিচ্ছি।

—অমর।—

বৃদ্ধা ডাকলেন ছেলেকে। অমরবাবু তখনও কাঠ হয়েই আছেন। নিজের কাজের সমালোচনা নিজে তিনি কদাচিৎ করে থাকেন। তাঁর ধারণা যা তিনি করেন ঠিকই করেন। বললেন,

—কি?

—ওকে আর আনবিনে?

—না—এবাড়ীতে ও আর ঢুকবে না। কোনো চরিত্রহীনা মেয়ের যায়গা নেই আমার বাড়ীতে। ও গেছে যাক—

—শোন অমর, চরিত্র একটা খেলনা নয়—বাজারে তাকে ইচ্ছে মত কিনে আনা যায় না—কাল আমি দেখেছি একটা লোকের সঙ্গে ওকে কথা বলতে কিন্তু সে কে, সত্যি ওর বাবার কারখানার লোক কি না তা ভাল করে তোর জানা উচিৎ ছিল।

—জানা হয়ে গেছে। দুপুর রাত্রে খিড়কীর পথে যে মেয়ে কোন পুরুষকে টাকা দেয় সে যে কেমন মেয়ে তা জানতে আর অঙ্ক কষতে হবে না দিদিমা—ওকে তুমি এখনো কি করে সহ্য করতে চাইছ আমি ভেবে পাচ্ছি নে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ।—

—তুই থাম দেখি হারাধন—যা এখান থেকে।

—গেলে চলবে কেন? আমি আছি তাই ব্যাপারটা ধরা পড়লো। আমিই এনকোয়ারী করে জেনেছি অসিতবাবুর শালী ছিল না। ঐ মেয়েটি অসিতবাবুর নিজের কেউ নয়। ও হঠাৎ একদিন আসে অসিতবাবুর সঙ্গে। খুব সম্ভব দিল্লী থেকে এসেছে। ওকে বরদাস্ত করা আর নিজের ধর্মকর্ম বরখাস্ত করা একই কথা।

তড়বড় করে বলে চলেছে হারাধন। গহনাগুলো গোছাচ্ছে সে একটা কাগজের বাক্সে—কথাও বলছে। অমরবাবু হঠাৎ বললেন,

—মা, তুমি কি বিশ্বাস কর যে ও ভাল?

—ওর মধ্যে খারাপ আমি কিছু দেখিনি।

—তোমার বুড়ো চোখকে ফাঁকি দেবার মত যথেষ্ট শয়তানি বুদ্ধি তার আছে।

কথাটা বললো হারাধন। বৃদ্ধা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন,

—তোর ফোড়ন দেওয়া বন্ধ করবি কি না বলতো হারাধন ?

—ফোড়ন নয় দিদিমা- এ একেবারে খাঁটি গব্য ঘৃত দিয়ে সাঁতলানো। হারাধনের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ কাজ নয়। ওর নাড়ী নক্ষত্র সবই জানা হয়ে গেছে। মেয়েটি তোমাকে ডুবিয়ে গেল। তোমার এতকালের পূজা আচ্চা তোমার নিষ্ঠা এত বার উপোস সবই গেল—গোবর খাও প্রায়শ্চিত্ত কর—

—হারাধন !—আমি যাচ্ছি অমর—

উত্তেজিতা বৃদ্ধা হঠাৎ উঠে পড়লেন াকন্তু সামলাতে পারলেন না নিজেকে। পড়ে গেলেন মাথা ঘুরে—অজ্ঞান হযে গেলেন।

—ওরে কে আছিস ? জল—জল আন····

জল এলো—ডাক্তার এলেন—নার্স এলেন এবং এ অবস্থায় ধনীর বাড়ীর যা কিছু আসবাব সবই এসে গেল। বৃদ্ধাকে তুলে তাঁর নিজস্ব পালঙ্কে শোয়ানো হযেছে, যে পালঙ্কে তিনি ফুলশয্যার রাত্রি যাপন করেছেন—যে পালঙ্কের অঙ্গে তাঁর একাশী বছরের স্মৃতি ক্ষোদিত আছে।

না—বৃদ্ধার জ্ঞান আর ফিরলো না—গভীর রাত্রিতে প্রায় দুটোর সময়—বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী এবং অভিজাত পরিবারের সাধর্ম্মনিষ্ঠা সাধ্বী সতী—গৃহকর্ত্রী—অমরবাবুর সর্বজন-শ্রদ্ধেয়া জননী চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করলেন। এর অল্পকাল আগে পর্য্যন্ত তিনি চক্ষু চেয়েছিলেন—কাকে যেন খুঁজছিলেন—বাক্য তাঁর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল—কোন কথাই আর বলতে পারেন নি। কি যেন খুঁজেছেন। মৃত্যুর আগে বলেছিলো—উ ·····লু—লু—লু।

ব্যাস—সব শেষ হয়ে গেল। বয়স তাঁর একাশী—সুতরাং দুঃখ-শোকের কিছু নাই—যথেষ্ট পরিণত বয়সে তিনি দেহ

রেখেছেন। কাঁদবার মত কিছু নয় তবু অঞ্জনা এসে বেশ কিছুক্ষণ কাঁদলো। বাবাকে বললো,

—বৌদিকে আনবেন না বাবা?

—না - বৌদি নেই তোর—বৌদি আসবে নতুন।

অঞ্জনা ভয়ে আর কিছু বললো না। খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠান হোল, রেডিওতে সংবাদ দেওয়া হোল—এবং ফোন এবং লোক মারফৎ সকল আত্মীয়কে জানানো হোল-- বৃদ্ধা লোকান্তরিতা। শুধু জানানো হোলনা তাকেই যার নাম বৃদ্ধার মুখের শেষ কথা। যাকে দেখবার জন্য তাঁর পিপাসিত দৃষ্টি অনুক্ষণ খুঁজেছে।

কিন্তু এত সব কথা অমরবাবু ভাবছেন না। তিনি ভাবছেন উলু নামক ঐ অকল্যাণটার জন্যই তাঁর মার এই অবস্থা। ঐ হারামজাদী এর কারণ—উলু মূর্তিমতী অকল্যাণ। ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে তিনি ঠিকই করেছেন। ওকে ঢোকাবেন না। খবরও দেবেন না—এমন কি খবরের কাগজের রিপোর্টেও না। নিজেই তিনি কগজে কি লেখা হবে বলে দিলেন।

অঞ্জনা দাঁড়িয়েছিল। ইচ্ছে ছিল, বাবাকে বলবে, উলুর নামটাও দেওয়া হোক, কিন্তু না—বাবার মুখের ভাব দেখে সে আর সাহস করলোনা কিছু বলতে। চন্দন কাঠের চিতায় তুলে বৃদ্ধার নশ্বর দেহ অগ্নিস্যাৎ করা হোল মহা সমারোহে। সাড়ম্বরে ঘরে ফিরলেন অমরবাবু গঙ্গার ঘাট থেকে, সঙ্গে হারাধন আছে। সব কাগজে খবরটা বেরুলো কিনা জানতে হবে। সকালে রেডিও খুলে শোনা হয়েছে, হ্যাঁ খবর দিয়েছেন ওঁরা।

ধনী অমরবাবুর মা বলে নয়—এই বৃদ্ধা ছিলেন জনৈক বিখ্যাত দেশনেতার একমাত্র ভগ্নি এবং যৌবনে তিনি দেশাত্মবোধক কাজও কিছু করেছেন পার্টির সঙ্গে। শ্বশুরবাড়ীতে অবশ্য কিছু করবার সুযোগ তাঁর ছিলনা কারণ শ্বশুর এবং স্বামী সাহেবভক্ত

ব্যক্তি। শ্বশুর ছিলেন'রায় বাহাদুর'—অতএব স্বদেশীকরা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধা দান সেবা এবং ধর্ম্মার্থে অনেক কিছু করেছেন। অর্থবান স্বামীর অর্থ তিনি সৎকাজেই ব্যয় করেছেন যথেষ্ট। তাই সরকারী বেতারে এবং সকল সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুর খবর বেরুল।

শ্রাদ্ধাদি যথা নিয়মে হবে। অমিয়কে খবরটা দেওয়া হবে কি না। ভাবছেন অমরবাবু। অমিয়র পড়ার ক্ষতি হবে—কারণ ঠাকুমা তার জীবনের বিশেষ স্থানে আছেন। বলতে গেলে তিনিই মা-ঠাকুমা একসঙ্গে। তবু খবরটা দিতে হোল—কারণ অশৌচ পালন দরকার। লিখলেন—

কল্যাণীয় অমিয়,

গতরাত্রে তোমার ঠাকুমা সজ্ঞানে স্বধামে গমন করেছেন। অকস্মাৎ তাঁর এই পরলোকগমন খুবই মর্ম্মান্তিক—এর কারণ আরো মর্ম্মান্তিক—কিন্তু উপায় কিছু নেই—যা হবার হয়েছে। এর জন্য শোকগ্রস্থ হয়ে নিজের পড়ার ক্ষতি করো না। আগামী তেরই ক্ষৌর এবং চৌদ্দই শ্রাদ্ধ—তোমার আসার কোন দরকার নেই। ওখানেই স্নান করবে। আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি—

শুভাকাঙ্খী অমরনাথ।

আশ্চর্য্য যে উলুর বিষয়ে কোন খবরই তিনি দিলেন না অমিয়কে। কেন দিলেন না তিনিই জানেন। কেউ এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে সাহস পেল না। অঞ্জনাই হয়তো পারতো জিজ্ঞাসা করতে—করলো না—নিজেই দাদাকে পত্র লিখে সব কথা জানিয়ে দিল। অবশ্য যতটা সে জানে ততটুকুই জানালো।

পত্রটা দিল অঞ্জনা শ্রাদ্ধ শেষ হলে। এর মধ্যে হারাধন বেশ ভাল করে বেষ্টন করেছে অমরবাবুকে যাকে বলে নাগপাশ। অঞ্জনা শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে। বাড়ীতে কোন মেয়ে নেই। অমরবাবু প্রস্তাব করলেন,

-তোর বিয়ে দিয়ে বৌ আনি হারাধন—মেয়ে একটা চাই-ই ঘরে।

-আমার সব ঠিক আছে মামা, অনুমতি করেন তো তাকে এনে আপনার চরণদাসী করতে পারি—

—বলিস কি। বিয়ে করেছিস ?

—ছিঃ মামা—আপনার অনুমতি ছাড়া আমার বিয়ে হবে কি করে ? বরকর্ত্তা তো আপনিই। বিয়ে করিনি, নির্ব্বাচন করে রেখেছি।

—কে ? কেমন ? কোথায় বাড়ী ?

—বাড়ী এই কলকাতায়। নিজেদের বাড়ী বউ বাজারে। ওর বাবা ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী—শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য। অকালে তিনি দেহরক্ষা করেন। মেয়ের মধ্যে রেখে যান তাঁর শিল্প-প্রতিভা।

একটু থেমে বলল,

—খুব বনেদি বংশ মামা—বউবাজারে ওদের তিন চার পুরুষের বাস। পূর্ব্বে বাসস্থান ছিল ভট্টপল্লী, বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান জানেন তো ?

—খুব ভাল কথা—আন তাকে। আজই আন।

—যে আজ্ঞে।

হারাধন বিকালেই নিয়ে এল নীরাকে। দেখলেন অমরবাবু। উলুর খুলে-দেওয়া গহনা থেকে মূল্যবান নেকলেশটা নিয়ে তিনি পরিয়ে দিলেন নীরার গলায়।

অঞ্জনা দেখছিল। দেখতে পারলো না, পালিয়ে গেল চোখের জল সামলাতে।

—তোকে এই সামনের মাসে আনবো মা—বললেন অমরবাবু নীরাকে।

চোখে চোখে রেখেছেন অসিতবাবু উলুকে এই ক'দিন। তাঁর একান্ত আশা ছিল বৃদ্ধা মার শ্রাদ্ধবাসবে অমরবাবু নিশ্চয় উলুকে আহ্বান করবেন কারণ হিন্দু প্রথা অনুযায়ী সেটার অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই তীর্থযাত্রার সব ব্যবস্থা করেও তিনি যান নি—যদি অমরবাবু ডাকেন তো উলুকে আবার তার স্বস্থানে পাঠাতে পারবেন এই আশা ছিল। কিন্তু না, অমরবাবু কোন সংবাদ দিলেন না। অবশেষে ক্ষৌরীর পূর্ব্বদিন অসিতবাবু নিজেই ফোন করে ডাকলেন অঞ্জনাকে। বললেন,

—শোন মা অঞ্জনা—আশা করি তুমি সবই জেনেছ?

—হ্যাঁ, সব না হোক কিছু কিছু জেনেছি।

—আগামী কাল ক্ষৌরীর সময় এবং পরশু শ্রাদ্ধ বাসরে উলুর তো থাকা দরকার, তোমার বাবার কি মত মা?

—না, আমি তাঁকে বলেছিলাম, তিনি বৌদিকে আনবেন না।

—ও—তাহলে এসব কথা হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ—বাবা বললেন তিনি আর বৌদির মুখ দেখবেন না।

—ও—আচ্ছা মা—ফোন ছেড়ে দিলেন অসিতবাবু।

—শুনুন—অঞ্জনা যেন ব্যাকুল হয়ে ডাক দিল—শুনুন—শুনুন!

অসিতবাবু ছেড়ে দিয়েছেন ফোন। অঞ্জনা ধরতে পারলো না। অঞ্জনা নিজেই ডায়েল ঘুরিয়ে ডাকলো অসিতবাবুকে। এনগেজড্—পেলনা অঞ্জনা তাঁকে। কারণ অসিতবাবু অঞ্জনাকে ছেড়ে দিয়েই অন্যত্র ফোন করতে আরম্ভ করেছেন। বাড়ীর ব্যবস্থা সব ঠিক করে তিনি উলুকে নিয়ে তীর্থে বেরুবেন। যে আশা তিনি করেছিলেন অঞ্জনার কথা শোনার পর তাঁর সে আশা আর রইল না।

উলুকে এত ক'দিন তিনি যে ভাবে আটকে রেখেছেন তা বলার নয়। টলু কারো সঙ্গে কথা বলে না। উদাস দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। শুধু অসিতবাবুই তার কাছে যেতে পারেন অপর কেউ গেলে উলু অত্যন্ত বিরক্ত হয়—কথা তো বলেই না চলে যায় সেখান থেকে ডাক্তার দেখে বললেন—এ এক ধরণের "ম্যালেঙ্কোলিয়া" ("Melancholy."—এর ওষুধ ঠিক কিছু নেই মনের পরিবর্ত্তন এবং আনন্দের জীবন দেশভ্রমণ ইত্যাদিতে সেরে যাবেন। অবশ্য দেখবেন রোগ যেন বাড়তে না পায়।

কথাটা শুনে অবধি অসিতবাবু অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েই আছেন। কি ভাবে তিনি উলুকে একটু আনন্দের মধ্যে রাখতে পারেন তাই শুধু ভাবছেন। আপাততঃ দেশ ভ্রমণ ছাড়া আর কিছু তাঁর হাতে আছে বলে তিনি মনে করেন না। তাই যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর কারবার এবং বিষয়ের ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন।

একখানা উইল করলেন অসিতবাবু, তাঁর যথাসর্ব্বস্বই তাঁর একমাত্র পুত্র নীলুর জন্য রইল—কিন্তু সে যদি না ফেরে তো সব কিছুর মালিক হবে তাঁর পালিতা কন্যা উলু। নীলুর ফেরার জন্য উলু বারো বছর অপেক্ষা করবে। এই সময়টা উলু তার সম্পত্তি থেকে প্রতি মাসে হাজার টাকা হিসাবে খোরপোষ পাবে। নীলু যদি ফেরে তো সেই সব পাবে কিন্তু উলুর এই হাজার টাকা মাসোহারা তাকে বরাবর দিয়ে যেতে হবে—নীলু না ফিরলে সবই উলুর হবে।

উইল করে তিনি সেটা রাখার ব্যবস্থা করলেন ব্যাঙ্কে। অস্থাবর সম্পত্তির যা কিছু করবার করলেন এবং নিজের বহু পুরাতন কর্ম্মচারী জগদীশবাবুকে বললেন—তাঁর অবর্ত্তমানে জগদীশবাবু যেন উলুর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্য নীলু যদি ফেরে

তো সেই সবকিছু করবে। ভগবান না করেন—যদি নীলু না ফেরে এবং উলু না বাঁচে তাহলে তাঁর সব সম্পত্তি জনসেবায় দেবার জন্য সরকারই গ্রহণ করবেন। কোন ব্যক্তিবিশেষ এর কিছুই পাবে না।

সেদিন সকালে সংবাদপত্রে পড়লেন—অমরবাবুর স্বর্গতা মাতার শ্রাদ্ধকার্য্য মহাসমারোহে সমাপ্ত হয়ে গেছে। শ্রাদ্ধবাসরে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নামও রয়েছে। বৃদ্ধা এই পৃথিবীতে কাকে কাকে রেখেছেন তাও আবার বলা হয়েছে, পুত্র অমর, নাতি অমিয় এবং নাতনী অঞ্জনার নামই রয়েছে, উলুর কোন উল্লেখ নেই। অর্থাৎ উলুকে একেবারে ছেটে ফেলা হয়েছে —উলু যে কেউ কোন দিন ছিল ঐ পরিবারে তা যেন মুছে ফেলবার জন্যই এই প্রচেষ্টা অমরবাবুর।

যাক্—কাগজগুলো তিনি রেখে দিলেন একপাশে। অমিয় নিশ্চয় আসে নি বিলাত থেকে—কে জানে সে এই খবরটা জানে কি না—জানানো উচিত ছিল তাঁর। কিন্তু উলু যে রকম অসুস্থ—আবার অন্য কিছু অঘটন যদি ঘটে যায়, যদি অমিয়ও বাবার মতে মত দেয় তাহলে উলুর অবস্থা আরো শঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়তে পারে—তাই খবর তিনি দিলেন না।

বিকালে লনএ বসে চা খাচ্ছেন অসিতবাবু। একাই আছেন—বেরুতে হবে কয়েকটা দরকারী জিনিষ কিনতে যা পথে তাঁদের লাগতে পারে। ভাবছেন কি কি চাই। একখানা গাড়ি এসে ঢুকলো। নামলো অঞ্জনা আর তার স্বামী অর্থাৎ লক্ষ্মীর দাদা—অসিতবাবু সাদর আহ্বান করলেন।

—এসো মা—এসো বাবা—এঁসো।

—বৌদি কোথায়?—অঞ্জনা প্রশ্ন করলো।

—আছে—উপরে তার ঘরে আছে। সে বেরয় না মা—তার বাঁচার আশা কম। যাও—দেখগে।

অঞ্জনা বললো—

—আমি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছি, বাবা জানেন না। উপরে যাই?

—যাও মা—

অঞ্জনা আর কোন কথা বললো না। ওর হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ফুল—উলুকে দেবার জন্য এনেছে। উপরে গিয়ে দেখলো উলু বারন্দার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। আপনমনে বলছে,

—ওরা কেমন উড়ে যাচ্ছে! ওরা জোড়া—ওরা দম্পতি—ওরা, ওরা স্বামী-স্ত্রী।

—বৌদি—অঞ্জনা ডাক দিল। উলু তাকালো শুকনো মুখে। বললো,

—অঞ্জু! আয়—কেমন আছিস?

—ভাল—কিন্তু তোমার এ কি অবস্থা বৌদি!

—কেন? ভালইতো আছি!—চলে গেল উলু।

চোখে ওর জল গড়াচ্ছে। অঞ্জনা দেখলো, অমন আশ্চর্য সুন্দর রং উলুর কালি মেরে গেছে। চোখের দৃষ্টি উদাস—যেন কোন্ সুদূরে প্রসারিত। অঞ্জনা দেখলো, উলুকে পাহারা দেবার জন্য একজন মধ্যবয়সী আয়া রয়েছে। তাকে শুধোলো,

—এমনিই থাকে সব সময়?

—হ্যাঁ—কথা প্রায় বলেন না। যদি কিছু বলেন—বাবুর সঙ্গে। অন্য লোক দেখলেই সরে চলে যান। কথা বলতে চান না।

উলু ওঘরে গেছে। অঞ্জনা গিয়ে ধরলো তাকে। সস্নেহে বললো,

—আমায় সব কথা বলো বৌদি, বলো সব। কি হয়েছিল? কি তুমি করেছিলে?

—করেছিলাম—উলু হাসলো। হাসিটা দেখে ভয় করছে অঞ্জনার।

—কি করেছিলে ?—কার কি ক্ষতি করলে তুমি ?

—অনেকের ! —যেখানে গেছি ক্ষতিই করেছি। আমি অপয়া, যা অঞ্জু—পালিয়ে যা। আমার ছোঁয়াচ লাগাসনে—যা—

উলুই চলে গেল। কোথায় গেল কে জানে। আয়াটাও ছুটে চললো তার পিছনে। অঞ্জনাও ছুটছে। উলু সটান চলেছে অসিতবাবুর কাছে বাগানে। অসিতবাবু দেখলেন। বললেন, —আয়—চা খাবি ?

—না—ওরা সব আমাকে জ্বালাতন করছে বাবা—মানা করে দাও।

—না না, কেউ তোকে জ্বালাতন করবে না। বোস আমার কাছে।

উলু নিতান্ত বাচ্চা মেয়ের মত অসিতবাবুর কোল ঘেঁসে বসে পড়লো ! অঞ্জনা দেখলো, বুঝলো—উলু প্রকৃতিস্থ নেই। বললো,

—এর জন্য দায়ী কে জেঠামশাই ?

—দায়ী ভাগ্য মা—বরাৎ—যাক্ ও যদি ভাল হয়তো হোক। না হয়—যাক শ্রীভগবানের চরণপদ্মে। তোমার বাবা তো ওকে একেবারেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ জেঠামশাই কিন্তু দাদা এখনো কিছু জানে না। আমি কালই সব জানিয়ে তাকে পত্র লিখবো।

—তাকে আর জানিয়ে কি হবে মা ? থাক—

—তা কি হয় জেঠামশাই !—অঞ্জনার স্বামী বললো—তার স্ত্রী, তাকে জানাতেই হবে। না জানানো অপরাধ।

—আমি জানাব জেঠামশাই—এয়ার মেলে আমি কালই চিঠি দেব।—অঞ্জনা বললো। উলু এর মধ্যে উঠে চলে গেছে বাগানের কিনারে। কতকগুলো পাখী আছে একটা খাঁচায়। তাই দেখছে, খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। দেখতে দেখতে বলছে,

—এবার মরে তোদের ঘরে জন্মাব—আমিও অমনি সুখের জীবন যেন পাই। অমনি করে সংসারের খাঁচায ঘুবে বেড়াই।

চোখে জল এল অঞ্জনাব। হু হু কবে কেঁদে ফেললো সে।

—বৌদি—তুমি সুস্থ হও—দাদাকে লিখবো। পৃথিবীতে তোমার মত সতী মেযে আছে কিনা জানিনা। বৌদি—অঞ্জনা এগিযে গেল। ধরলো উলুকে। বললো,

—দাদাকে চিঠি লেখ নি?

—না—লিখে কি হবে! আমার চিঠি লিখবার কেউ নাই। শুধু বাবা আছেন আমার বাবা। মানুষের রাজ্যে দেবতা।

—তোমাব সবই আছে বৌদি—সবই থাকবে। তুমি ভাল হও।

—ভাল হযে কি হবে? ভাল আমি হতে চাইনে। আমার ছোঁয়াচ তুই বাঁচিয়ে চল অঞ্জু—তোর আবার কিছু অকল্যাণ না হয়—যা সরে যা—

চলে গেল উলু—অঞ্জনা ফিরে এল অসিতবাবুব কাছে। অসিতবাবু বললেন,

—ঐ বাতিক—ও অপযা, যেখানে গেছে অকল্যাণ ঘটেছে। ওর জীবনে কোথাও সুখ পেলনা—পাবে না।

—ডাক্তার কি বলছেন?—অঞ্জনার স্বামী জিজ্ঞাসা করলো।

—ম্যালেঙ্কোলিয়া—এ বোগ সারানো মুস্কিল। কে জানে কি হবে!

অসিতবাবু চোখ মুছলেন। অঞ্জনা আঁচল চাপা দিল চোখে। উলু চলে গেছে—তার আয়া গেছে পিছনে তার। অঞ্জনা বললো,

—আমি দাদাকে সব লিখে জানাই। তার পরীক্ষার থেকে এটা অনেক বড় ব্যাপার জেঠামশাই—আমাকে জানাতেই হবে।

—আচ্ছা মা জানাবে।

ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। অসিতবাবু ডাক্তারকে ডাকলেন। দেখালেন উলুকে, আবার পরামর্শ করলেন এবং সব ঠিক করে পরদিন গাড়ী রিজার্ভ করে উলুকে নিয়ে চলে গেলেন তীর্থে।

দক্ষিণ ভারতেই আগে যাবেন তিনি। কণ্যাকুমারী দেখে তার পর হয়তো উত্তর ভারতের দিকে যেতে পারেন। উলু যদি ভাল থাকে তো সারা ভারত তিনি ঘুরবেন উলুকে সঙ্গে নিয়ে। বিদেশ তিনি দেখেছেন জন্মভূমি ভারতটাই দেখা হয় নি। অর্থের অভাব তাঁর নেই—তিনি বেশ ভালভাবেই ভ্রমণ করবেন। সাথে উলু এবং তার আয়া। একটা চাকর নিলে ভাল হোত—কিন্তু না, চাকর তিনি নিলেন না সঙ্গে।

এয়ার মেলে চিঠি এল অমিয়র কাছ থেকে। খামে চিঠি। লিখেছে,

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আপনার পত্রে ঠাকুরমার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মর্মাহত হলাম। আমি ফেরা পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন না। তিনি যে আমার জীবনে কতখানি, তা আপনি জানেন। এই শোক সামলাতে সময় লাগবে। যাক্—তাঁর দিব্যগতি হোক।

আজকার মেলে অঞ্জনার পত্রে জানলাম উলুকে আপনি চরিত্রহীনতার অপরাধে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছেন। বাড়ী আপনার এবং সেখান থেকে যাকে ইচ্ছে বের করে দেওয়ার পূর্ণ অধিকারও নিশ্চয়ই আপনার আছে। কিন্তু উলু আমার বিবাহিতা পত্নী। তাকে আপনার আশ্রয়ে রেখে আমি এই সুদূর বিদেশে এসেছি নিজের জীবনকে উন্নত এবং আমার পিতৃবংশকে উজ্জ্বল

করবার জন্য। উলুকে আমি বিবাহ করেছি অগ্নিসাক্ষ্য করে। কয়েক মাস তাকে নিয়ে জীবনও যাপন করেছি—তার চরিত্র সম্বন্ধে অকস্মাৎ কোন অপবাদে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন। আমাব পরীক্ষার আর মাত্র দু'তিনমাস দেরী আছে। এইটুকু সময় আপনি আমার ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন।

আমার পত্নীর সতীত্ব বা অসতীত্ব সম্বন্ধে কারো কথায় বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—তাছাড়া আপনাদের আমলে সতীত্বের যে সংজ্ঞা ছিল, আমাদের আমলে তা নেই।

পর্দা ঘিরে মেয়েদের মনকে বহির্জগতের আলো থেকে বঞ্চিত করা এবং তাদের মনে বেশী করে পরপুরুষ-ভোগের লালসাকে উদ্রিক্ত করাকে আমরা পাপ মনে করি। জীবনকে সহনীয় অর্থাৎ কম্প্রোমাইজ করে চলার মধ্যে আমরা একটা আত্মতৃপ্তি খুঁজে পাই। আপনাদের আমলে যা অবাঞ্ছনীয় ছিল—অসবর্ণ বা ঐরকম বিবাহ, আমাদের আমলে তা শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, আকাঙ্খিত।

আমি অঞ্জনার পত্রে জানলাম—হারুদার কথা শুনেই আপনি উলুকে পরিত্যাগ করেছেন এবং অসিতবাবুর মত একজন বিশিষ্ট নাগরিককে অপমানিত করেছেন। ঘটনাটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমার পত্নীকে এভাবে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করে বিতাড়িত করার মত কোন্ প্রমাণ আপনি পেয়েছেন, তা জানবার অধিকার নিশ্চয় আমার আছে। আপনি যদি মনে করেন যে আপনার বাড়ী এবং বিষয় সম্পত্তি নিয়ে আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন তাহলে আলাদা কথা এবং আমি সে বিষয়ে কিছু বলতে চাইনে। তবে একজনের বিবাহিতা পত্নীকে আর একজন তা তিনি যে কেউ হোন, অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন—এটা তার স্বামীর পক্ষে সহ্য করা শুধু ভীরুতা বা কাপুরুষতা নয়—তার মনুষ্যত্বের অপমান।

অঞ্জনা লিখেছে—অসিতবাবু উলুকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন।

উলু নাকি খুবই অসুস্থ—হয়তো বাঁচবে না। আমি কি প্রশ্ন করতে পারি না বাবা, এর জন্য দায়ী কে? অনেক দুঃখে কথাগুলো আপনাকে লিখলাম। উলু যদি না বাঁচে তো সেই অপরাধের বোঝা কে বইবে? আমার ভবিষ্যৎ জীবনটাই বা কিভাবে চলবে? প্রণাম জানবেন। ইতি—

প্রণতঃ

অমিয়।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে রাগে নীল হয়ে উঠলেন অমরবাবু: তাঁর সুগৌর সুন্দর কান্তি মসীবর্ণ হয়ে গেল। কাছে কেউ ছিল না। হারাধনও নেই। অমরবাবু চিঠিখানা পড়েই সজোরে ডাক দিলেন,

—হারাধন! হারাধন কোথায়?

—উনি বাইরে গেছেন হুজুর—চাকরটা জানালো এসে। অমর বাবু অস্থির হয়ে পদচারণা করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। অঞ্জনা চিঠি লিখে অমিয়কে জানিয়েছে। আস্পর্দ্ধা।—অমরবাবুকে 'সারমন' শোনায় তাঁরই পুত্র! অসহ্য! অসহ্য ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলেন তিনি আবার। অঞ্জনা হাতের কাছে নেই। আছে শ্বশুরবাড়ীতে। কাছে পেলে তার গালে দুটো চড় দিতেন তিনি। তাঁকে না জানিয়ে কেন সে চিঠি লিখতে গেল অমিয়কে? আজকালকার সব ছেলেমেয়েই পিতৃদ্রোহী—আচ্ছা, পিতাদেরও কিছু বলবার আছে এবং বলা হবে—অমিয় তাঁর একমাত্র পুত্র হলেও তিনি ক্ষমা করবেন না তাকে। আশ্চর্য্য! পুত্র বাপের কাজের কৈফিয়ৎ চায়! না, এমন ছেলের দরকার নেই। তার থেকে হারাধন অনেক ভালো ছেলে।

নীরা এসে পৌছালো। আজকাল সে বিকেলে প্রায়ই আসে। এসেই দেখলো—অমরবাবু গুলি খাওয়া বাঘের মত বারান্দায়

পায়চারী করছেন। নীরাকে দেখলেন তিনি—দেখলেন তার গলায় উলুর সেই নেকলেসটা।

—এসো, হারাধন কোথায় বেরিয়েছে। আসবে এখুনি। বসো, কোথাও যাবে তোমরা ?

—না মামাবাবু, আপনাকে যেন উত্তেজিত লাগছে। কি হয়েছে মামাবাবু ?

—পড়—অমরবাবু চিঠিখানা দিলেন নীরার হাতে। বললেন, পড়ে দেখ।

পড়লো নীরা। কিন্তু কি বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না। অমরবাবুই বললেন,—ছেলে নয় নিমকহারাম! ওকে ভাল করে আমি শিক্ষা দেব। আমার কথার উপর সে কথা বলে! আমার বিচারের উপর তার এক্তিয়ার কি ? ও ছেলে ছেলে নয় ও শত্রু—ওর যথাযোগ্য ব্যবস্থা আমি করবো আজই।

—থামুন মামাবাবু সব দিক ভেবে দেখে যাহয় করা যাবে।

—না নীরা, ভাববার কিছু নেই। ওকে আমি শিক্ষা দিয়ে যাব ; ওকে আমি বুঝিয়ে দেব যে আমার মর্য্যাদা, আমার বংশ মর্য্যাদা, আমার আভিজাত্য কোথাও আমি ক্ষুন্ন হতে দেব না—তাতে যদি ওকে ছাড়তে হয় তো হোক—কিছু এসে যায় না—

—কি হোল মামাবাবু ?

হারাধন এসে পড়লো। চিঠিখানা নিল নীরার হাত থেকে। পড়ে তার মর্ম্ম বুঝতে হারাধনের এক সেকেণ্ডও সময় লাগলো না! সে বুঝলো ব্যাপারটা তারই অনুকূলে যাচ্ছে। বললো,

—আশ্চর্য্য! অমিয় এরকম পত্র আপনাকে লিখতে সাহস করে ?

—করে করুক আমি তাকেবুঝিয়ে দিচ্ছি যেসে সিংহের গুহাতে খোঁচা মেরেছে। এ্যাটর্নীকে ডাক দাও, আমি আজই উইল করতে

চাই। আমার সব সম্পত্তি আমি তোমাকে—আমার যাকে ইচ্ছে দেব—আমার ঘরে আমার আদেশ অমোঘ।

হারাধন বুঝলো এই উত্তেজনার মুখে অমরবাবুকে দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নেওয়া যায়। অতএব সুযোগ-সন্ধানী হারাধন দেরী করলো না—এ্যাটর্নীর অফিসে ফোন করে তাঁকে আসতে অনুরোধ করলো।

অমরবাবুর উত্তেজনাটা যতদূর সম্ভব জাইয়ে রাখছে হারাধন আর নীরা। এ্যাটর্নী এসে পৌঁছালেন—নাম শরৎ বোস—তিন পুরুষের এ্যাটর্নী এঁরা—বনেদী এবং বিশিষ্ট নাগরিক। বললেন, —কি হুকুম স্যার? এতো জরুরী কি ব্যাপার ঘটলো?

—ব্যাপারটা শুনুন—বললেন অমরবাবু—বর্তমান যুগের ছেলেদের আর সহ্য করা যায় না—তারা শুধু অকৃতজ্ঞই নয় তারা এখন উচ্ছৃঙ্খল—উন্নাসিক—বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তাদের কাছ থেকে স্নেহভালবাসা পাবার আর কোন আশাই নেই আমাদের।

—সে কি! কি হোল? অমিয় তো খুবই ভাল ছেলে আপনার।

—ভাল? হ্যাঁ—ভাল। এই শুনুন····বলে পত্রটা তিনি স্বয়ং পড়ে শোনালেন শরৎবাবুকে। পরে ঘটনাও কিছু কিছু বললেন এবং জানালেন তাঁর সম্পত্তি তিনি যাকে ইচ্ছে দেবেন।

—কাকে দেবেন ঠিক করেছেন? হাসছেন শরৎবাবু কথাটা বলতে বলতে।

—আমার ইচ্ছে আমি হারাধনকে আমার সব সম্পত্তি দিয়ে যাব।

—তা তো আপনি পারেন না—শরৎবাবু মৃদু হেসে কথাটা বলে চায়ের কাপটা এগিয়ে নিয়ে চুমুক দিলেন। হেসেই বললেন, —থেমে যান অমরবাবু, ছেলে আপনার খুব ভাল। আমার

ছেলের সে সহপাঠী। সে যা লিখেছে তাতে রাগ করবার কিছু নেই।

—সে কি ? বলছেন কি আপনি ?—অমরবাবু ক্রোধে লাল হয়ে উঠলেন।

—হ্যাঁ বলছি। বর্ত্তমান যুগটার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের চলা উচিৎ। আমারই ছেলে নির্ম্মল বিয়ে করেছে এক নার্সকে। জাত কুল তার জানা নেই। বৌমাটি কিন্তু খুব ভাল। বয়সে হয়তো সে আমার ছেলের থেকে বড় হবে, কিন্তু কি তাতে এসে যায় ? বৌমা ভালই হয়েছে। আমি যুক্তি দিয়ে আমার স্ত্রীকে বোঝালাম এটা যখন চলছে এবং চলবে তখন অনর্থক ছেলের মনে দুঃখ দিয়ে লাভ কি ! বৌমাকে ঘরে তোল।

—বলেন কি, নিলেন আপনি তাকে ঘরে ?

—হ্যাঁ—নিয়ে ঠকিনি ! খুব ভাল বৌমা আমার। সেই সংসার দেখে এখন।

—বেশ, আপনি যা পেরেছেন, আমি তা পারবো না—তাছাড়া যে মেয়ে অসতী তার কথা আলাদা—

—অমরবাবু—শরৎ এ্যাটর্নী অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—আমি আপনার এ্যাটর্নী। প্রায় পঞ্চাশ বছর আপনাদের কাজ করছি আমরা। আমার বিবেচনায় যা ভাল মনে হয় বললাম। এখন কি আপনি করতে চান ?

—আমার ইচ্ছে আমার শর্ত অমিয়কে পালন করতে হবে। সে আমার বংশের মর্য্যাদা অনুযায়ী ভাল ঘরে বিয়ে করবে, তবে সে আমার সম্পত্তির মালিক হবে। নইলে আমার সব সম্পত্তি হারাধন পাবে।

—এ হয় না অমরবাবু—আইনে টিকবে না—এরকম শর্ত সম্ভব নয়।

—কারণ ?

হারাধন বসেছিল নীবাও রয়েছে। এ্যাটর্নী শরৎবাবুর উপর তাদের রাগ এত হচ্ছে যে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে তাঁকে কিন্তু এ্যাটর্নী শরৎ ঘোস থোড়াই কেয়ার করেন ওদের। বললেন—

—কারণ বহুরকম। প্রথমতঃ আপনি আপনার সম্পত্তি আর কাউকে দিতে পারেন না—দেওয়া চলবে না।

—সে কি ?

—হ্যাঁ—তার কারণ আপনার সব সম্পত্তিই পৈত্রিক। এর একটা পয়সাও আপনার নিজস্ব অর্জিত নয়—সবই দেবোত্তর—তার ন্যায্য উত্তরাধিকারী অমিয় আর অঞ্জনা। অপর কেউ তা পেতে পারে না। আপনার নিজের অর্জিত যদি কিছু থাকে তো দিন যাকে ইচ্ছে।

—ও, তাই নাকি ? অন্য কারণ ?

—এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য বিবাহ বর্ত্তমান আইনে নিষিদ্ধ। অমিযকে আবার বিয়ে করতে হলে এই স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে—কোর্ট থেকে সেটা পাওয়া অত সহজ হবে না। অন্ততঃ দুটি বছর তার জন্য সময় চাই। তিন নম্বর এবং বড় কারণ, আপনি অপরের কথা শুনে একটি বিবাহিতা পরিণত বয়স্কা মেয়ের চরিত্রে অপবাদ দিচ্ছেন। আপনার আভিজাত্য যতই বড় হোক—যে-কোনো মেয়ের নারীত্বের এবং সতীত্বের মূল্যের তুলনায় আপনার সেই আভিজাত্যের মূল্য কাণা কড়িও নয়।

—হারাধন স্বচক্ষে দেখেছে।

—রাখুন! আমি এ্যাটর্নী, আইন আপনাকে জানালাম। কোন মেয়ের সতীত্ব নিয়ে অকারণ আলোচনা করা আমার ধর্ম্মের বাইরে। কোর্টে যদি যায় সে কেশ তো আমি দেখবো। এখন

আপনি বড় জোর হারাধনকে আপনার দেবোত্তর সম্পত্তির মূল সেবাইত নিযুক্ত করতে পারেন। অবশ্য সেটাও চিরকাল টিকবে না—ঐ অমিয়, উলু অথবা অঞ্জনাই পাবে।

—অর্থাৎ আমার কিছুই করবার নেই?

—যা আছে তা ঐ বললাম।

—বেশ—অমিয়কে বিবাহ বিচ্ছেদ করবার আদেশই আমি দিয়ে যাব—আমার ঘরে উলু আর ঢুকবে না কোনদিন।

—তা করতে পারেন। সময় লাগবে। এবং অমিয় যদি আপনার সে আদেশ না মানে তো আপনি তার কিছুই করতে পারবেন না।

—সব সম্পত্তি অমিয়ই পাবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—এতে তার জন্মগত অধিকার। এ তার বাপ-ঠাকুরদার বিষয়-সম্পদ; আপনার নিজস্ব কি আছে কে জানে—আমার তো জানা নেই। তাই বলছিলাম থেমে যান—অসুস্থ বৌমাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনুন। অনর্থক অশান্তি বাড়াবেন না। কোনো মেয়েকে অসতী বলার আগে নিজের জন্মদাত্রী মার কথা ভাবতে হয়। এ অপবাদ যে দেয় তাকে আমি মার্জনা করিনে। তা তিনি আপনার ভাগ্নে বা ভাইপো যাই হোন। পুত্রবধূকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে যদি আপনি নিজকে করিতকর্ম্মা ভেবে থাকেন তো ভুল করছেন। আমি আপনার হিতৈষী তাই এত কথা বললাম। আচ্ছা—নমস্কার।

শরৎবাবু নিজের গাড়ীতে উঠে চলে গেলেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।

উকীল শরৎ বোসের কথা শুনে অমরবাবু গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। নীরা এবং হারাও আছে। তারা দুজনেই

ভাবছে এ্যাটর্নী শয়তানটা সবই ভেস্তে দিল। অমরবাবু বললেন,

—ওসব বাজে কথা! আমি কিছু একটা করবই অমিয়কে জব্দ করবার জন্য। কি করা যায়?

হারাধন সুযোগ বুঝে বললো,

—উকীল-এ্যাটর্নীর কথা শুনে কাজ করা চলে না মামাবাবু। যতদূর মনে হয় শরৎ এ্যাটর্নীর কিছু মতলব আছে। যে ভাবে আপনাকে কথাগুলো উনি বললেন, আপনার মত লোককে তা বলা উচিৎ নয়। আপনিও তো বি, এল পাশ—না?

—হ্যাঁ—তবে আমি তো আর কোর্টে বেরুই নি; পাশই করা আছে। আইন নিত্য নূতন তৈরী হচ্ছে।

—হোক। আইনের ফাঁকও বিস্তর আছে। অবশ্য শরৎবাবু যা বললেন তাই যদি আপনি মেনে নেন তো আলাদা কথা নইলে অনুমতি করেন তো আমি এখুনি অন্য উকীল ডাকতে পারি।

—সেটা কি ঠিক হবে?

—না হবে কেন! পয়সা দিয়ে কাজ করাবো অত তম্বী সইব কিসের জন্য! শরৎ এটর্নী কি ভেবেছেন যে তিনি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন আইনজ্ঞ উকীল নেই? আপনাকে একেবারে আহাম্মক বানিয়ে দিতে চান যেন। উনি যা বললেন তার অর্দ্ধেক অন্ততঃ আমি সত্যি মনে করিনে।

—বেশ, ডাক আর একজন ভাল উকিল। দেখি তিনি কি বলেন। আমার সম্পত্তি আমি দিতে পারবো না, এ কি রকম আইন?

—ওসব মিছে কথা মামাবাবু। শরৎ উকীলের ছেলের সঙ্গে অমিয়র বন্ধুত্ব আছে। শরৎবাবু অমিয়র দিকে টেনে কথা বললেন। ছেলে বাবাকে অসম্মান করলো সেটা তিনি অগ্রাহ্যই

করছেন তাঁর নিজের ছেলে হলে তবে বুঝতেন। অমিয়র সাহস দেখে আমি তো অবাক হয়ে গেছি। নীরা বলছে 'আমি তাঁকে দেখিনি কিন্তু এ কি রকম ছেলে? অতবড় বাপকে এমন চিঠি তিনি লিখলেন কি করে—'

—সত্যি মামাবাবু আমার আশ্চর্য্য লাগছে।

—লাগবার কথাই। এ যুগের ছেলেদের নিয়ে ঘর সংসার করা মুস্কিল।

—না মামাবাবু—নীরা আস্তে বললো—তা কেন হবে আমাদের বাড়ীতে তো সব ছেলেরা রয়েছে। আমরাও তো এই যুগেই জন্মেছি। নিজের মা বাপকে অমন করে অসম্মানিত আমরা নিশ্চয় করবো না। এই যে আমি আসি আপনার বাড়ী—আপনি স্নেহ করেন ডাকেন সব কথাই আমি আমার মার কাছে বলেছি। তিনি মত দেন তাই আসি।

—হ্যাঁ মা নিশ্চয়। সবাই যদি তোমার মত হোত তো ভাবনা কি?

—আমরা ওরকম কিছু ভাবতেই পারিনে মামাবাবু—হারাধন বললো, মা-বাবাকে তো দেখিনি মনেই পড়ে না। আপনাকেই বাবা বলে জানি। আপনার অগোচরে দেখেন তো কোন কাজ করিনে আমি। জানি, আপনিই আমার সব।

অমরবাবু খুবই খুসী হচ্ছেন হারাধনের কথায়। একখানা গাড়ী এসে ঢুকলো গেটে। অঞ্জনা নামলো, এলো বাবার কাছে। সেও এয়ার মেলে দাদার চিঠি পেয়েছে তাতে অমিয় লিখেছে অঞ্জনাকে—"বাবাকে আমি কড়া চিঠিই লিখলাম; ফল কি দাঁড়ায় তুই যেন খবর রাখিস—দাদা—"

অঞ্জনা তাই এলো। এসেই বুঝলো অবস্থাটা বেশ থমথমে। ওর দিকে বাবা তো নয়ই কেউ যেন মনই দিল না। নীরাই বললো,

—এসো—ভাল আছ অঞ্জনা ?

—হ্যাঁ—ভাল। আপনি ?

ভালই ! শুনলাম তোমরা নাকি ইটালীতে যাবে কি সব
খবার জন্য ?

—হ্যাঁ, আমি নয় উনি যাবেন, ইটালি নয়, ঈজিপ্টএ যাচ্ছেন।
শু যাবেন।

—ও—হ্যাঁ—ঈজিপ্টেই। কি পড়বেন সেখানে উনি ?

—জানি না। অত খবরের কি আমার দরকার ? সরকারী
ত্তুতে যাচ্ছেন।

অমরবাবু এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলেন নি মেয়ের সঙ্গে।
তক্ষণে বললেন,—ওখানে কতদিন থাকবে সে ?

—তা বছরখানেক তো নিশ্চয়ই।

—বেশ, এই সময়টায় তুই এখানে এসে থাকতে পারবি ?

—তা আমি কেমন করে বলবো বাবা—আমি তো স্বাধীন
নই। আমার শ্বশুরমশাইকে শুধোবেন শাশুড়ীঠাকুরাণীকে বলতে
হবে। তাঁদের মত হলে আমি থাকতে পারি। তবে আমার
শ্বশুরের খুব অসুবিধা হবে।

—কেন ? কেন ?

—তাঁর যা-কিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে দেওয়া রাখা ঢাকা সময়মত
সব ঠিক করে দেওয়া চাই। দার্শনিক লোক প্রায় তাঁর কাজ
ভুল হয়। সেটা তাঁকে মনে করিয়া দেওয়া—এই সব আমাকে
করতে হয়।

—মেয়ে কি করে ? লক্ষ্মী ? সে তো ওগুলো করতে
পারে।

—হ্যাঁ, আমার যাবার আগে সেই ওসব করতো। এখন কেন
সে করবে ? তাছাড়া তার অন্য চিন্তা আছে। বিয়ে হয় নি। কে

জানে কি করবে। হয়তো ওরা ভাইবোনেই ঈজিপ্ট যাবে। বাবা হয়ত লক্ষ্মীকেও পাঠাবেন।

—বিয়ে সে করছে না কেন?

—কারণ আছে—হারাধন বললো—বিয়ে না করার সাংঘাতিক কারণ আছে মামাবাবু, আপনি জানেন না।

—না—কি কারণ এমন?

—অসিতবাবুর ছেলে নীলু যে জেল থেকে পালিয়ে গেছে নিরুদ্দেশ—লক্ষ্মীমণি তাকেই বিয়ে করবে, অন্য আর কাউকে নয়।

—জেল থেকে পালিয়ে গেছে? না না—খালাস পেয়ে তবে গেছে।

নীরা বসে আছে। নীলুর জেলের জন্য দায়ী নীরা। কিন্তু সেকথা অমরবাবুর কাছে প্রকাশ করা উচিৎ হবে না। তাই সে হারাধনকে থামতে ইঙ্গিত করলো। হারাধন সামলে গেল। বললো,

—ঐ একই কথা মামাবাবু—ওর আর বাড়ী ফেরার পথ ছিল না। বদনামের চরম হয়ে গেছে সমাজে। তাকেই বিয়ে করবার জন্য লক্ষ্মী বসে আছে। আশ্চর্য্য যে তার বাবা-মা কিছু বলেন না। মেয়ের এই অন্যায় আচরণ সমর্থন করছেন তাঁরা! আশ্চর্য্য! আহাম্মক মানুষ!

—মানুষ তাহলে আপনিই আছেন দেখছি হারাধনদা—

—তোর তাতে এত চটবার কি হোল অঞ্জনা! যা সত্যি তাই বলছি। শিবদাসবাবুর উচিৎ মেয়েকে ঘাড় ধরে বিয়ে করতে বাধ্য করা। না করার জন্য তাঁকে আমি আহাম্মক বলি।

অঞ্জনা বললো,

—শুনুন হারাধনদা'—লক্ষ্মী আমার ননদ—আর তার বাবা-মা আমার শ্বশুরশাশুড়ী। তাঁদের কাজের সমালোচনা করার ধৃষ্টতা

আপনি আপনার মামার কাছে দেখাবেন আমার কাছে নয়। যাক—বাবা আমার কিছু বলবার ছিল—শুনবেন ?

—হ্যাঁ কিন্তু তুই অত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন অঞ্জু! হারাধন কি এমন বললো ?

—আমার শ্বশুর যিনি ভারতের জাতীয় অধ্যাপক সকলের প্রণম্য, তিনি আহাম্মক আর পূজ্যপাদ হারাধন যিনি····যাক—আমি আমার কথাটা বলে যাই। দাদা লিখেছেন, আপনি বৌদিকে বাড়ী ফিরিয়ে আনুন। দাদা এলে কি ঘটেছে জেনে তার ব্যবস্থা করা হবে, অপরের কথা শুনে বাড়ীর বৌকে বের করে দেওয়া সম্মানজনক নয়—খবরটা প্রকাশ হবার আগেই তাকে আনা দরকার।

—এটা কি তার হুকুম? তোর মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছে নাকি ?

ক্রুদ্ধ অমরবাবুর কণ্ঠস্বর উদ্ধত বজ্রের মত শোনালো। উঠে তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন আবার,

—তোকে দিয়ে হুকুম করেছে নাকি!

—হ্যাঁ মামাবাবু এ তো হুকুমই।—হারাধন টীপ্পনি কাটলো।

—চুপ করুন হারাধনদা—বাবার সঙ্গে আমার কথার মাঝে আপনি কেউ নন—শুনুন বাবা—দাদা প্রার্থনা করেছেন, তিনি লিখেছেন, উত্তেজনার মুখে তিনি আপনাকে চিঠি লিখেছেন। কি যে লিখেছেন ঠিক মনে নাই—তাই তাড়াতাড়ি আমাকে লিখেছেন আমি যেন তাঁর হয়ে ক্ষমা চাই আর বৌদিকে ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রার্থনা করি।

—ফেরানো হবে না। তার যা ইচ্ছে করতে পারে। সে যদি সেই চরিত্রহীনাকে নিয়ে থাকতে চায় তো থাকগে—আমার বাড়ীতে ও মেয়ে ঢুকবে না—

—বাবা—

—না, কোন কথা আমি শুনতে চাইনে অঞ্জনা। দরকার হলে তোদের ভাইবোনকেই ত্যাগ করতে পারবো।

—পারবেন? বেশ করবেন! পরগাছা দিয়েই আপনি আপনার বাগানের শোভা বাড়ান তাহলে। আর্কিড্ আর আইভিলতাই থাক—আমার অশোকতরু দাদা মালতীলতা বৌদি চলে গেছে, আমিও চললাম—ঝর ঝর জল গড়ালো চোখে ওর।

—অঞ্জনা!—

—না—আমার সতী বৌদির চরিত্রের অপবাদ শুনতে আসিনি আমি। পরের কথা শুনে আপনি যা বললেন আমি তা শুনে প্রায়শ্চিত্ত করবো। আর শুনুন বাবা—যে আপনাকে একথা বলে সে শয়তান—নারীর চরিত্রে যে অপবাদ দেয় সে কাপুরুষ—সে কুকুর।

চলে গেল অঞ্জনা। ফিরে তাকালো না। ক্রুদ্ধ অমরবাবু দেখলেন। দেখলেন—ক্রুদ্ধা সর্পিনীর মত অঞ্জনা চলে গেল—ঠিক তার মা'র মত—ঠিক অমরবাবুর মৃতা পত্নীর মতই। গ্রাহ্যমাত্র করলো না ঐ কুড়ি বছরের মেয়েটা তাঁকে। আশ্চর্য্য সাহস! আচ্ছা, তিনি ওদের জব্দ করবেনই।

নীরা আর হারাধন নিশ্চুপ বসে রয়েছে। নীরার সামনে এক বাটি চা, অঞ্জনাকে দেবার জন্য তৈরী করেছিল—অঞ্জনা চলে যাচ্ছে। গাড়ীতে বসে ওদের পুরোণো ড্রাইভার লোচন সিং। অমরবাবু বললেন,

—লোচন! দাঁড়াও—

গাড়ীটা থামালো লোচন। অমরবাবু এগিয়ে গেলেন। বললেন, —বেশ অঞ্জনা—মা-মরা তোদের মানুষ করেছি—এতবড় করলাম এই তার যোগ্য ফল! ভাল—তুই আর তোর দাদা আমার কেউ নোস্। আমার সব সম্পদ আমি যাকে ইচ্ছে দেব।

—দেবেন।—সম্পদের ভয় দেখাবেন না বাবা। আপনাকে দুঃখ দেবার জন্য আমি আসিনি। কিন্তু মনে রাখবেন কোন পথের কুরের মুখে আমার বৌদির চরিত্রের অপবাদ আমি শুনবো না। আপনার সম্পদ নিয়ে আপনি যা ইচ্ছে করুন। আমরা যদি কেউ নাই হই তো আপনার তো দুঃখ নেই। আমরা ভাইবোন অবশ্য আপনারই থাকলাম—এখন আপনি যদি ইচ্ছে করেন তো আপনার সম্পদ সম্মান এবং ইহপরকাল পিণ্ডাধিকার যাকে ইচ্ছে দেবেন—শুধু জানিয়ে যাচ্ছি বৌদি যদি না বাঁচে—বাঁচার আশা কমই তার—তাহলে এই হত্যার পাপ আপনার। এর জন্য কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে হবে উপরে স্বর্গে —চলো লোচনদা—

—আচ্ছা, দরকার হয় তো দেব কৈফিয়ৎ।

গাড়ী চলে গেল। অমরবাবু উত্তেজনার মুখে কি যে বলেছেন ঠিক মনে করতে পারছেন না। ফিরে এলেন। হারাধন অবস্থা বুঝে নীরার সঙ্গে পরামর্শ করে রেখেছে। বলল,

—ও ছেলে মানুষ মামাবাবু ওর কথা ধরবেন না।

—ছেলেমানুষ! ওর পিছনে আছে ওর বুড়োমানুষ দাদা—

—হ্যাঁ, তাতো আছেই।

—অর্থাৎ ওরা বিশ্বাস করছেনা যে ঐ মেয়েটা খারাপ, অথচ তুমি সঠিক জেনেছ, ও অসিতবাবুর কেউ নয়—তুমি দেখেছ ও খিড়কী পথে টাকা দেয় অচেনা কোনো লোককে! ক'দিন দেখেছ তুমি এরকম টাকা দিতে?

—তিন দিন মামাবাবু—তারপর আপনাকে বলতে বাধ্য হই।

—মাও তো দেখেছিল?

—হ্যাঁ, দিদিমাও দেখেছিলেন।

—ওর কৈফিয়ৎ ও যা দিয়েছে, তাও সত্য নয়। অর্থাৎ অসিত বাবুর কারখানার কোনো কর্ম্মচারীই নয় ও—সবই মিথ্যে বলেছে।

—হ্যাঁ মামাবাবু ও-লোকটি এখানকার কেউ নয়। ও ঐ রকম বেশে আসতো। ওটা ছদ্মবেশ। সুন্দর যুবক ও—বয়স বড়জোর ত্রিশ কি বত্রিশ।

—দেখেছ ?

—আজ্ঞে না-দেখে অতবড় কথাটা কি আপনাকে বলতে পারি ?

—যাক—কাল সকালে একজন ভাল উকীলকে ডাকবে। যা করবার আমিই করবো।

—যে আজ্ঞে।

অন্য কেউ হলে অঞ্জনার গভীর বেদনাব দিকটা ভাবতো, দেখতো—কিন্তু অমরবাবুর আভিজাত্যটা বড়লোকের বসে-বসে ঘি দুধ খেযে ভুঁড়ি বাড়ার মত ব্যারাম। তিনি অঞ্জনার কথাগুলো শুনে ভাবলেন, ছেলে এবং মেয়ে তাঁকে অপমানই করছে। আচ্ছা!

অমরবাবু উপবে গেলেন। মনটা জ্বলছে তাঁর।

উলুকে নিয়ে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কবছেন অসিতবাবু। ধনী ব্যক্তি তিনি। কোথাও কোন অসুবিধা হবার কথা নয়—শুধু উলু অসুস্থ এবং তারই জন্য চিন্তা! বড় বড় হোটেলে উঠছেন, দুচার দিন বা দু-দশদিন থেকে সেখানকার দ্রষ্টব্য দেখে অন্যত্র যাচ্ছেন। নিজে তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি—ভারতের নানা ঐতিহ্য, কথা ও কাহিনী উলুকে বলেন—বোঝান এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করতে উপদেশ দেন।

এইভাবে মাস চার পাঁচ তিনি ঘুরতে ঘুরতে এলেন ভারতের দক্ষিণ সমুদ্রের কূলে কন্যাকুমারিকায়। উলু এর মধ্যে যথেষ্ট সুস্থ হয়েছে, এমন কি তার কোন অসুখ আছে বলে মনেই হয় না—শুধু

শরীরটা এখনো সারে নি। সে তার ভাগ্যকে যেন মেনে নিয়েছে এবং বুঝেছে যে ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না। অতএব তাকে মানা ছাড়া পথ নেই।

মাদুরা ত্রিবন্দ্রম ত্রিচিনপল্লী ইত্যাদি তীর্থ ঘুরে কন্যাকুমারীতে উঠলেন অসিতবাবু উলুকে নিয়ে। দিনকয়েক থাকবেন এখানে। কারণ অন্য এক বাঙালী পরিবারের সঙ্গে তাঁদের আলাপ হয়েছে। তাঁরাও ভ্রমণ করছেন। তাঁরাই বললেন—মাসখানেক এখানে থাকা যাবে।

—থাকা অবশ্য যায়—কিন্তু থাকবার যায়গা খুব ভাল পাওয়া যাচ্ছে না—অবশেষে জুটলো একখানা ঘর দুই পরিবারই থাকতে পারবেন। বর্ত্তমানে ভারতে নানা দিকে উন্নতি হচ্ছে। যানবাহনেরও নানা সুবিধা তাই খুব বেশী অসুবিধা হচ্ছে না। উলু ভাল আছে। অসিতবাবুও তাই ভাল আছেন।

উলুর মধ্যে যেন একটা লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে, লক্ষ্য করেছেন অসিতবাবু। সে এই ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লিখে রাখে। তার মনটাকে অন্যমনস্ক করার জন্য এবং কোন সৎকাজে লাগাবার জন্য অসিতবাবুই গোড়ায় এই ব্যবস্থা করেছিলেন—বলেছিলেন, 'যা দেখবি লিখে রাখবি। পরে আবার সেগুলো পড়লে আনন্দ পাবি, মনে পড়বে তার স্মৃতি।'

উলু আদেশটা অগ্রাহ্য ভাবেই পালন করছিল কিন্তু এখন অবস্থা অন্য রকম। উলুর যেন আর না লিখলেই চলে না। তার সরস সাহিত্য সে নিজেই পড়ে মুগ্ধ হয়। সেদিন অসিতবাবুকে বললো,

—খাতা ফুরিয়ে গেছে বাবা—আনিয়ে দিন।

—আচ্ছা মা, এই কদিন কি লিখলি—শোনা আমাকে।

উলু শোনাচ্ছে। সুন্দর লিখেছে। পথের খুঁটিনাটিকে সে তার আশ্চর্য অনুভূতি দিয়ে রূপকথার রাজ্যের আস্বাদ দিয়েছে।

ওর মন প্রাণ যে সাহিত্যসমৃদ্ধ তা বুঝতে পারলেন অসিতবাবু। খুব আনন্দের কথা—উলু সম্পূর্ণ সেরে গেল—দেখে তিনি মনে মনে ঠিক করলেন—অমিয়র সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিযে তিনি উলুর আবার বিয়ে দেবেন।

বর্ত্তমান দিনে এটা কিছু বেশী কথা নয়। সঙ্গে যে বাঙালী পারিবারটি রযেছেন—তাঁদের কর্ত্তা কথাটা বলেছেন কিছুদিন আগে। শুনে অবশ্য অসিতবাবু খুব উৎসাহ পান নি তখন কিন্তু আজ উলুর সুস্থ হওযা এবং সাহিত্য রচনার কথা থেকে তিনি আবার ভাবলেন কথাটা। অবশ্য তিনি এ কথাও ভাবলেন—অমিয় কি করছে কিছুই জানা নেই। যদি সেও তার বাবার মতকেই মেনে নেয তো উলুর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন অসিতবাবু। আর যদি অমিয় ফিরে এসে উলুকে নিতে চায—তো সংই ভাল হবে। কিন্তু সে আশা আর নাই। অসিতবাবু তাই উলুকে বললেন,

—দেশে যাবার ইচ্ছে হয় না মা ?

—না বাবা না—দেশে কি আছে যে যাব। যদি আপনার অসুবিধা না হয় তো আরো দূরদেশে চলুন—অনেক অনেক দূর—

—ভারতের মধ্যে আর দূর তো নেই মা। এবার যেতে হলে ভারতের বাইরে যেতে হয়।

—যাওয়া যায় না বাবা ?

—যাবে না কেন। তার ব্যবস্থা করতে হয়। পাশপোর্ট চাই তাছাড়া এখন আর জাহাজে বড় কেউ যায় না ; প্লেনে যেতে হয়। তবে ভারতেরই তো অনেক যায়গা দেখার বাকী রয়েছে। বোম্বাই হয়ে তোকে আমি দিল্লী নিয়ে যাব—উত্তর ভারতও দেখবি।

—হ্যাঁ—বাবা—দেখবো। দেশ দেখার খুব আনন্দ আছে। আচ্ছা বাবা বিলাত—আমেরিকাও তো যেতে পারি আমরা ?

—হ্যাঁ—না পারবো কেন ? যাবি ?

—যাব—যদি অবশ্য আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

—আমার সুবিধা এখন সবটাই তোকে নিয়ে মা। তোর সুবিধে আর সুখ হলেই আমাব সব পূর্ণ হয়।

—সুখ নেই বাবা—সুখ আব আমি খুঁজবো না। আমাব সুখের জন্য আর আপনি চিন্তা করবেন না। ওকে আর চাইছি না আমি!

—সেকি মা?

—না—সুখ যার অদৃষ্টে থাকে সে তরুতলেও সুখী হয়। সে তার কুঁড়ে ঘরে রাজত্ব করে, আর যার অদৃষ্টে নেই তাব বাজসিংহাসনেও নেই।

কথাগুলো ব্যথা—বেদনার থেকে ঝরছে উলুর মুখ দিয়ে। কিন্তু উলু আবাব উদাস হয়ে যেতে পারে—তাই অসিতবাবু প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বললেন,

—ভ্রমণ কাহিনীটা লেখ—কলকাতায় গিয়ে ছাপিয়ে দেব।

—না বাবা—ছাপিয়ে কি হবে! না—ছাপানো হবে না—

—ভাল লেখা হচ্ছে তোর।

—হোক গে—ভালমন্দ যা হোক এ আমার আর আপনার জন্যই। আর কাউকে আমি দেখাতে চাই নে এসব।

—আচ্ছা থাক! তুই লিখে যা, মাঝে মাঝে পড়ে শোনাবি।

উলুর সঙ্গে সতর্কভাবে কথা বলেন অসিতবাবু কারণ কে জানে কোন্‌দিকে তার মনের গতি।

খাতা আনিয়ে দিলেন কিন্তু দেখলেন, উলু আর লিখছে না।

—লিখছিসনে কেন মা উলু?

—না—ওসব আর লিখবো না বাবা!

—সেকি? কেন? ভালই তো লিখছিলি।

—না, ভাল হচ্ছেনা—হলেও আমার লিখতে ইচ্ছে করেনা। মনে হয় কি হবে লিখে? কোন কাজে লাগবে? অনর্থক কাগজ

কালি নষ্ট করা। তার থেকে পড়া ভাল। পড়ছি অনেকগুলো বই। পড়লাম—ঐ ওদের মেয়ে রঞ্জিতার কাছে পেলাম। রঞ্জিতা খুব ভাল মেয়ে বাবা। ওর বাবা তো রেলের লোক পাশ পেয়েছেন হয়তো ওঁরা আরো অনেক ঘুরবেন। চলুন আমরাও যাই এখান থেকে। বোম্বাই যাব....

—ওরা তো এখন যাবে না মা—

—না যান তো থাকুন। আমরা চলে যাই। এখানে আর থাকতে চাইনে।

অসিত বাবু বুঝলেন উলুর আর এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই। তার মতেমতেই চলে এসেছেন তিনি তার রোগ সারাবার জন্য। তাই বললেন,

—বেশ চল তোকে বোম্বাই নিয়ে যাই—তারপর কোথায় যাব ঠিক করবো।

—হ্যাঁ—চলুন।

মুখ্যতঃ উলুকে সুস্থ করবার জন্যই অসিতবাবুর এই দেশভ্রমণ। কিন্তু উলু ঠিক সুস্থ হয়েছে কিনা সন্দেহ জাগে তাঁর। তাই দেরী না করে পর দিনই তিনি উলুকে নিয়ে বোম্বাই রওনা হবেন ঠিক করলেন। সঙ্গী ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন,

—সেকি। এখনো তো পনরদিন এখানে থাকবার কথা।

—না, থাকা চলে না। মেয়েটা থাকতে চাইছে না আর।

—আচ্ছা, আমি তাকে বলছি।

—না না ও কারো সঙ্গে কথাই বলতে চায় না। আপনার মেয়ে রঞ্জিতার সঙ্গেই যা যতটুকু কথা বলে। ও চেষ্টা করবেন না। থাক—

ভদ্রলোক আর কি বলবেন। পরদিন উলুকে নিয়ে অসিতবাবু চলে গেলেন বোম্বাই। পথে যাতে কোন কষ্ট না হয় তার জন্য

সব ব্যবস্থাই করেছেন তিনি। আয়াটাকে বারবার বললেন উলু যেন কোন অসুবিধা বোধ না করে।

উলুর আয়াটি নতুন। কিন্তু লোক ভাল। ভারত তীর্থ ভ্রমণ হচ্ছে। এতো টাকা খরচ করে কোনো কালে তার পক্ষে এইসব তীর্থ দর্শন বা দেশভ্রমণ সম্ভব হোত না। সে কৃতজ্ঞ আছে। উলুর সেবাযত্ন সে খুব ভাল ভাবেই করে। সে জানে উলুই অসিতবাবুর একমাত্র সন্তান। নীলুর কথা সে কিছুই জানেনা। কেউ কোনদিন বলেনি তাকে।

পল্লীগ্রামের দুঃখী ঘর থেকে সে এসেছে। বয়স চল্লিশের উপর। সন্তানাদি নাই তাই অসিতবাবু বলেছেন, 'উলুর কাছে বরাবর থাকবে তুমি। তোমার জন্য আমি মাসোহারা বরাদ্দ করে দিয়েছি! কোন কষ্ট হবে না তোমার।'

কষ্ট সত্যি তার কিছু নাই। খুব সুখে আছে। কিন্তু যার জন্য সে আছে সেই উলুই সারছে না। ঠিক সেরেছে মনে হয় না। তবে এখন উলু অনেকটা প্রকৃতিস্থ। কে জানে কবে সারবে কবে আবার তার স্বচ্ছন্দ জীবন ফিরে পাবে সে। অসিতবাবু উলুকে চোখেচোখে রাখবার জন্যই আয়াকে নিযুক্ত করেছেন। কারণ কে জানে উলু কখন কি করে বসে। আশ্চর্য্য যে এই তিন চার মাসে উলু কোন দিন শ্বশুরবাড়ী অথবা অমিয়র নামও করেনি। তার হয়তো মনেই নাই।

না—মনে আছে। খুব ভাল ভাবেই মনে আছে। অসিতবাবু সেদিন জানতে পারলেন ব্যাপারটা। দেখতে পেলেন বিয়ের সময় উলু আর অমিয়র যে ফটো তোলানো হয়েছিল তারই একখানা উলু তার সুটকেসের মধ্যে নিয়ে এসেছে। ওটা যে এনেছে তা জানতেন না অসিতবাবু। আজ হঠাৎ বোম্বাই-এর হোটেলে উলুর ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলেন···উলু স্নান-ঘরে ঢুকেছে। ছোট্ট

টিপয়টার উপর রয়েছে সেই ফটো। দেখলেন অমিয়র ছবি ঠিক আছে উলুব ছবিটার উপব লাল কালি দিয়ে ক্রশমার্ক কবে কাটা। উলু এলো স্নান সেরে। সঙ্গে আয়া। অসিতবাবু শুধোলেন,

—তোর ছবিটা লাল কালি দিযে কাটা কেন মা ?

—ওর আর থাকার দরকার নেই বাবা তাই কেটে দিয়েছি !

—ওব থাকার খুবই দরকার। ও আমার যথাসর্ব্বস্বের মালিক।

অসিতবাবুব চোখে জল এল। উলু দেখলো। বললো,

—বাবা—আমার দেহে আপনার রক্তের ছিটেফোটাও নেই। তবু আপনি আমাকে এতো স্নেহ কেন করেন বাবা ? আশ্চর্য্য !

—শোন উলু—অসিতবাবু বললেন—রক্তের সঙ্গে যোগটাই বড় যোগ নয়, আত্মার সঙ্গে যোগটাই বড়—তোকে আমি যেভাবে পেয়েছি, যে অবস্থায় পেয়েছি, আমার মনের যেখানে তুই আশ্রয় নিয়েছিস—আত্মজার আশ্রয় থেকে তা কিছু কম নয়। ভাল হ' উলু, আমি তোর জন্য আবার সব ব্যবস্থা করবো।

—ভাল আমি হয়েছি বাবা—আপনি আর ভাববেন না। কিন্তু আপনি আমাকে সব দিতে পারলেও অদৃষ্ট দিতে পারবেন না। আমার অদৃষ্ট আমার কর্ম্মফল ফলবে, সেখানে আপনার বা আর কারও কিছু করবার নেই। আমি দুঃখের মধ্যে জেনেছি মানুষের জীবনটা ভ্রমন-কাহিণী। এই ইতিবৃত্ত একদিন মৃত্যুতে শেষ হবে। পথের যা কিছু বর্ণনা তা বর্ণনাই। সুখ বা দুঃখ তাকে রঞ্জিত করে মাত্র। কোথাও অতিরঞ্জন কোথাও অনুরঞ্জন কোথাও নিরঞ্জন, সেই জন্য আমি আর জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে চিন্তা করিনে।

উলুর কথায় অসিতবাবু যেন বুঝতে পারলেন, উলু খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে। নিজস্ব চিন্তাধারায় আবার এসেছে সে। তাই শুধোলেন,

—অমিয় যদি ফিরে এসে তোকে নিতে চায় উলু ?

—নিয়ে যাবে। না চায় না যাবে। কিছু আর এসে যায় না বাবা। জীবনকে আমি সহনীয় করে নিয়েছি।

অসিতবাবু আর কিছু বললেন না।

পরদিন হারাধন উকীল আনতো কিন্তু মামাকে আর একবার শুধোনো দরকার। কে জানে রাত্রির মধ্যে তাঁর মত পরিবর্ত্তন হোল কি না। কাজটা যতশীঘ্র সম্ভব করিয়ে নিতে চায় হারাধন। নীবারও তাই মত। দেরী হলে অমরবাবুর উত্তেজনা নিভিয়ে যেতে পারে। তখন ছেলেমেয়েকে বঞ্চিত করে কোন এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নেকে সব সম্পত্তি দেওয়ার মতলব হয়তো তাঁর নাও থাকতে পারে। তাই হারাধন এসে বসলো অমরবাবুর প্রাতরাশের টেবিলে। বললো,

—রাত্রে বেশ ঘুমিয়েছিলেন তো মামাবাবু! যা কাল ঝড় গেল আপনার মনের উপর।

—না, ঘুম হয় নি। ব্যবস্থা একটা না করে ঘুম আমার আসবে না।

—উত্তেজিত হবেন না মামাবাবু। যতসব ছেলেমানুষী কাণ্ড অমিয়র। বাবাকে কি ওরকম চিঠি লিখতে হয়। ছি! আর অঞ্জনা তো যাচ্ছেতাই বলে গেল।

—সবাইকে সিধা করে দিচ্ছি!

—চা খান।

হারাধন এমন কৌশলে কথা বলছে যাতে অমরবাবুর মনের উত্তেজনাটা নিবিয়ে না যায় অথচ হারাধনের সাধুত্ব ঠিক বজায়

থাকে। সুন্দর কথা বলতে পারে হারাধন এবং সেকেলে জমিদার-তনয় অমরবাবু নিতান্ত কাণপাতলা লোক।

তাঁর চিন্তাশক্তি এবং বিচার-বিবেচনা-শক্তির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস এই কারণে যে এতাবৎ তিনি যা বলেছেন, তাঁর কর্ম্মচারী এবং মোসাহেবরা তাই শুধু সমর্থন নয় উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ভাল বা মন্দ যে কাজই তিনি করতে হুকুম করেছেন তাই অবিলম্বে করা হয়েছে এবং যাঁরা করেছেন, তাঁরা সকলেই তাঁর পোষ্য। বহির্বিশ্বে অমরবাবুর কোথাও ঠাঁই নেই কিন্তু তিনি তা জানেন না, আপনার ঘরে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ অখণ্ড-প্রতাপশালী। অতএব উত্তেজনার খোরাক তাঁকে যোগানো কিছু কঠিন নয়। তবু তিনি আজ কি জানি কি ভেবে বললেন,

—অমিয়কে আমি একখানা চিঠি লিখতে চাই। লেখ দেখি, আমি বলে যাচ্ছি—লেখ তুমি—

—যে আজ্ঞে—

হারাধন তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে তার ন'সিকের ফাউনটেন পেনটা বের করে আরম্ভ করলো। বললো,

—বলুন, খসড়াটা করে নিই।

—খসড়া কি আবার? যাও কাগজ নিয়ে এস আমার প্যাড থেকে।

—যে আজ্ঞে।

হারাধন নীচে তলায় অমরবাবুর বসবার ঘরে গিয়ে প্যাড নিয়ে এল। লিখতে লাগলো। কিন্তু কলমটার কালি ঠিকমত আসছে না। দেখে অমরবাবু বললেন,

—ওটা কি কলম? কত দাম ওর?

—এটা কম দামী কলম মামাবাবু—ন'সিকে মাত্র। কলমের

তো আমার খুব দরকার হয় না। সই করতেই যা লাগে। আমি তো এঞ্জিনীয়ার মানুষ—হাসলো হারাধন।

—তুমি আমার ভাগে। তোমার হাতে ওরকম কলম আমার বাড়ীর অপমান।

হারাধন মুষড়ে পড়লো। তৎক্ষণাৎ সামলে বললো,

—ভাল কলম এখন পাওয়া যায় না মামাবাবু, ইম্পোর্ট বন্ধ।

—থাক – যাও আমার একটা কলম নিয়ে এস।

হারাধন আবার এল বসবার ঘরে। গোটা চার-পাঁচ কলম রয়েছে। সবই ভাল অর্থাৎ বহু মূল্য। হারাধন কোনটা নেবে দেখছে - কিন্তু বেশী সময় নাই। কলমের সম্বন্ধে তার জ্ঞান খুব কম। সে বেশ মোটা আর সুন্দর দেখে নিল একটা।

—ওটা কি আনলে? ওটা ডট্ পেন। যাও রেখে এস। তোমার দেখছি কোন জ্ঞানগম্যি নেই। পার্কারটা আন।

হারাধন আবার গেল। আনলো এবার পার্কারটা। মামার কাছে খুবই খেলো হয়ে গেল হারাধন। আহাম্মক বনে গেল। কলম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান যে দরকার একথা সে কোনদিন ভাবে নি। বিলাত ফেরৎ লোক সে কিন্তু তার কাজ কলম দিয়ে নয়। কলম একটা হলেই হোল। এমন কি পেনসিল দিয়েও সে কাজ চালাতে পারে। আজ কিন্তু খুবই মুস্কিলে পড়তে হয়েছে। যাক চিঠি লেখা হোল,

"—কল্যাণীয়েষু,

অমিয়, তোমার পত্র পেয়ে বিস্মিত এবং বিরক্ত হতে বাধ্য হলাম। আবার অঞ্জনাকে দিয়ে তুমি যে হুকুম আমার উপর চালিয়েছ তা যে-কোন বাবাকে অসম্মানিত করে। আমি আমার বংশের মর্য্যাদামত, আমার বিবেচনামত এবং আমার প্রয়োমত যা করবার করেছি। তোমার এটা বোঝা খুবই উচিত

ছিল যে আমি যা করেছি তা ভেবে চিন্তেই করেছি। এই বাড়ীতে তোমার মা, ঠাকুমার পবিত্র মন্দিরে কোনো অপবিত্র মেয়ে এসে আমার গৃহাঙ্গন কলঙ্কিত করবে এ আমি হতে দেব না। আমার জীবিতকালে এবং আমার মৃত্যুর পরেও যাতে তা না ঘটতে পারে তারও ব্যবস্থা আমি করে যাব। তাই তোমাকে জানাচ্ছি—যদি তুমি ঐ মেয়েকে পরিত্যাগ করে পুনরায় দার পরিগ্রহ কর তবে আমার সম্পদের মালিক হবে, অন্যথায় আমার গৃহ এবং মন্দির পবিত্র রাখবার জন্য আমাকে উপায়ান্তর অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ উপযুক্ত কাউকে সেবাইত নিযুক্ত করতে হবে। আমার কথা মানতে তুমি সম্মত আছ কিনা অবিলম্বে জানাবে।

আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

অমরনাথ

চিঠিখানা লেখা হোল। সই করে দিলেন অমরবাবু।

—যাও, ওকে এবার মেলে ছেড়ে দাও 'আর্জেন্ট' মার্কা করে দাও।

—যে আজ্ঞে।

হারাধন তৎক্ষণাৎ বেরুলো এবং বৌবাজারে এসে নীরার পরামর্শ অনুযায়ী পুনশ্চ দিয়ে যোগ করে দিল—'আমি জেনেছি অসিতবাবু আমাদের প্রতারণা করেছেন। এখন নিজের মুখ লুকোবার জন্য তিনি উলুকে নিয়ে নিরুদ্দেশ—তিনি যে এতখানি শঠ এবং শয়তান তা জানতাম না। যাক্—তোমার মতামত অবিলম্বে জানাবে।—বাবা।

চিঠিখানা ডাকে ছেড়ে দেওয়া হোল। হারাধন অতঃপর বলল,

—উকীল আর ডিড্ তৈরী করার কাজে দেরী পড়ে গেল। এখন অমিয় যদি সম্মতি দেয় যে সে উলুকে ছেড়ে দেবে তাহলে তো মুস্কিল হবে।

—হবে না—নীরা বললো—উলুকে তিনি ছাড়বেন না—

—কারণ কি? এত বড় সম্পত্তি মামার। তার তো একটা লোভ আছে।

—আছে, তোমার আমার কাছে আছে। ওর কাছে নেই। থাকলে অমন চিঠি সে লিখতো না। তাছাড়া অন্য কারণ আছে।

—কি?

—অসিতবাবুও যথেষ্ট ধনী ব্যক্তি। তাঁর ছেলে নিরুদ্দেশ—সবই পাবে উলু, তার মূল্য অমরবাবুর সম্পদের থেকে অনেক বেশী—জান?

—না, তুমি জানলে কি করে?

—জানি—ঐ নীলুকে আমি চিনতাম। তুমি তখন বিদেশে ছিলে। ওর সঙ্গে আলাপ ছিল আমার। লোকটা সুবিধের নয় দেখে আমি তার সঙ্গে মিশিনি—হয়তো সে আর আসবে না; হয়তো বেঁচে নেই।

—বেঁচে নেই!

—না থাকারই কথা! থাকলে অসিতবাবু উলুকে সব দি৻ চাইতেন না। শুনলাম নীলুর অনুপস্থিতেতে উলুই তাঁর সব পাবে। অতএব অমিয় হয়তো বাবার সম্পত্তির তোয়াক্কা করবে না।

—হ্যাঁ—তাছাড়া হারাধন কি যেন ভাবলো, ভেবে বললো, দিদিমা বুড়িও তাকে মোটা টাকা দিয়ে গেছে। কয়েক লাখ। নগদ টাকা, ব্যাঙ্কে আছে। অমিয়ই তার মালিক—

—সে নিয়ে তো আর কিছু করবার নেই তোমার। এখন যাতে মামা তোমাকে দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইত করে তাই দেখ।

—হ্যাঁ—কিন্তু মামার উত্তেজনাটা জুড়িয়ে গেলে মুস্কিল হবে।

—জুড়োবে না। তোমার মামা একটি আস্ত গাধা। তাঁর ধারণা পৃথিবীতে তাঁর মত বিজ্ঞ বিচক্ষণ এবং বংশ মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি আর নেই। ঐ বংশমর্য্যাদার মুখে ঝাড়ু মারি আমি।

—সর্ব্বনাশ। নীরা—এ কথা যদি তিনি শোনেন তো ঐ বাড়ীতে তোমাকে আর ঢোকানো যাবে না।

—না না না—ওর কাছে আমি তো বলতে যাচ্ছি নে। কিন্তু বংশমর্য্যাদা সকলের সমান নাও তো হতে পারে। কর্ণ বলেছিলেন—'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্'

—ওসব কি? ও যে সংস্কৃত।

—হ্যাঁ—মহাভারতের কথা—

—থাক থাক—ওসব বাদ দাও নীরা—পাণ্ডিত্য আমার সহ্য হয় না। আমি ছেনী-হাতুড়ীর লোক—ওসব কাব্যি কথা।

—কাব্যি করছি না।

—কি করছো?

—তোমার মামার মুণ্ডপাত করবার মতলব করছি। চল দেখি, দাওয়ে কোণার ঐ বাড়ীটা, ওখানে থাকেন যদুবাবু উকীল। চলে, তবু কোর্ট যান—কোন রকমে দিন চালান। কিন্তু বহু পুরোনো লোক। চব্বিশ বছরের মেয়ের বিয়ে এখনো দিতে পারেন নি। ওঁকেই প্রকাণ্ড উকীল বলে তোমার মামার কাছে নিয়ে যেতে হবে—উইল করাতে হবে—এবং আর যা দরকার সবই করিয়ে নিতে হবে। ঐ শরৎ বোসকে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না—পারবে?

—নিশ্চয়। চল, দেখা করি যদু বাবুর সঙ্গে।

—চল।

দুজনে বেরুলো। যদু উকীল দীর্ঘদিনের উকীল। বুদ্ধি ক্ষুরধার কিন্তু উকীলি ব্যবসায়ে শুধু বুদ্ধি কাজে লাগে না—'হয়কে নয়

এবং নয়কে ছয়' করবার কেশল তাঁদের আয়ত্ত করতে হয়। যদু উকীলের তাও জানা আছে। তবু তাঁর চলে না—কারণ বরাৎ।

সব শুনে তিনি বললেন—এ এমন কি একটা কাজ! কালই করিয়ে দিতে পারি।

—না, কাল হবে না। অমিয়র চিঠি আসুক!

—না—তার আগে পরামর্শর জন্য আমাকে ডাকুন আপনি। আমি গিয়ে বোঝাবো।

—তাতে যদি সন্দেহ করেন যে আমি ইনটারেষ্টেড্— ?

—করতে দেবেন কেন সে সন্দেহ? বলবেন—বর্ত্তমান যুগের আইন সম্বন্ধে সব খুঁটিনাটি জানবার জন্য আমাকে ডাকছেন। তাঁকে বলবেন—আইনটা ঠিকমত জেনে নিন।

—হ্যাঁ—তা হতে পারে।

—করুন তাই। অমিয়র চিঠি আসবার আগেই আমি ওঁকে উত্তেজিত করে কাজ হাসিল করে দিতে পারবো।

—খুব ভাল কথা—আপানার মেয়ের বিয়ের জন্য হাজার টাকা আমি দেব।

—ধন্যবাদ—কিন্তু একটা কথা।

—বলুন—

—সে দলিল কিন্তু টিকবে না। মানে আখেরে আপনাকে সব ছেড়ে দিতে হবে যদি অমিয় কোর্টে যায়।

—কোর্টে তাকে আর যেতে হবে না।

উঠলো দুজনে। নীরা নমস্কার করে বললো,

—আমার সম্বন্ধে ওঁকে গোটাকতক ভাল কথা আপনি বলবেন কাকাবাবু—বলবেন, আপনি আমাকে ছোট থেকে চেনেন।

—আরে সে আবার শেখাতে হবে নাকি আমাকে!

অমরবাবুর পরবর্ত্তী পত্র পেল অমিয় পরবর্ত্তী ডাকে। অঞ্জনাও চিঠি লিখেছে দাদাকে বাবার সঙ্গে তার যা কথা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিবৃতি দিয়ে। সে পত্র আগেই পেয়েছে অমিয়। এটাও পড়লো। রাগ দুঃখ অভিমান কোনটাই তার জাগ্‌লো না—জাগ্‌লো বাপের উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা—মনে হোল এমন বাপের পুত্র হয়ে জন্মান অপরাধ। অমিয় এর প্রায়শ্চিত্ত করবে।

একটা গোটা দিন ভাবলো অমিয়—তার পরীক্ষার আর মাস দুই মাত্র দেরী আছে। পরীক্ষা দিয়েই সে দেশে ফিরবে, বাবার সেই সময়টুকুও সবুর সইছে না। অবিলম্বে তিনি শর্ত আরোপ করে উইল করবেন এবং যে শর্ত তিনি দিয়েছেন তা মানাও অমিয়র পক্ষে সম্ভব হবে বলে সে মনে করে না।

বাবা তাঁর সম্পত্তির বঞ্চনার ভয় দেখিয়েছেন। অঞ্জনাও তাই লিখেছে। হারাধন বাবার মনকে এমন করে প্রভাবিত করে রেখেছে যে বাবা অঞ্জনাকেও কড়া কথা বলেছেন। অঞ্জনা মা-মরা মেয়ে অতি আদরে মানুষ। জীবনে সে কোন দিন কারো কড়া কথা শোনে নি। হোল কি বাবার? হারাধনকে নিয়েই বাবা জীবনটা কাটাবেন নাকি! ভাল কথা। হারাধন সম্পর্কে বাবার ভাগ্নে। সে সম্পর্কটা আপন নয় মার কোন এক দূর সম্পর্কের দাদার ছেলে হারাধন। ওর বাবা দালালী করতেন। অকস্মাৎ পরলোক গমন করায় হারাধন আর তার মা বিপন্ন হলে অমিয়র মা তাদের এনে বাড়ীতে ঠাঁই দেন। অমিয় তখন খুব ছোট—অঞ্জনা তখনো জন্মায় নি। সেই হারাধনই দেখছি আজ বাবার পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছে। ভালরে ভাল!

উলুর পত্রটা মনে পড়লো। সেটা বের করে পড়লো অমিয়। উলু লিখেছিল হারুদা তাকে কোন এক ক্লাবে ভর্ত্তি করতে চান—উলু সেখানকার আচার-আচরণ ভাল চোখে দেখেনি। সে যেতে চায় না তাই ঠাকুমার কাছে আবেদন করে ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করেছে। হারুদা সম্বন্ধে উলু খারাপ কিছু না লিখলেও লিখেছে যে ওখানে যারা যায় পুরুষ বা নারী তারা জীবনকে ভোগ করতেই যায়—উলুকে হারুদা নাকি এই কথা বলেছিলেন—'যৌবন দুদিনের—তার প্রতি মুহূর্ত্তটি মূল্যবান। অকারণ মন খারাপ করে তার অপব্যয় করা অনুচিত—'

উলুকে হারাধনের ঐ কথাটুকু বলার মধ্যেই রয়েছে তার মনের দুষ্প্রবৃত্তি। অমিয় সেদিন উলুর পত্রখানা পড়ে উলুর উপরই বিরক্ত হয়েছিল—ভেবেছিল হারুদা ভালই করতে চান। আজ কিন্তু অন্য রকম ভাবলো, বেশ বুঝলো উলু তার ক্লাবে না যাওয়ায় হারুদা রেগে ছিল। সুযোগ পেয়েই সে বাবার কাছে উলুর নামে অপবাদ দিয়েছে। কিন্তু সুযোগটা হোল কি করে? উলু তো সে রকম মেয়ে নয়। কিম্বা কে জানে! 'স্ত্রীয়াচরিত্রম পুরুষস্য ভাগ্যম্ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্য' তথাপি বাবার এই পত্র বরদাস্ত করা যায় না। ধন-সম্পদের ভয় দেখিয়ে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে স্বমতে, যে-মত বর্ত্তমান দিনে অচল—সেই মতে চালাবেন এ অসহ্য। অমিয় ভাল করে সমস্তটা ভাবলো এবং বাবাকে লিখলো—

শ্রীচরণেষু

বাবা, আপনার পত্র পেয়ে বুঝলাম আপনি উলুর অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ এবং তাকে অপবিত্র বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করেছি—ভালবেসেছি এবং বিশ্বাস করেছি—সেও আমাকে ভালবাসে। সুতরাং তাকে অপবিত্র বলে পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই

সে আজও আমাকে ভালবাসে কি না।—আমার পক্ষে তাকে পরিত্যাগ করে অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করে আপনার পবিত্র গৃহাঙ্গনকে পুষ্পাকীর্ণ করা অত সহজে সম্ভব হবে না। হয়তো মোটেই সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে আমার পরিষ্কার মত এই যে আপনি আপনার বিষয় সম্পত্তির বঞ্চনার ভয় দেখিয়ে আমাকে স্বমতে আনতে পারবেন না। বর্ত্তমান দিনে আমরা বিবাহ-বিচ্ছিন্না মেয়েকে নিয়েও সংসাব কবতে সক্ষম—। সতীত্বের মাপকাঠি বদলেছে—সুতরাং আপনার শর্ত মানা সম্ভব নাও হতে পারে। এই আমার মতামত জানালাম। এখন আপনার যথাকর্ত্তব্য কববেন। প্রণাম জানবেন। ইতি

অমিয়।

পত্রখানা ডাকে ছেড়ে দিল অমিয়। এরপর অঞ্জনাকেও লিখলো একখানা চিঠি বাবাকে লেখা তার পত্রের কপি দিয়ে। পরবর্ত্তী পত্র সে লিখলো অসিতবাবুকে তাঁর বাড়ীর ঠিকানায়। এর পূর্ব্বে যে পত্র সে অসিতবাবুকে লিখেছে তার কোন জবাব আসে নি। অঞ্জনা লিখেছে অসিতবাবু অসুস্থ উলুকে নিয়ে দেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাই অমিয় এই পত্রের উপর লিখে দিল—'অসিতবাবু যেখানেই থাকুন পত্রটি যেন তাঁর কাছে পাঠানো হয়।'

অসিতবাবুকে লিখলো অমিয় যে উলুর সম্বন্ধে বাবা যাই করুন আর যাই ভাবুন—অমিয় নিজে তাকে কোনোদিন অবিশ্বাস করেনি করবে না। অসিতবাবু যেন উলুকে একথা জানান। উলু খুবই অসুস্থ শুনে অমিয় নিজে তাকে চিঠি লিখলো না। সময়মত অসিতবাবু জানাবেন তাকে।

জগদীশ বাবুর কাছে সেই পত্র এসে পৌঁছালো। তিনি পত্রখানি অসিতবাবুর কন্যাকুমারীর ঠিকানায় রি-ডাইরেক্ট করে দিলেন। সে পত্র কন্যাকুমারীর বাসায় পৌঁছবার দুদিন আগে

অসিতবাবু উলুকে নিয়ে বোম্বাই চলে গেছেন। রেলওয়ে অফিসার দেবেনবাবু কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন অসিতবাবুর কাছ থেকে যদি কোন পত্র আসে এবং তাতে তাঁর বোম্বাইএর ঠিকানা পান তো পত্রটা পাঠাবেন। কিন্তু অসিতবাবু বোম্বাইয়ে পৌঁছে কোন পত্র দেবেনবাবুকে লিখলেন না। নিরুপায় হয়েই দেবেন বাবু পত্রখানি অমিয়র কাছেই বিলাতে ফেরৎ পাঠালেন।

পত্রখানা ফিরে এল—অমিয় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো। খামের উপর দেবেনবাবুর লেখা পড়ে বুঝলো অসিতবাবুর ঠিকানা না জানায় পত্রটি ফিরে এসেছে। আশ্চর্য্য তো! গেলেন কোথায় অসিতবাবু উলুকে নিয়ে? ভারতের বাইরে অথবা কোনো নিরালা যায়গায়? উলু বেঁচে আছে তো? ইত্যাদি নানা চিন্তায় অমিয় অস্থির হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে অঞ্জনার চিঠিতে জানলো তার বাবা উইল করবেন-কি-না-করবেন অঞ্জনা জানেনা। জানবার কোন অগ্রহও নেই তার। সে লিখেছে—বাবা যা ইচ্ছে করবেন দাদা যেন না ভাবে। ঠাকুমার টাকা আছে আর দাদার পেটে কিছু বিদ্যাও আছে। বাবার সম্পত্তি না পেলেও দাদার চলে যাবে। অঞ্জনার জন্য কোন ভাবনা নাই। সে খুব ভাল ঘর-বরে পড়েছে। স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ী এবং ননদ তাকে খুবই প্রীতির চোখে দেখে। সে খুব ভাল আছে। ওর স্বামী ঈজিপ্টে গেছে সে খবরও দিয়েছে অঞ্জনা। লক্ষীও গেছে সেখানে বেড়াতে। কে জানে কি সব পড়বে ওরা। অঞ্জনার বিদ্যে কম—তাই খবর রাখে না। হারুদা শিগ্রি বিয়ে করবে আর করবে সেই নীরা নামে মেয়েটিকে যে মেয়ে নীলুদাকে জেলে ভরেছিল। বাবা একথা জানেন কি মা অঞ্জনা জানে না। ঐ নীরাই যত সর্ব্বনাশের মূল। হারুদা তার খপ্পরে পড়েছে। এইসব অকাজ বাবাকে দিয়ে করাচ্ছে। উলুর কোন খবর সে পায় নি—পেলে দাদাকে জানাবে।

অমিয় ভাবতে লাগলো—অসিতবাবুর হোল কি ? উলুরই বা কি হোল ? তার ইচ্ছে করছে এখুনি সে দেশে ফেরে কিন্তু আর মাত্র দিন পনর পরে তার পরীক্ষা। এখন বাড়ী যাওয়ার কথা ভাবা যায় না। অমিয় সব চিন্তা ছেড়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। কাজটা অবশ্য খুবই কঠিন। কিন্তু অমিয় বরাবর ভাল ছাত্র—পরীক্ষা বেশ ভালই দেবে।

আনা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে অমিয়র—তাকে সে বলেছে ঘটনাটা। আনা শুনে বলেছে,

—ভারত সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র সংবাদ আমরা শুনতে পাই কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে এত বড় করে দেখবেন এমন নাজির আর শুনিনি।

—হ্যাঁ—সত্যি আশ্চর্য্য।

—আপনাকে তো আপনার বাবা তাহলে বিষয় সম্পত্তি কিছু দেবেন না ?

—না দিন্ কিছু এসে যাবে না। আমি আমার স্ত্রীর কথাই ভাবছি এখন।

—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তার কথাই তো ভাববার কথা। আপনি তাকে নিশ্চয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন ?—আনা প্রশ্নটা করলো।

—হ্যাঁ করি ? তাকে নিয়ে কয়েক মাস ঘর করেছি আমি। সে একটা এমন মেয়ে যার মধ্যে ব্যক্তিত্বই আমি খুঁজে পাইনি। সে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পিতা—অমন মেয়ে কমই পাওয়া যায়।

—অতিভক্তি চোরের লক্ষণ হতে পারে।—আনা বললো কথাটা।

—পারে—হ্যাঁ নিশ্চয় পারে।—অমিয় কথাটা বলতে বলতে থামলো—আনার কথাটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলো এবং বেশ কিছুক্ষণ থেমে রইল। আনা বললো,

—ওসব নিয়ে এখন ভাববেন না। পরীক্ষা দিন। পরে দেখা যাবে।

অমিয়ও আর কিছু বললো না। চিন্তাটা লেগেই রইল তার মনে। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ—হ্যাঁ ঠিক। সে ভাবলো, উলু কে? কে জানে সে কোথাকার মেয়ে? কার মেয়ে! কোথায় তার জীবন কি অবস্থার মধ্যে পড়ে কি রকম ভাবে গড়ে উঠেছে! অসিতবাবু তো তার বাবা নন—উলু তাঁর শালীর মেয়ে। তার বাবা মা মারা যাওয়ায় অসিতবাবু তাকে বাড়ীতে এনে রাখেন। এই বাপ-মা মারা যাওয়া এবং অসিতবাবুর বাড়ীতে আসার মধ্যে যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান এবং অসিতবাবুর বাড়ীতেও অন্য কোনো মেয়ে না থাকার সুযোগ—কে জানে উলু কি?

চিন্তায় কালো হয়ে উঠলো অমিয়। চিন্তাটা ক্রমশ খারাপের দিকেই আসছে। উলুর প্রতি স্নেহ-সহানুভূতিটা যেন লোপ পাচ্ছে অমিয়র মন থেকে। হয়তো উলু সত্যি খারাপ, সত্যি অপবিত্র, সত্যিই পরপুরুষে আসক্তা!

অমিয় ঘুমুতে পারলো না সেদিন।

অমিয়র পত্র এসে পৌঁছালো অমরবাবুর হাতে। পড়লেন তিনি। কাছে কেউ থাকলে তাঁর মুখ-চোখ দেখে বুঝতে পারতো তাঁর মানব দেহে দানবের আবির্ভাব হয়েছে। উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাক দিলেন,

—হারাধন! হারাধন।

—বড়দাবাবু তো বাইরে গেছেন হুজুর।

—কোথায় গেছে? কখন ফিরবে? ফোন আছে কিনা সেখানে? শুধো আফিসে গিয়ে।

—যে আজ্ঞে।

ভৃত্য চলে গেল। অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছেন অমরবাবু। এটা তাঁর স্বভাব—মনে কোনো উত্তেজনা ঘটলে তিনি এই রকম ঘোরেন। এই কয়েক বছর আগেই জমিদারী চালিয়েছেন। এখনো সেই চাল তাঁর তেমনি বজায় আছে। জমিদারী না থাক জমিদার তাঁর মধ্যে এখনো বেঁচে আছে এবং যে দণ্ডটা দিয়ে দুর্দ্দান্ত প্রজাকে শাসন করতে হয় সেই দণ্ডটাও আছে। অতএব অমিয়র শাস্তি বিধির বিধান। ভৃত্য ফিরে এসে জানালো হারাধন কোথায় গেছে কেউ জানে না। খুব সম্ভব রাত্রে ফিরবে। হারাধনের উপরও রাগ কম হচ্ছে না। কিন্তু এটা বিকাল বেলা—এ সময় হারাধন যায় ক্লাবে—জানেন অমরবাবু। ফোন ডাইরেক্টরী খুঁজে নম্বর বের করলেন তিনি যুবশ্রী ক্লাবের। ডায়েল ঘোরালেন—স্বয়ং রাণী নিপুনিকা ধরলেন। অমরবাবু বললেন,

—হারাধন আছে ওখানে? যদি থাকে তো এক্ষুনি ডেকে দিন।

—আপনি কে জানতে পারি কি?

—আমি অমর, হারাধনের মামা—জরুরী দরকার তাকে আমার।

—আচ্ছা ধরুন। দেখি তিনি আছেন কিনা।

মিনিটখানেক পরে নীরা এসে ধরলো ফোন। বললো,
—মামাবাবু?

—হ্যাঁ—কে? নীরা? হারাধন কোথায়?

—তিনি গেছেন ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবের জন্য কার্ড ছাপাবার ব্যবস্থা করতে। কেন মামাবাবু? কি এমন দরকার?

—অমিয়র চিঠি এসেছে। অতি জঘন্য চিঠি। আমি আর দেরী করতে চাইনে—কালই আমি সব ব্যবস্থা পাকা করতে চাই। সেই যদু না মধু কি যেন উকীলকে ডাকবে বলেছে—ডাকুক।

হারাধন চলে এল। গাড়ীটা ভাল নেই। কিন্তু এখন ওসব দেখা চলে না। নীরাকে তুলে হারাধন বিদ্যুৎ বেগে গাড়ী চালালো। পথে নীরাকে বললো,

—এ সুযোগ ছাড়া চলবে না—সাবধান।

—আমি সাবধানই আছি। তুমি সতর্ক হও। রাণী সাহেবা খুসী নন।

রাণী সাহেবা কি করবেন আমার ? মামার উইলটা হলেই অমন তিনটে ক্লাব আমি সৃষ্টি করবো। রাণীর ক্লাবে আর রুচি নেই।

—কেন ? কি হোল তাঁর ক্লাবে।

—তিনি কোন এক অফিসারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন—জানো! এখন তিনি চান—সেই লোকটিকে বিয়ে করে ঘর সংসার বাঁধবেন।

—তা তো ভালকথা! তোমাকে দিয়েই সেটা করতে চেয়েছিলেন তিনি। ভাগ্যিস আমি ছিলাম নইলে ঐ মায়ের বয়সীকেই নিতে হোত।

—আমি অত কাঁচা ছেলে নই নীরা। কিছু টাকার চেষ্টায় ছিলাম আমি।

—রাণী কিন্তু রেগে আছেন।

—থাকুন—কার কি বয়ে যায়।

গাড়ী এসে পৌছাল শ্যামবাজারে গ্রে-স্ট্রিট এক্সটেনসনে। নামলো দুজনে। উপরে গিয়ে দেখলো উকীল যদুবাবুর সঙ্গে অমরবাবু কথা বলছেন,

—নীরা খুবই ভাল মেয়ে। তাকে জন্মাতে দেখলাম বড় হতে দেখলাম। আমারই মেয়ের বয়সী। ওর বাবা ছিলেন খ্যাতনামা শিল্পী। ওরও শিল্প-প্রতিভা আছে। বাবা মারা যাওয়ায় শেখানো হোল না।

—হ্যাঁ—দেখেছি। তাই ঠিক করেছি ওকেই আনবো ভাগ্নেবৌ করে।

—খুব ভাল। ঘর আপনার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, দেখবেন। আজ-কালকার যা সব মেয়ে বিশেষ করে দক্ষিণ দিকের, আরে ছ্যাঃ! ওদের নিয়ে কি ঘর সংসার করা যায়—!

নীরার কথা মতই কথা বলছেন যদুবাবু—এরা এল 'এসো' বলে আহ্বান করলেন অমরবাবু। বললেন—অমিয় যে-চিঠি আমাকে লিখেছে পৃথিবীর কোন বাপ তা সহ্য করবে না।

—দেখি চিঠিখানা—

—সে আর দেখে কাজ নেই। শোন—উইলের খসড়া আমরা করলাম—

"আমার অবর্ত্তমানে আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান অমিয় গাঙ্গুলীর প্রাপ্য কিন্তু সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক অপবিত্র বংশের কন্যা এবং অসচ্চরিত্রা মেয়েকে বিবাহ করার জন্য এবং তার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে অসম্মত হওয়ার জন্য আমি নিম্নলিখিত শর্তে আমার সমস্ত সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করলাম—আমার পুত্র অমিয়কে তার বর্ত্তমান বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পুনরায় যোগ্যা কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। এইজন্য তাকে দুবছর সময় দেওয়া হোল—পুনরায় বিবাহের পর সে আমার দেবোত্তর ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিক হতে পারবে। যতদিন সে তা না করে ততদিন আমার সম্পত্তির সব কিছু দেখাশোনা এবং দেবসেবার ভার আমার সুযোগ্য ভাগিনেয় শ্রীমান হারাধন ঘোষালের উপর থাকবে।

যতদিন অমিয় শর্ত না মানবে ততদিন সে মাসিক মাত্র হাজার টাকা বৃত্তি পাবে—যদি দুবছর পরেও সে আমার কথামত কাজ না করে তাহলে সে আমার সম্পত্তির কিছুই পাবে না—যাবতীয়

সম্পত্তির দখলিকার হবে আমার ভাগিনেয় শ্রীমান হারাধন ঘোষাল এবং তার বিবাহিতা পত্নী ও তাদের সন্তান-সন্ততি·······

—বাঃ !

শব্দটা অকস্মাৎ বেরিয়ে গেল মুখ থেকে হারাধনের কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে বললো,

—কাজটা কি ঠিক হোল মামা ? সে আপনার ছেলে—

—না—যে ছেলে এমন করে বাপের অপমান করে তার শিক্ষা হওয়া উচিৎ। তাকে কিছু শাস্তি দেবই আমি। আর ঐ উল্লুকে আমি বাড়ী ঢুকতে দেব না—

—অঞ্জনার জন্য কি ব্যবস্থা ?

—কিছু না—অঞ্জনা ভালই আছে। তার আবার কি চাই ?

—ওকে কিছু নগদ····

—না—নগদ যা থাকবে সব আমার নীরা-মার থাকবে। খুব বেশী নেই—যা আছে কোম্পানীর কাগজে আর গভর্ণমেণ্ট লোনে খাটছে। হাজার চল্লিশ-পঞ্চাশ আছে ব্যাঙ্কে।

—কেন মামা ? অত কম ?

কথাটার জবাব দিলেন না অমরবাবু। উকীল যদুবাবু বললেন,

—উইল করা থাকলো। কিন্তু আর একটা শর্ত আমি দিতে চাই।

—বলুন—অমরবাবু বললেন।

—ছেলে যদি আপনার শর্ত মেনে নেয়, তো তখন কি ব্যবস্থা হবে হারাধনের ? তার জন্য কিছু একটা করুন আপনি।

—অবশ্যই করতে হবে। হারাধন যাবজ্জীবন হাজার টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি পাবে এষ্টেট্ থেকে—কেমন ?

—আমার জন্য কিছু দরকার নেই মামা; আপনার আশীর্ব্বাদে আমি খেটে খাব—হারাধন বললো কথাগুলো।

—না-না—তা কি হয়। অমিয় শর্ত না মানলে তো সবই তোমার রইল—

—ঈশ্বর না করুন, অমিয় যদি মারা যায়?—যদুবাবু বললেন।

মুখখানা কেমন হয়ে উঠলো অমরবাবুর। সামলে বললেন,

—তাহলে হারাধনেরই সব থাকবে। সেই দেখবে সব। কথাটা খুব জোরে বেরুলো না ওঁর মুখ দিয়ে। কিন্তু যদু উকিল লিখে দিলেন।

পরদিন যথাসময়ে উইলটা রেজেষ্টারী হয়ে গেল।

সন্তানকে কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার। অবাধ্য সন্তান অঙ্গে বিষ ছড়ায় এই হচ্ছে সুচিন্তিত অভিমত অমরবাবুর—তাই তাকে অগ্রাধিকার দিলেন তিনি এবং গুরুত্ব আরোপ করলেন হারাধনেব বিবাহ ব্যাপারটার উপর। কারণ ঘরে আর মেয়ে নেই। অঞ্জনা সেই যে গেছে আর আসেনি। তাকে অবশ্য ডাকেনও নি অমরবাবু। যাক—অবাধ্য সন্তান যাক সব। যদুবাবুকে তিনি বলেইছেন যে নীরাকে আনার ব্যাপারটাতেই তিনি এখন গুরুত্ব আরোপ করছেন।

উইলটা রেজেষ্টারী করে অমরবাবু নিশ্চিন্ত হয়েছেন। হারাধন তাঁর সুযোগ্য ভাগিনেয়। এখন তার বিয়েটা দিতে পারলেই বাকী কাজ শেষ করে তিনি হরিনামের ঝোলা ঘোরাবেন, না হরিনাম তিনি করেন না—ওটা কথার কথা। ঝোলা-মালা সব সে-যুগের ব্যাপার।

অমিয় ফিরে আসতে পারে শিগ্রি। তারও বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ভাল একটি মেয়ে দেখবেন তিনি। কিন্তু মনে পড়লো

উকীল বলে গেছেন নতুন যা আইন হয়েছে তাতে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য বিবাহ নিষিদ্ধ। সেই প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে অন্ততঃ দুটি বছর সময় লাগবে। এই আশ্চর্য্য আইন হচ্ছে আজকাল। তাঁদের সময় তো এসব ছিল না। যার যতটা খুসী বিয়ে করতে পারতো। সেকালে এই বাংলা দেশেই এমন একদল লোক ছিল, যাদের পেষাই ছিল বিয়ে করা। শ'খানেক বিয়ে তারা করতো। সে তো খুব ভাল নিয়ম ছিল। এসব দিনে দিনে হচ্ছে কি ? দেশে তো আর টেকা যায় না।

কিন্তু কি করা যায়। দেশত্যাগ করা তো আর সম্ভব নয়। আর আইন যখন হয়েছে তখন না মেনেও উপায় নেই। অতএব অপেক্ষা করতে হবে দু'বছর।

অতি দুঃখিত চিত্তেই ভাবছিলেন তিনি এইসব কথা। ভেবে কি করবেন—আপাততঃ নীরাকে এনে বাড়ীটার শোভা বর্দ্ধন করা যাক—মেয়ে না থাকলে বাড়ী মানায় না। নীরা খুবই ভাল মেয়ে। সে ইতিমধ্যেই মা'র ঠাকুর ঘরের কাজ বুঝে নিয়েছে ; পুরুতঠাকুরকে দিয়ে কত কি করায়। ঠাকুর সেবার কাজ সে ভালই জানে। সন্ধ্যার দিকে এলে আগেই ঠাকুর ঘরে যায়—শাঁখ বাজায়—সন্ধ্যাদীপ জ্বালে—হ্যাঁ—খুবই ভাল মেয়ে নীরা। ঐ রকমই তিনি চেয়েছিলেন। অসিতবাবু বন্ধু হয়েও তাঁকে প্রতারিত করেছেন উলু নামে ঐ রাস্তার মেয়েটাকে তাঁর ঘরে ঢুকিয়ে। ভাগ্যিস হারাধন ছিল নইলে অমরবাবুর পৈত্রিক ভদ্রাসন অপবিত্র থেকে যেতো, তাঁর বংশ কলঙ্কিত হোত—তাঁর রক্ত ··

হঠাৎ বাধা পেলেন অমরবাবু। ঢুকলেন এসে তাঁর পুরোনো ম্যানেজার দয়াল রায়। নমস্কার করে বললেন,

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম স্যার—

—বলুন।

—চাঁদকোনায় আপনার যে বাড়ী, বাগান আর ধান জমি আছে সেটাও কি হারাধন বাবুর হবে ?

—না। ওটা তো মাতামহের সম্পত্তি। ওর সঙ্গে আমার পৈত্রিক সম্পত্তি আমি জড়াতে চাইনে। ওখানকার জমি জায়গা সব দেব-সেবার জন্য। ওটা তেমনি থাকবে।

—হ্যাঁ, কিন্তু একজন সেবাইত তো দরকার ? সে কি হারাধন বাবুই হবেন ?

—হ্যাঁ—হারাধনই হবে।

—কাজটা কি ঠিক হবে স্যার ?

ম্যানেজার অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "সবই হারাধনবাবুর হোক। তিনি আপনার স্নেহপাত্র কিন্তু স্যার, আমরা—আমি অন্ততঃ গিন্নীমার আমলের লোক। বহুদিন আছি এই সংসারে। হারাধনবাবু সবই—সবই নিলেন, অমিয় আর অঞ্জনার কি কিছুই থাকবে না ? সব কিছুর মালিক হবেন হারাধনবাবু ?"

—মালিক সে হবে কেন ?—অমরবাবু ধমকের সুরে বললেন, মালিক যে হবার সেই হবে, অমিয়ই মালিক হবে—শর্তটা পালন করা চাই।

—ঈশ্বর তাই করুন স্যার কিন্তু যে উইল আপনি করলেন তার ফলাফল কি দাঁড়াবে আমার জানা নেই।

—আপনি কি বলতে চান যে অমিয় আমার শর্ত মানবে না ?

—ঈশ্বর না করুন—মানার সুযোগ তিনি নাও পেতে পারেন স্যার। সম্পদের লোভ বড় লোভ—বিষয়-সম্পদের জন্য মানুষ কি না করে ? ধরুন—অমিয়কে যদি আপনার শর্ত মানার সুযোগ না দেওয়া হয়—যদি সম্পত্তির লোভে কেউ তাকে · থাক স্যার আমার হয়তো অনধিকার চর্চ্চা হচ্ছে—মাফ্ করবেন।

—আপনি কি বলতে চান, বলুন—অমরবাবু সাহস দিলেন। দয়ালবাবু বললেন,

—আমি বলছি বর্দ্ধমান জেলার ঐ চাঁদকোনা গাঁয়ের অতি সামান্য ক'বিঘে ধান জমি আর বাড়ীখানা অমিয়র থাক—ওটাতে যেন হারাধনবাবু আর না ঢোকেন।

—তাহলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না দয়ালবাবু। আমি চাই অবাধ্য পুত্রকে শাস্তি দিতে। অমিয়র সবই থাকবে কিন্তু আমাব শর্ত তাকে মানতে হবে।

প্রবীন ম্যানেজার দয়ালরামের চোখ একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেই আবার শান্ত হযে গেল। তিনি একটু থেমে একটু ভেবে বললেন,

—আপনার শর্ত যদি তাকে মানতে না দেয় কেউ? যদি তাকে—যদি তাকে আটকে রাখা হয়? যদি তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয় কেউ?

—আপনি কি বলছেন দয়ালবাবু?

—বলতাম না। গিন্নিমা আমাকে এ-বাড়ীতে আনেন। আর অমিয় অঞ্জু গিন্নিমার বড় আদরের ধন, তাই বললাম কথাটা, মাফ্ করুন। সম্পত্তির জন্য ছেলে বাপকে খুন করতে পারে, করেও। হারুবাবু তো ভাগনে আপনার—যাক, আমার আর কিছু বলবার নেই।

দয়ালবাবু চলে গেলেন কথাটা বলেই। অমরবাবু ভাবছেন—অমিয় যদি অমরবাবুর শর্ত না মানে! যদি সে উলুকে নিয়েই ঘর বাঁধে—না-না তা হতে পারে না—তা কি হয়? তাঁর এতোবড় সম্পদ—তা কি কেউ ছাড়ে? অমিয় নিশ্চয় এতো আহাম্মক হবে না—

কিন্তু দয়ালবাবু যা বললেন—হ্যাঁ যদু উকিলও বলেছিলেন, "ঈশ্বর না করুন যদি অমিয় মারা যায় তো সব সম্পত্তি হারাধনের থাকবে"—হারাধনই মালিক হয়ে যাবে অমরবাবুর

পৈত্রিক সম্পদের। অমরবাবুর সাত পুরুষের জমিদারী রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাঁরই পূর্ব্ব পুরুষরা ছিলেন লাঠিয়াল জমিদার। সম্পদের জন্য বহু-কিছুই করতেন তাঁরা "সম্পদের জন্য ছেলে বাপকে রেহাই দেয় না" এ ইতিহাস। হারাধন যদি মেরে ফেলে অমিয়কে? না-না-না এসব কি ভাবছেন তিনি? তা কি কখনো হতে পারে? হারাধন তাঁর অতি বিশ্বাসী আত্মীয়—ভাগিনেয়—তিনি হারাধনকে মানুষ করেছেন, বিলাত পাঠিয়ে এঞ্জিনীয়ার করে এনেছেন; টাকা দিয়ে কারখানা করে দিয়েছেন—হারাধন কি বিশ্বাসঘাতকতা করবে? না।

রাত অনেকখানা—এগারটা বাজছে ঘড়িতে। এবার তিনি উঠবেন। অন্যদিন এতক্ষণ উঠে যান। আজই ম্যানেজার আসার জন্য দেরী হোল। ম্যানেজার যা বললেন—কথাটা যেন অমরবাবু ভুলতে পারছেন না। হারাধনের উপর ম্যানেজার দয়ালের বিশ্বাস নেই, তাই ওকথা বললেন। অমিয়কে ওঁরা ভালবাসেন। হারাধন কিছু ফ্যালনা নয় তাঁর কাছে। কোথায় হারাধন—এখনো ফেরে নি?

—হারাধন ফিরেছে কি না দেখে আয়তো রামচরণ।

—আজ্ঞে না—ফেরেন নি তিনি।—রামচরণ জানালো।

অমরবাবু উঠে যেতে যেতে কি ভেবে ফোনের ডায়েলটা ঘুরিয়ে যুবশ্রী ক্লাবকে ডাকলেন। ওপাশ থেকে সাড়া এলে বললেন,

—হারাধনবাবুকে একবার ডেকে দিন তো।

—তাঁকে তো আজ এখানে দেখিনি স্যার—হয়তো আসেন নি।

—সেকি!—কোথায় গেল তাহলে?

—জানি না স্যার—হয়তো রাণী সাহেবা জানতে পারেন।

—তাঁকে দিন ফোনটা—বলুন আমি অমর, হারাধনের মামা কথা বলছি।

রাণী নিপুনিকা উঠবেন ; আজকার মত ক্লাব বন্ধ হচ্ছে। হঠাৎ ফোন এল। বিরক্ত হয়েই রিসিভারটা ধরলেন তিনি।

—হ্যালো!

—আমি অমর—নমস্কার। হারাধন কি আজ যায় নি ওখানে?

—আজ্ঞে না, ওঁরা মানে মিঃ ঘোষাল আর মিস নীরা গেছেন তাঁদের বর্দ্ধমান জেলায় কোথায় যেন বাড়ী, বাগান আছে তাই দেখতে। রাত্রেই ফিরবেন বলেছেন।

—সে কি? আমি তো জানিনে কিছু।

—হয়তো আপনাকে বলবাব সময় পাননি। এখন তো মিঃ ঘোষালই আপনার সবকিছু দেখছেন। নীরাকেও নিলেন আপনি। খুবই আনন্দের কথা। নীরার জন্য আমরা সত্যি ভাবতাম। আপনার এই সৎসাহসের জন্য আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। নীরা ভেসে যাচ্ছিল, আপনি তাকে কূলে তুলছেন। খুব ভাল, খুবই আনন্দের কথা। বিয়ের দিন কবে হোল? রেজিষ্টারী হতে হবে তো বিয়েটা?

—তেরই দিন হয়েছে। কিন্তু রেজিষ্টারি কেন হবে? সৎসাহসই বা কি দেখালাম আমি?

—সৎসাহস নয়? কি বলছেন? নীরার যে আবার বিয়ে হবে, আপনার মত প্রাচীন পরিবারে হবে তা কেউ ভাবিনি আমরা। নীরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করার জন্য আপনাকে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উদার ব্যক্তি বলে মনে করি।

—কেন কেন? নীরা কি এমন?

—সেকি? আপনি নিশ্চয় জানেন তার পূর্ব্ব ইতিহাস?

—না, বিশ্বাস করুন আমি কিছুই জানিনে—বলুন রাণী সাহেবা।

—ও—জানেন না। আমরা ভেবেছি আপনি সব জেনেই এই সৎসাহসের সৎকর্ম করছেন। হারাধনবাবু কিছু বলেন নি?

—না, আপনি দয়া করে বলুন।

—কি আর বলবো—নীরা হাফ্‌গেরস্থর মেয়ে—ওর বাবা ছিল একজন কারিগর—বাড়ীটা নিজের। প্রথম নীরা কোন একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ছাড়ে—তারপর সুরঞ্জনা ক্লাবে অসিতবাবুর ছেলেকে ধরে। এরপর মিঃ সিকো নামে একজন বিদেশী তাকে নিয়ে চলে যায়। সেখানে তাকে ছেড়ে মিঃ সিকো কোথায় সরে পড়েন। নীরা তখন ছিল সন্তান-সম্ভবা—ভাগ্যক্রমে আমি সেখানে ছিলাম। টাকা কড়ি খরচ করে সেই বিদেশ থেকে তাকে ফিরিয়ে দেশে পাঠাই। তার মেয়েটিকে এক অনাথ আশ্রমে রাখা হয়। এর পর এই ক্লাব করে আমি ওকে একটা কাজ দিয়ে রেখেছি। ওর অনেক গুণ; ভাল গাইতে পারে অভিনয়েও ভাল সুন্দর নাচে আর চেহারা তো দেখছেনই, উর্ব্বশী—মেনকা—রম্ভা হার মানে। হ্যালো হ্যালো—শুনছেন স্যার—আপনার সৎকর্মের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি—এমন মেয়েকে যে আপনি ঘরের বৌ করছেন—এর জন্য পৃথিবীর নারী-জাতির তরফ থেকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। হ্যালো হ্যালো…

নাঃ—সাড়া এলো না। একটা কি যেন পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনলেন রাণী নিপুনিকা। রিসিভটাই হয়তো পড়ে গেছে অমরবাবুর হাত থেকে কিম্বা অমরবাবু স্বয়ং পড়ে গেলেন? যা হয় হোকগে। রাণী ফোনটা রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। চোখ তাঁর জ্বলছে। সুযোগটা যখন হাতের কাছেই এসে গেল তখন ছাড়া উচিত নয়। নীরা সম্বন্ধে অমরবাবুকে কিছু জ্ঞান দান করলেন তিনি। রাণী সাহেবা বাড়ী চলে গেলেন।

অমরবাবু রাণীর একটানা কথাগুলো শুনছেন। গভীর রাত্রের ফোনে আওয়াজ খুব পরিষ্কার—খুবই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, তাঁর মস্তিষ্ক আলোড়িত করে জাগছে শুধু একটি মাত্র চিন্তা—হারাধন সব

জানে। জেনে তাকে প্রতারিত করেছে—সেই হারাধনকেই করলেন তিনি তাঁর পৈতৃক সব কিছুর অধিকারী—না না কালই তিনি উইল বদলাবেন—মাথাটা ঘুরে পড়ে গেলেন অমরবাবু।

হারাধন নীরার সম্বন্ধে কিছু জানে না—তা নয়—প্রায় সবই সে শুনেছে, শুধু বিদেশে কি করে এসেছে তার সঠিক খবর তার জানা নেই। সেটা জানেন শুধু রাণী নিপুনিকা। যুবশ্রী ক্লাবের আর কারো অতখানা জানার কথা নয় কারণ অত দূর দেশের টুকুরো খবর এখানে আসবে না। রাণী তখন ওখানে ছিলেন—তাই সবটাই জানেন—কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক এ পর্য্যন্ত কিছু বলেন নি। হারাধনের সঙ্গে নীরার প্রেমজীবন ক্রমশঃ ঘোরালো হচ্ছে—প্রত্যক্ষ করছেন তিনি।

নীরার সব সময় ভয়—রাণী যদি হারাধনকে নীরার বিদেশের কীর্ত্তি-কাহিনী জানিয়ে দেন তো নীরার পক্ষে খুব অসুবিধা ঘটবে। তাই সে যথাসম্ভব হুঁসিয়ার থাকে এবং ক্লাবে হারাধনকে চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করে। ইদানিং সে ক্লাবে যাওয়া খুব কমিয়ে দিয়েছে কারণ হারাধন এখন মামার বিষয় সম্পদ দেখবার জন্য ব্যস্ত—আর নীরাও চায় নিপুনিকার সান্নিধ্য এড়াতে।

আজ হারাধন নীরাকে নিয়ে গেল বর্দ্ধমান জেলার একটা গ্রামে। গ্রামটার নাম চাঁদকোনা—গণ্ডগ্রাম। এখানে অমিয় আর অঞ্জনার মামার বাড়ী—মামা মামী নেই—যা কিছু আছে সব অমিয় আর অঞ্জনাই পাবে। গ্রামটা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পাশে।

মোটরে বরাবর গিয়ে মাত্র আধমাইলটাক কাঁচা পথ পার হয়ে গ্রামে ঢুকতে হয়। সে টুকুর জন্য পাল্কী বা গোরুর গাড়ী অথবা পাঁয়ে হাঁটা ছাড়া উপায় নাই। একটা খাল পার হতে হয়।

এইজন্য পথ তৈরী করা হয় নি। বাঁশের পুল আছে। হারাধনের অবশ্য এ গ্রাম আগেই দেখা আছে, নীরাকেই দেখাতে এনেছে। ইচ্ছে আছে আজ রাতটা এখানে থাকবে—ভাল করে পুকুরের টাটকা মাছ খাবে কারণ ঐ বস্তুটি অনেকদিন সহর থেকে লোপ পেয়েছে। হারাধন নীরাকে নিয়ে পৌঁছাল।

ওখানকার নায়েব গোমস্তা এবং চাকর বাকর যারা আছে তারা অভ্যর্থনা করলো ওদের। সবাই জেনেছে উইলের কথা এবং হারাধনই যে বর্তমান মালিক তাও জেনেছে সুতরাং তাদের সম্মান যথোপযুক্তই হোলো এখানে। নীরা যে অবিলম্বে এ বাড়ীর বধূ হবে তাও জেনেছে সকলে। হ্যাঁ—সুন্দর চমৎকার!

হারাধন কিন্তু ভাবছে অন্য কথা। সব জেনেও নীরার মত মেয়েকে বিয়ে করে ঘরের বৌ করবার ইচ্ছে হারাধনের কোনো দিনই নেই—তবু সে নীবাকে নিয়ে এতদূব এগিয়েছে তার একমাত্র কারণ মামা অমরবাবু। উলুকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়ার পর যখন অমরবাবু বললেন যে তিনি অবিলম্বে হারাধনের বিয়ে দিয়ে বৌমা আনবেন—তখন হারাধন নীরাকেই এনেছিল—সেই তখন হাতে ছিল তার—কিন্তু হারাধনের এখন আপশোষ হয়—এটা সে না করে মামার হাতে তার বধূ নির্ব্বাচনের ভার দিলে ভাল হোত।

তবে এটা ঠিক যে অমরবাবুর মত আহাম্মক ধনীকে ভুলিয়ে কাজ হাসিল করার জন্য নীরাই যথোপযুক্ত মেয়ে—তাই হারাধন নীরাকে এনেছিল—কাজও হাসিল হয়েছে। নীরাকে বিয়ে করে ঘরের বৌ করবার ইচ্ছে হারাধনের কোনোদিন নেই অথচ এমন এক পরিস্থিতিতে সে পড়েছে যে নীরাকে ছাড়াও মুস্কিল। নীরা সুকৌশলে অমরবাবুর মনটি দখল করে নিয়েছে এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে অমরবাবু সবই ঠিক করে বিয়ের দিন পর্য্যন্ত করে

বসেছেন। হারাধনের ইচ্ছে ছিল—মামা উইলটা করুন তারপর নীরার স্বরূপ সে জানিয়ে দেবে—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। নীরাকে ছাড়তে গেলে নীরাই হয়তো অমরবাবুকে তার চক্রান্তের কথা জানিয়ে দিতে পারে। হারাধন এখন করবে কি? এই চিন্তাটা করবার জন্যই সে এল এখানে আজ। নীরাকে আনবার ইচ্ছে তার গোড়ায় ছিল না—কিন্তু শেষ অবধি আনলো। তার চক্রান্তের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই যায়গাটা কাজে লাগাতে হবে—নীরাকেই সাথী করবে—তাই আনলো।

উইল হয়ে গেছে, এখন আর নীরার কি দরকার? অমরবাবুকে হারাধন বলবে যে নীরাকে বিয়ে সে করবে না—ও বিয়ে বাতিল হোক। কিন্তু নীরা তাকে সহজে ছেড়ে দেব না—সে সাংঘাতিক কিছু করে বসতে পারে। হয়তো আদালতের সাহায্য নিতে পারে। তার মা যে কি রকম মেয়ে তা ভালই জানে হারাধন। সুতরাং নীরাকে বিয়ে তার করতেই হবে, অন্য আর উপায় নেই। হারাধন ভাবছিল এই সব কথা বসে বসে। নীরা তখন গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করছে শিবমন্দিরে।

হারাধন একালের ছেলে বিলাত ফেরৎ আপ টু-ডেট যুবক—নীরার পূর্ব্বজীবন নিশ্চয় ঘাঁটাঘাঁটি করা দরকার বলে মনে করেনা। ওসব সেকেলে সতীত্ব-মতিত্ব নিয়ে হারাধন মাথা ঘামায় না। ওগুলো পুরাতন জীর্ণ সমাজ-ব্যাধি বলেই ওরা মনে করে। তবু হারাধন নীরাকে বিয়ে করে ঘরের বৌ করতে চায় না কেন তার কারন নীরার চরিত্রের একটা বিশেষ দিক সে জেনেছে, সেটা হচ্ছে—নীরার স্বার্থপরতা। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে নীরা যে-কোনো কাজ করতে পারে, এমন কি প্রয়োজন হলে হারাধনকে অগাধ জলে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারে নিরাপদে—হারাধনকে জেলে ভরে

দেওয়াও তার পক্ষে কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। এবং হারাধন মনে করে দেখলো, এই সামান্য সময়ের মধ্যে নীরা হারাধনের এমন সব কথা প্রমাণ সহ জেনেছে যে তাকে ছাড়তে যাওয়া মানে বিপদকে আলিঙ্গন করা। নীরাকে তার নিতেই হবে জীবনে বরণ করে—হারাধন এই কথাই ভাবছিল।

—সেলাম হুজুর।

—সেলাম—

হারাধন তাকিয়ে দেখলো অমিয়র মামার আমলের লোক নাথু সর্দার—জমিদারী আমলে এখানে কাজ করতো। হারাধন শুধোলে,

—কেমন আছ নাথু? কোথায় আছ এখন?

—হুজুর মা-বাপ—আছি ঘরেই—কাজ নেই, বেকার আছি। হুজুর এসেছেন শুনে দেখা করতে এলাম।

—খুব ভাল করেছ। কাজ নেই কেন?

—জমিদারি নেই কাজ কি থাকবে। আমার কাজ তো ছিল—জানেন হুজুর—চোর বদমাসদের জব্দ করা—এখন তো সব কোম্পানী করছে।

—হ্যাঁ—তা হোক, আমি তোমাকে আবার কাজ দেব। থাক এখানে।

—হুজুর মা-বাপ—হুজুরের চাকর আছি—যা হুকুম করবেন।

—ঠিক আছে। থাক—এই নাও কিছু বকসিশ। দশটা টাকা দিল হারাধন। নাথুকে পেয়ে খুবই খুসী হোল হারাধন। এরকম বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিরল। অমিয়র দাদুর আমলে এরাই সব ছিল তাঁর ডান হাত। বহু বৈষয়িক কাজে নাথুই তাঁকে সাহায্য করেছে। জবর দখল বা খাসদখল এবং কোন প্রজাকে উচ্ছেদ আদি করার ব্যাপারে নাথুর মূল্যবান সাহায্য এ পরিবারের ইতিহাসে লেখা থাকবার কথা। পরিবারের এখন

কেউ নেই। অমিয় আর অঞ্জনা এখানে কদাচিৎ এসেছে সুতরাং নাথু তাদের ভাল চেনে না। সে শুনেছে যে অমরবাবুর ভাগে হারাধনবাবুই বর্ত্তমান মালিক এবং তিনি আজ এসেছেন। অতএব তাকে যদি রাখেন এই জন্যই সে আজ এসে সাক্ষাৎ করলো। হারাধনের পৈত্রিক বাড়ী এই চাঁদকোনার কাছাকাছি ছিল এবং সম্পর্কে এই জমিদার তারও দাদু হতেন। তাই নাথু হারাধনকে ভাল চেনে।

নাথুকে পেয়েই হারাধন কি একটা প্ল্যান ভেবে নিল। বললো,

—মাসে তোমাকে টাকা পঁচিশ করে দেব আমি। আজ থেকে কাজে বহাল হলে। তোমার মাইনে আমি কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেব মনিঅর্ডারে। এখানে তোমাকে মাইনে নিতে হবে না।

—আমি কলকাতা গিয়ে মাইনে নিয়ে আসবো হুজুর; মনিঅর্ডারের কি দরকার?

—ঠিক—তুমি যাবে, মাসের গোড়ার দিকে যেও। কিন্তু না—হারাধন কি ভেবে বললো—না নাথু তোমার মাইনে আমি ডাকে পাঠাব। তোমাকে যে আমি বহাল করলাম তা কাউকে জানাবে না, কেমন?

—যো হুকুম হুজুর—

নাথু যেন মুহূর্তে বুঝে নিল ইঙ্গিতটা। বললো,

—হাম সমঝ লিয়া—

—আচ্ছা।

অতঃপর ভেতর থেকে খাবার ডাক এল। হারাধন গিয়ে টেবিলে বসলো নীরার সঙ্গে। খেল টাটকা মাছ দিয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য যার আয়োজন এখানকার নায়েব গোমস্তা করেছেন। কলকাতায় যা বহুদিন দেখা যায় নি; টাটকা খাঁটি শাকশব্জী মাছ খেয়ে দেয়ে ঘুমানো দরকার কিন্তু এখানে অসুবিধা ঘটবে। বহুদিন-পড়ে-থাকা

অব্যবহৃত ঘর, বিছানা পত্র সব ভাল নেই। মশার উৎপাত ছাড়া আরশুলার উৎপাত এবং ইঁদুরের উৎপাতও কম নয়। নীরার খুব বিরক্তি বোধ হচ্ছে। বলল,

—চল—রত্রেই চলে যাই।

—যেতে পারি—কিন্তু এই কাঁচাপথটা পেরুবে কি করে?

—গাড়ীটা কোথায় আছে?

মোড়ের মাথায় যে চায়ের দোকানটা আছে সেখানেই গাড়ীটা রেখে এসেছি। দোকানীকে একটা টাকা দিতে হবে কাল। গাড়ীটা রাত্রে সে দেখবে।

—থাক, ভোরেই যাব তাহলে। কিন্তু ঘুম হবে না আমার।

—খুব হবে—ঘুমিয়ে যাও—মশারী তো রয়েছে, আর কি?

নীরার কিন্তু ঘুম হোল না। সে এরকম পাড়াগাঁয়ে কখনো আসেনি, কখনো রাত্রিবাস করেনি। তাছাড়া এখানে কেউ না থাকার জন্য বাড়ীঘর সব জঙ্গল হয়ে আছে, তাই আরো খারাপ লাগছে। তবু রাত কাটলো। অতি সকালেই ওরা রওনা হয়ে গেল কলকাতা। পথে নীরা প্রশ্ন করলো,

—এটাও তো উইলের মধ্যে আছে?

—না—এটা জবর দখল করতে হবে।

—দরকার নেই—এ নিয়ে কি হবে? যাক গে।

—না—এটার খুব বেশী দরকার।

—কেন—

অতি মৃদু কণ্ঠে হারাধন কতক গুলো কথা বললো নীরাকে। নীরা সব শুনে অবশেষে বললো—কাজটা খুব বিপজ্জনক—

—হোক, তুমি সহায় থাকলেই সব ঠিক হবে। এটা দরকার। মামাকে যা-করে হোক ভুলিয়ে এখানে আনতে হবে। তা যত শীঘ্র পার ততই ভাল—অমিয় ফেরার আগেই চাই।

—চল তো দেখি। কিন্তু তিনি কি আমাদের বিয়ের আগে আসতে চাইবেন? বোধ হয় না।

—তুমি বললেই চাইবেন। তুমি তো তাঁকে যাদু করে ফেলেছ। বলবে যে পল্লীগ্রাম দেখতে ইচ্ছে করে তোমার। মন্দির, ঠাকুর, পূজা সব দেখবে।

—আজ যে এলাম, দেখলাম।

—এ আসার খবর তিনি জানেন না।

—তাঁকে এনে—না—বিয়ের পর ওটা কর—

—আগেই হয়ে যাক, বিয়ে তো হাতে আছে। করলেই হবে।

নীরা চুপ করে রইল। গাড়ী ফিরছে।

চাকরটা ছুটে এল, রিসিভারটাই শুধু পড়ে নি স্বয়ং অমর বাবুই পড়ে গেছেন টেবিলের পাশে। চীৎকার করে ডাক দিল সে সকলকে,

—আসুন আসুন, বাবু অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ছুটে আসুন সব।

বাড়ীতে থাকে হারাধন সে অনুপস্থিত। বাজার সরকার আর জন দুই চাকর একটা ঝি ছাড়া অন্য লোক নেই কেউ। দেউড়ীতে আছে দুজন দারয়ান। বাজার-সরকার চিত্তবাবু এলেন চাকরদের সাহায্যে তিনি তুললেন অমরবাবুকে— শোয়ালেন এবং ডাক্তারকে খবর দিলেন। অঞ্জনাকেও খবর দিলেন চিত্তবাবু টেলিফোন করে। অঞ্জনা শুয়েছিল, এতরাত্রে হঠাৎ টেলিফোনে বাবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া শুনে কাঁদতে লাগলো। ওর শ্বশুর শিবদাসবাবু বললেন,

—চল, আমি তোমায় পৌঁছে দিই।

অঞ্জনা এসে দেখলো ডাক্তার এসেছেন, দেখছেন অমরবাবুকে। দেখে তিনি কি যে বললেন, ঠিক বোঝা গেল না। কথাগুলো ইংরাজি ভাষায় ডাক্তারী ভাষায় বললেন তিনি, অঞ্জনা কিন্তু তাতেই দমে গেল। বাবার অসুখ সাংঘাতিক। সে জিজ্ঞাসা ক'রলো,
—বাঁচবেন তো?

—চেষ্টা তো করা যাক—ঠিক কিছু বলা যায় না। পড়ে না গেলে ভাল হোত।

ভাল তো হোত কিন্তু পড়েই তিনি গেছেন। প্যারালিসিস্ তো হবেই আরও কিছু ঘটতে পারে—জীবন সংশয় ব্যাপার!

যমে মানুষে টানাটানি চললো। জ্ঞান নেই অমরবাবুর। মাঝে মাঝে চোখ অবশ্য খুলছেন—ঘোলাটে চোখ—কাকে যেন খুঁজছেন। খুব সম্ভব হারাধনকে। হারাধন নেই। বাজার সরকার চিত্তবাবু বললেন,—তোমাকেই হয়তো খুঁজছেন মা অঞ্জনা।

অঞ্জনা সামনে এসে দাঁড়ালো—না, চিনতে পারলেন না অমরবাবু। কী অসহ্য কষ্ট যে উনি পাচ্ছেন কে জানে! অব্যক্ত বেদনাটা শুধু মুখে চোখে পরিস্ফুট হচ্ছে। অসহায় ভাবে চারদিকে তাকাচ্ছেন। অঞ্জনা বললো চিত্তকে,

—হারুদাকেই খুঁজছেন বাবা। কোথায় তিনি গেছেন?

—জানি না মা—হয়তো কলকাতার বাইরে গেছেন।

—পড়ে যাবার আগে কারো সঙ্গে কোনো কথা বলছিলেন?

কেউ বলতে পারলো না কার সঙ্গে অমরবাবু কথা বলছিলেন। কারণ—চাকরটা থাকলেও বাবু কার সঙ্গে কথা বলছেন নিশ্চয় সে জানবে না, সে শুধু বললো—'রাণী সাহেবা' কথাটা আমি শুনেছি বাবুর মুখ থেকে।

রাণী সাহেবার নাম জানে অঞ্জনা—উলুর কাছে শুনেছিল।

ঐ রাণী সাহেবার ক্লাবে উলুকে নিয়ে গিয়েছিল হারাধনদা। তাহলে রাণী সাহেবাই বাবাকে এমন কিছু বলেছেন যা শুনে বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। কী এমন কথা? কি তিনি বলেছেন? অঞ্জনা ফোন ডাইরেক্টারী খুঁজে রাণী সাহেবার নম্বর বের করলো, ডাকলো তাঁকে ফোনে। ডেকে বললো,

—আমি অমরবাবুর মেয়ে অঞ্জনা। আপনি কি গতরাত্রে বাবার সঙ্গে কথা বলেছিলেন ফোনে?

— হ্যা—কেন? কি হোল তাতে?

—বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কি আপনি তাঁকে বলেছিলেন?

—বিশেষ তো কিছু না, তিনি শুধোলেন হারাধনবাবু ওখানে আছেন কি না—আমি বললাম নেই—এই তো মাত্র কথা।

—ও—আচ্ছা নমস্কার।

অঞ্জনা কিছুই বুঝতে পারলো না। রাণী সাহেবা যে মিথ্যা কথা বলবেন, তা তার ধারণাতেই এল না। অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করছেন অমরবাবু। আট দশ ঘণ্টা হোল। হয়তো জ্ঞান ফিরেছে তার কিন্তু কথা তো বলতে পারছেন না। কী এক বেদনাভরা চোখ মেলে চাইছেন—দেখলে কান্না পায়।

হারাধনের গাড়ী এসে পৌঁছাল, নামলো হারাধন। নীরাকে বাড়ীতে রেখে এসেছে। এসেই শুনলো সব ব্যাপার।

—কি সর্ব্বনাশ—কখন হোল এ ঘটনা?—প্রশ্ন করলো হারাধন

—কাল রাত এগারটার পর—চিত্তবাবু জবাব দিলেন।

—কি ভাবে কি হোল? কে ছিল কাছে?

—চাকর রাম—শুনলাম রাণী সাহেবাকে ফোন করে আপনারই খোঁজ করছিলেন উনি। হঠাৎ পড়ে যান। তারপর এই—

হারাধন দেখলো অমরবাবুর বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। জ্ঞান থাকলেও তাতে আর কোন কাজ হবে না। অন্তরের আনন্দ গোপন করে মুখখানা যথাসাধ্য শুষ্ক করে সে বললো,

—হায় হায় কি হবে! কোনো বকমে ওঁকে বাঁচান ডাক্তারবাবু। অমিয়কে খবর দেওয়া হোক—অঞ্জনা, অমিয়কে টেলি করি।

—না—অঞ্জনা বললো—না—তার পরীক্ষা শেষ হতে মাত্র আর তিনটে দিন আছে শেষ হলে খবর দেব দাদাকে। এখন যা করবার আমরাই করবো।

—সেকি অঞ্জনা? বাপের এই অসুখ।

—হোক—দাদা এসেই ভাল করতে পারবে না।

ম্যানেজার বাবু অঞ্জনাকেই সমর্থন করলেন। ডাক্তার নার্স এবং আর যা দবকার সবই এল—এলো নীবা খবর পেয়ে। অমরবাবু তাকালেন, কেউটে সাপ দেখাব মত তিনি যেন চমকে উঠলেন ওকে দেখে—

—উহুঁ—উহুঁ—উহুঁ—উহুঁ উহুঁ........

অব্যক্ত আওয়াজ বেরুলো মুখ থেকে। ফেনা ভাঙছে মুখে। অঞ্জনা কি যেন বুঝে নীরাকে সরিয়ে দেবার জন্য বললো,

—আপনি একটু খানি সরে দাঁড়ান, আমি মুখটা মুছে দিই।

অঞ্জনা কৌশলে আড়াল করে দাঁড়ালো নীরাকে। সে বুঝলো যে-কোনো কারণেই হোক—বাবা আর নীরাকে দেখতে চাইছেন না—দেখলেই চমকে উঠছেন। হয়তো এমন কিছু ঘটেছে যার জন্য বাবার এই পরিণাম। বাবা তো নীরা আর হারাধনকে সর্ব্বসার করেছিলেন—এখন নিশ্চয় তিনি এমন কিছু জেনেছেন, যার জন্য তাঁর এই মরণান্ত অসুখ। বাবা তার অপরাধী—কিন্তু বাপের অপরাধ ছেলে-মেয়ের ধরা উচিত নয়—অঞ্জনা বাবার এই অসহ্য কষ্ট দেখতে পারছে না।

—কি কষ্ট হচ্ছে বাবা ? কাকে চাইছেন ? উলুকে ? কি চাই ? কাকে চাই ?

অব্যক্ত কথা—অসহায় চাহনি—অসহ্য যন্ত্রনা ছাড়া আর কিছু জানা গেল না। হারাধন বড় বড় ডাক্তারের নাম করে বলছে, —একে ডাকা হোক—বাঁচাবার চেষ্টা সাধ্যমত করা হোক—যত টাকা খরচ হয় হোক—অমিয়কে খবর দেয়া হোক নইলে আমাকেই দোষ পেতে হবে সে বলবে যে তার বাবার মৃত্যুকালে তাকে আমি খবর দিই নি....।

—না—দাদা আপনাকে কিছু বলবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—যা কিছু বলবার আমাকে বলবে। খবর আমি দেবনা।

—মুখাগ্নি কে করবে ?—হারাধন হঠাৎ কথাটা বলে ফেললো।

অঞ্জনা জবাব দিল না। রাগে আর দুঃখে সে সরে গেল। —উনি এখনো বেঁচে আছেন হারুবাবু—ম্যানেজার বললেন—মারা গেলে আপনি যা খুসী করবেন। আপনারই সব—কিন্তু যতক্ষণ উনি বেঁচে আছেন ততক্ষণ অন্ততঃ তাঁর ছেলেমেয়ের কাছে আপনার সতর্কভাবে কথা বলা উচিৎ।

—আর তো আশা নেই ম্যানেজার বাবু তাই বললাম কথাটা। —জানি—তবু অঞ্জনা তাঁর মেয়ে—শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত সে আশা করছে ওঁর বাঁচবার।

—আমিই কি সে আশা করছিনে ম্যানেজারবাবু—আমার এমন মামা—আমার বাবার থেকে বেশী—।

—থাক হারাবাবু—আমার পাকাচুলে কলপ দেবেন না।

ম্যানেজার কথাটা বলেই বাইরে চলে গেলেন। হারাধন পরিষ্কার বুঝলো তার সম্বন্ধে এ বাড়ীর কারো আর ভাল ধারণা নেই। এমন কি অমরবাবুর এই অসুখের জন্য সকলে তাকেই দায়ী

মনে করে। অঞ্জনা সে আর কথাই কইবে না—বাড়ীর ম্যানেজার বা সরকারও না!

নীরা বসে আছে একটা চেয়ারে—একটু দূরে। বললো

—উনি হয়তো ওঁর ছেলেকে খুজছেন।

—কি জানি—তবে—জবাবটা দিল হারাধন।

অঞ্জনা খাটের একপাশে বসে দেখছে বাবার যন্ত্রণা কাতর মুখখানা—দেখছে তাঁর চোখের সন্ধানী দৃষ্টি আর অস্পষ্ট আওয়াজে কার যেন নাম উচ্চারণ করার চেষ্টা।

না—বাঁচানো গেল না—বিকালের দিকে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে সব শেষ কথা উচ্চারণ করলেন অমরবাবু,

—উ... উ... উ উ .. উ . উলু!!

অমরবাবুর অমর আত্মা অনন্তে লীন হয়ে গেল। আছাড় খেয়ে পড়লো হারাধন মামার বুকে

—ওগো মামাগো আমি যে বাবাকে জানিনে গো—তুমি যে আমার বাবার বড় গো .

অঞ্জনা কাঁদলো—নিঃশব্দে কাঁদলো—চেঁচিয়ে কাঁদতে যেন তার বাধছে। হারাধনই চেঁচাক—ওই তো বাবার সব। সেই কাঁদুক। বাবা তার কান্নার শব্দে স্বর্গে যাবেন। অঞ্জনা ম্যানেজারকে ডেকে বললো,

—যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে দিন—মুখাগ্নি কে করবে?

—তুমি করবে মা, তুমি।

—হারাদা যে সব সম্পত্তি নিয়েছে।

—নিক, তাতে মুখাগ্নির অধিকার আসে না। আর আমার মনে হচ্ছে শেষ মুহূর্তে বাবু হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন।

—তাতে আর লাভ কি?

—না, লাভ কিছু নেই। যা হবার হয়ে গেল। অমিয়কে খবরটা তাহলে পরে দেবে মা?

—পরশু দাদার পরীক্ষা শেষ হবে—তারপর খবর দেব। দাদা এসে শ্রাদ্ধাদি করবে।

—হ্যাঁ—মা তাই ঠিক!

মহাসমারোহে চন্দন কাঠের চিতায় তুলে স্বর্গতঃ অমরবাবুর নশ্বর দেহ ভষ্মসাৎ করা হোল শ্মশান ঘাটে। হারাধন আকুল কণ্ঠে কাঁদলো—নীরাও যোগ দিল সঙ্গে তার।

কিন্তু আশ্চর্য্য। ম্যানেজার বা সরকার বা অন্য কেউ একবার 'আহা' বললো না।—ওরা ভাবছে হারাধনের চাকর হতে হবে।

মনের আনন্দে মেয়েদের মত শব্দ করেই কাঁদছে হারাধন। ম্যানেজার বললেন,

—হারাধনের কান্নার শব্দ-রথে চড়ে বাবু আমাদের স্বর্গে যাচ্ছেন—আহাঃ! কি দিব্যগতি হোল ওঁর!

কথাটা শুনে আর সবাই হেসে উঠলো!

চার দিনের দিন খবর পেল অমিয় বাপের মৃত্যুর। অঞ্জনাই টেলি করে জানিয়েছে এবং বাড়ী ফিরতে লিখেছে। শ্রাদ্ধাদি করতে হবে বাবার। উলুর ব্যাপারটায় বিচলিতই ছিল অমিয়; কন্টিনেণ্ট বেড়াবার আশা পূর্ব্বেই ত্যাগ করে পরীক্ষার পরই দেশে ফিরবার জন্য প্লেনে সীট বুক করেই রেখেছিল। যতশীঘ্র সম্ভব সে রওনা হোল এবং বাড়ী পৌছাল সাতদিনের দিন সকালে। অঞ্জনা অপেক্ষা করছিল দাদার জন্য। ছিল আরও সকলে। প্লেন থেকে নামতেই স্বয়ং ম্যানেজার ওকে বাড়ী নিয়ে এলেন। পথে অতি অল্প কথায় অমরবাবুর মৃত্যুর যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিলেন অমিয়কে এবং বললেন যে শ্রাদ্ধাদির জন্য বাবু আলাদা

াকা রেখে যাননি ; এর জন্য হারাধনের দ্বারস্থ হতে হবে। কারণ সেই এখন সব কিছুর মালিক এবং মালিকানী সে যথানিয়মে করছে—যদিও মুখে তার উল্টো কথাই বলে।

অমিয় শুনে গেল, কিছু বললো না। অঞ্জনার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত উলুর কথা সে কাউকে শুধোবে না। বাড়ী এসে পৌঁছাবামাত্র হারাধন এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো,

—এসো ভাই এসো—মামা আমাদের অকূলে ফেলে গেলেন। অকালে মামা যে এমন করে যাবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

চোখের জলটা মুছে অমিয় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল হারাধনের বুক থেকে। সাবধানেই ছাড়ালো যেন হারাধন কিছু বুঝতে না পারে—বললো,

—অদৃষ্ট! আর দিন কতক থাকলে দেখাটা হোত—অঞ্জনা?

—দাদা।

—তুই তো কাছে ছিলি? শেষকথা কি বলে গেলেন বাবা?

—উলু—উলু—উলু!!! বাবা হয়তো তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন দাদা। শেষের সময় কী অসহায় তাঁব দৃষ্টি। কী করুণ তাঁর কথা বলবার ব্যর্থ চেষ্টা—ভোলা যায় না দাদা। অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে গেলেন তিনি—

—কে কাছে ছিল?

—আমি সব সময়ই ছিলাম কিন্তু আমাকে উনি খোঁজেন নি। উলু মানে বৌদিকেই খুজছিলেন—

—না না তা নয়—হারাধন হঠাৎ বলে উঠলো—না, তিনি উলুর কথা ভেবেই অত কষ্ট পেলেন—একথা ঠিক কিন্তু তিনি তাকে খোঁজেন নি—তিনি উলুর মুখ আর দেখবেন না—বলেছেন।

—থাক থাক হারুদা—তোর কি মনে হয় অঞ্জনা বাবা শেষ বেলা উলুকেই খুঁজেছেন?

—হ্যাঁ, দাদা নিশ্চয়। আমি হলফ করে বলতে পারি সময় বাবা বুঝতে পেরেছিলেন উলুর সম্বন্ধে তিনি অবিশ্বাস করেছেন।

—না না—এ হতে পারে না—হারাধন বলতে চেষ্টা করলো কিন্তু অমিয় অন্য কথায় চালান করলো হারাধনকে। বললো,

—শ্রাদ্ধাদিব জন্য কি ব্যবস্থা করেছ হারুদা?

—আমি কি করবো? তোমাবই সব। এসেছ এখন যা করবার কর—আমি তো দুদিনের জন্য অছি হয়ে আছি। উইলের শর্তটা মেনে নিলে সবই তোমাব আছে, তোমারই থাকবে।

—ওসব কথা এখন থাক হারুদা—শ্রাদ্ধে কত টাকা খরচ হবে?

—নগদ টাকা তো খুব বেশী নেই, হাজাব দুই খরচ কবা হোক—

—ও আচ্ছা—থাক দুহাজার। অতটা খরচ নাইবা করা হোল। থাক—

—না-না অমিয় তোমারই সব, তুমি যা ইচ্ছে খরচ কব। আমি কে। বলছিলাম অনর্থক তো। শ্রাদ্ধ ব্যাপার সকলে সংক্ষেপেই সারে আজকাল। আর দেখছো না—দেশে খাদ্যাভাব, সবই কনট্রোল খরচ করবে কি করে? খাওয়ার ব্যাপাব তো চলবেই না গোনাগুনতি নিমন্ত্রণ করতে হবে তাও হয়তো রেসনকার্ড আনতে হবে তাদের। খরচ তো খাওয়ানোতে। তা নিষিদ্ধ—করবে কি তুমি? এখন কি আর সে দিন আছে যে তুমি 'দান-সাগর' শ্রাদ্ধ করে লাখটাকা খরচ করবে? কনট্রোলের যুগ।

হারাধনের এতগুলো কথা সবই ব্যর্থ হোল। অমিয় বললো,

—ম্যানেজারবাবু, ঠাকুমার দেওয়া আমার টাকা থেকে বিশ হাজার তুলে আনুন—ফর্দ্দ করুন সেই মত, আর যা করবার করুন।

টাকা রেখে যা

সেই এখনা-না-না-এ তুমি কি বলছ অমিয়! আমি কি বলছি যে খরচ করছে করোনা—তোমারই সব। আমি কে। মামা নেহাৎ গোয়াতু´মি করে এই উইলটা করে গেছেন। তোমার সম্পত্তি, তুমি বিশলাখ টাকা খরচ কর—আমি বলবার কে? শ্রাদ্ধের জন্য তোমাকে ঠাকুরমার টাকা তুলতে হবে কেন? তহবিলে কত আছে ব্যাঙ্কে কত পাওয়া যাবে সবই আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। তোমার যেমন ইচ্ছে খরচ করবে—হারাধন বলতেই লাগলো। ইতিমধ্যে অঞ্জনা দাদার জন্য যা ব্যবস্থা করবার করছে। একটা কম্বল সে বিছিযে দিল মাটিতে, হবিষ্যান্ন রান্না করবার ব্যবস্থাও করল যথানিয়মে। পুরোহিতকে ডাকিয়ে, যা যা করনীয় সব জেনে নিল এবং করলো। অমিয়কে বললো,

—আমাদের কর্তব্য ত্রুটিহীন করবো দাদা—তোমার যথানিয়মে অশৌচ পালন করা দরকার।

—হ্যাঁ অঞ্জনা নিশ্চয়। হবিষ্যান্ন কে রান্না করবে?

—যার রাঁধবার অধিকার সে তো নিব্বাসনে—কথাটা বলতে বলতে অঞ্জনা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো—নির্দ্দোষ নিষ্পাপ বৌদি আমার।

—থাম অঞ্জনা, আমাকে সামলাতে দে।

চলে যেতে বাধ্য হোচ্ছে অঞ্জনা ওখান থেকে কয়েক মিনিটের জন্য। কিন্তু হারাধন ছিল—ছিল নীরা—তারা কথাগুলো শুনেছে। হারাধন বললো,

—তুই কি বলতে চাস অঞ্জনা যে উলুর বিরুদ্ধে আমি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি।

—নিশ্চয়!—অঞ্জনা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল এবং সজোরে বললো—উলুর বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে আমার আহাম্মক বাবাকে বশীভূত করে আপনি নিজের কাজ হাসিল করেছেন—ভালই করেছেন। ধর্ম্মে সইলে হয়।

—থাম অঞ্জনা—অমিয় ধমক দিল—থাম—উলু যা... দিস
খাঁটি হয়তো তার সব কলঙ্ক মুছে যাবে—আমি এখনো সব ...
না—

—উলুকে না ছাড়লে সব সম্পত্তিই চলে যাবে জান দাদা, এই শর্ত।

—সম্পত্তি যায়—যাবে—তাতে কি। সম্পত্তির জন্য অবিচার করবো না।

—হ্যাঁ—তাই আমি চাইছি দাদা—বাবা যা করেছেন করেছেন। একটা মেয়ের জীবন নিয়ে খেলা করে গেলেন তিনি—কিন্তু তুমি নিশ্চয় তা করবে না। সম্পত্তি যাক—বৌদিকে ফেরাও।

—অঞ্জনা তুই আমার উপর অবিচার করছিস—বললো হারাধন।

রাগে অঞ্জনার মুখচোখ নীল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে সামলালো। অতিকষ্টে নিজকে সম্বরণ করে শুধু বললো,

—আচ্ছা—এখন সব যান, দাদা বিশ্রাম করুক—বলেই দরজাটা বন্ধ করে দিল অঞ্জনা—অমিয়কে বললো—তুমি ঘুমাও দাদা।

নীরা এবং হারাধনও বাইরে এল। এখনি এসব কথা অমিয়কে না বলাই উচিৎ ছিল অঞ্জনার কিন্তু অঞ্জনা শুনলো না মানা। অমিয় নিঃশব্দে পড়ে রইল কম্বলের বিছানায় অঞ্জনা যে উলুর চরিত্রের কলঙ্ক বিশ্বাস করে না—তাতো সে তার পত্রেই জানিয়েছে। হারুদা নিজেকে সমর্থন করবার জন্য কত কি বলতে চায়। আর ঐ যে নীরা—ওকে খুব ভাল না চিনলেও কিছুটা চেনে অমিয়। ঐ নীরাই নীলোৎপলকে জেলে দিয়েছিল জানে সে। লক্ষ্মীর সঙ্গে যখন অমিয়র বিয়ে হবার ঠিক হয় তখন শুনেছিল কথাটা। নীরা এখানে কেন? এ বাড়ীতে কি সে করে? যতদূর দেখা গেল, সে এখানে এসে খুব জাঁকিয়ে বসেছে।

সেই এখনোর কথা শুধু শুনছে নয় অঞ্জনার থেকে বেশী খাতির করছে তাকে। ব্যাপার কি ?

অমিয় খানিকক্ষণ নানা-কিছু ভাবলো তারপর উঠে অঞ্জনাকে ডাকলো। দুপুরবেলা। অঞ্জনা এলে শুধোলো,

—সব ব্যাপার এখন আমায় বল—ঐ নীরা কেন এখানে ? অঞ্জনা সবই বললো যতটা তার জানা আছে। ঐ নীরাই যে হারাধনকে চালাচ্ছে এবং হারাধন তাকে বিয়ে করবে, বাবা ঐ নীরাকে বাড়ীর সব কিছু দেখবার ভার দিয়েছেন, সেই এবাড়ীর কর্ত্রী হবে ইত্যাদি সবই অঞ্জনা বললো দাদাকে।

—তোমার এ বাড়ীতে আর থাকা উচিত নয় দাদা—অঞ্জনা কথা শেষ করলো।

—হ্যাঁ—শ্রাদ্ধটা শেষ হোক, চাঁদকোনা চলে যাব আমি।

—আমার ইচ্ছে নয় যে একটা রাতও তুমি এ বাড়ীতে থাক—

—কেন রে! মেরে ফেলবে নাকি ?

—কিছু বিশ্বাস নেই দাদা—ম্যানেজার বলছিলেন ঐ নীরা সাংঘাতিক মেয়ে—ওর পূর্ব্ব জীবনের ইতিহাস অত্যন্ত খারাপ! তিনি সব খোঁজ খবর নিয়েছেন।

—বাবাকে তিনি বলেন নি কেন ?

—বলবেন কি করে ? বাবা কি মানুষ ছিলেন ? পরের কথা শুনে নিজের পুত্রবধূকে কেউ বাড়ী থেকে তাড়ায় ? বাবা কারো কথা বিশ্বাস করেন নি ঐ নীরা আর হারাধন ছাড়া। তুমি বল দাদা যে এ বাড়ীতে হবিষ্যান্ন ইত্যাদির অসুবিধা হবে। চল তুমি আমার শ্বশুর বাড়ীতে—আমি সব ব্যবস্থা করবো, শ্বশুর মশাই তাই বললেন।

—সেটা কি ঠিক হবে অঞ্জু ? অশৌচের সময় অন্য বাড়ীতে থাকা—

—ঠিক অবশ্য হয় না—কিন্তু দাদা আমার বড্ড ভয়।

—ভয় কি? তুই তো রয়েছিস—কেন তোর এত ভয় দিস

—কি জানি—ভয় কিন্তু করছে আমার।

—না কিছু ভয় নেই। আমি এই ঘরটাতেই এই ক'দিন থেকে শ্রাদ্ধটা সেরে দি—তারপর যা হয় করা যাবে।

—ঠাকুরমার দেওয়া টাকাতেই শ্রাদ্ধ হবে তো?

—হ্যাঁ নিশ্চয়। অমরবাবুর শ্রাদ্ধ দু'হাজার টাকায় হবে না কথাটা হারুদা বললো কি করে তাই আমি ভাবছি।

—ও এখন সবটাই নিজের ইচ্ছেতে করতে চায়। নগদ কিছু খরচ করতে চায় না—'এক মণ চন্দন কাঠ কি হবে'—বলেছিল আমায় 'কে-জি দুই দেওয়া হোক—'

—কত দিয়েছিলি—?

—পাঁচ মণ—টাকাটা আমি দিয়েছি।

—খুব ভাল করেছিস। আমারও কিছু নেওয়া উচিত নয় আর এখানে।

—বাবার শর্ত তাহলে তুমি মানবে না দাদা—?

—না—মানা সম্ভব হবে না—এ যুগে কেউ মানে না ওরকম শর্ত।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু তাতে ঐ হারুদারই সব হয়ে যাবে।

—যাকগে—

ম্যানেজারবাবু আসছিলেন। কথাগুলো শুনতে পেলেন। বললেন,

—না মা অঞ্জনা—অত সহজ নয়—ও উইলের কোনো মূল্য নেই। ওটা বাবুর খোসখেয়ালের কাজ। আমি শরৎ এটর্নীর সঙ্গে কথা বলেছি। ও উইল বাতিল হয়ে যাবে।

—থাক ম্যানেজারবাবু—আইনে উইল বাতিল হয়তো হবে।

্রাকা রেখে যা ইচ্ছেটা তো আমি বাতিল করতে পারিনে—অমিয়
সেই এখন-থাকগে সম্পত্তি।
করছে —তা হয় না অমিয়। তাঁর ইচ্ছে ছিল তুমি বিবাহ বিচ্ছেদ
করবে। করবে তুমি?

—না।

—তা হলে ঐ উইলও বাতিল করাতে হবে।

হারাধন আসছিল। শুনলো না কি কথাগুলো?

অঞ্জনা ভাবছে—

—উইলের কথা কি যেন হচ্ছিল?

হারাধন এসেই প্রশ্নটা করলো। কেউ জবাব দিচ্ছে না। কারণ যে কথা হচ্ছিল, সেটা হারাধনের সাপক্ষে নয়। অমিয়ই বললো,

—উইলের বিষয়টা আমি জানতে চাই হারুদা--

—খুব ভাল কথা, উইলটা এনে তোমাকে দেখাতে পারি এখুনি।

—দেখতে চাইনে, মোটামুটি জানালেই হবে।

—বেশ—শোন—শর্ত অন্য কিছু নয়—মামার সবই তোমার। মামার শর্ত তুমি উলুর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আবাব বিয়ে করবে—ব্যস—তোমারই সব আছে, সবই তোমার থাকবে।

—বিবাহ-বিচ্ছেদ যদি আমি না করি?

—না করবে কেন? একটা চরিত্রহীনা মেয়ের জন্য....

—হারুদা—অঞ্জনা—ফোঁস করে উঠলো—বৌদি সম্বন্ধে বাবা তার মত হয়তো পরিবর্ত্তন করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর মুখের শেষ কথা উলু—নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন তিনি।

—তার উল্টোটাও হতে পারে অঞ্জনা—উলুর উপর তাঁর নিদারুণ ঘৃণাই হয়তো তাঁর মুখের শেষ বাণীর প্রকাশ।

—কখ্খনো তা নয়। আমি সব সময় তাঁর দিকে চেয়ে.
তিনি উলুকেই খুঁজেছেন—তাঁর ভুল ভেঙ্গে গেছে। দিস

—হতে পারে, তাতে উইলের শর্ত বদলাবে না অঞ্জন। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে নইলে···আমি তোমার বিষয় চাইনে অমিয়, আমার ব্যবস্থা আমি নিজে করে নেব। আমার কারখানা ভালই চলছে, মামা আমাকে বিলাত ফেরৎ এঞ্জিনীয়ার করে দিয়েছেন। আমার যথেষ্ট হয়েছে। মামা উইলটা করলেন, আমি কি করতে পারি। কারো কথা তিনি শুনলেন না, এমন কি আমাদের পুরোনো এ্যাটর্নী শরৎবাবুর কথাও না।

—বেশ তো তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক—সব সম্পত্তি তুমি নাও।

—তা কি হয় অমিয়? তোমার সম্পত্তি আমি কেন নিতে যাব—না, তা আমি কোনোদিন চাই নি।

—বিবাহ-বিচ্ছেদ যদি আমি না করি—

—তোমার বাবার ইচ্ছে পূর্ণ করা তোমার উচিৎ।

—বাবার অন্যায় ইচ্ছা পূর্ণ করতে আমি বাধ্য নই হারুদা—

—তোমার কি ধারণা অমিয় যে উলুর বিষয়ে আমি মিথ্যা বলেছি? আমাকে এতোটা ছোট তুমি ভাবছো কি করে? আমি দেখেছি এক, দুই, তিন দিন।···হারাধন আবার বললো,

—আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি উলু অসিতবাবুর কেউ নয়। উলু বললো 'অসিতবাবুর বেকার কর্ম্মচারীকে সে টাকা দিয়েছে' না—সে কথাও সত্য নয়—অসিতবাবুর কোনো কর্ম্মচারী বেকার নেই আমি জেনেছি—উলুর জন্ম রহস্যময়, সে বাইজীর কন্যা। তার চরিত্র পূর্ব্ব থেকেই খারাপ। এখন দেখ তোমার কি ইচ্ছা—

—তোমার সব কথা সত্যি হলেও উলুকে আমি ত্যাগ না করতে পারি—অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ না ঘটাতে পারি,

—কারণ?—হারাধনের কণ্ঠস্বর কেমন ব্যঙ্গাত্মক শোনালো।

..কা রেখে য'
সেই এখ' , এসে পড়েছে। একধারে বসে শুনছিল কথাবর্তা। নীরাকে করছে .ন কেউ ডাকে নি কিন্তু নীরা চায় কোথায় কি কথা হচ্ছে .ানতে। নীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে বুঝেছে অমরবাবুর মৃত্যু তার পক্ষে কল্যাণকর নয় কারণ হারাধন তার কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। এখন নীরাকে ভাগিয়ে দিতে তাব বিন্দুমাত্র বাধবে না। নীরা তাই হারাধনকে আরো বেশী পাপের মধ্যে জড়াতে চায়। হারাধনের বিদ্রূপ কণ্ঠ শুনে অমিয় বললো—

—কারণ উলুকে আমি ভালবাসি। সে যেই হোক আর যাই হোক আমার জীবনে তার আসন অনন্তকাল স্থায়ী—অনড় থাকবে—অবিচল থাকবে—অবিনশ্বর থাকবে।

এর পর আর কারো কিছু বলার নাই। হারাধন তবু বললো, —সব দেখেও যদি তুমি তা কর তো কি আর বলবো। প্রেমের দিক থেকে তুমি নিশ্চয় খুব বড়—কিন্তু বাবার কথার অমর্য্যাদা হয়।

—হোক—বাবার উচিৎ ছিল, আমার জন্য অপেক্ষা করা। সম্পত্তিটা তিনি ভালবেসে তোমাকে দিয়েছেন, তুমি নাও হারুদা—আমি খেটে খাব—না পারি ভিক্ষা করবো—বাবার অন্যায় আবদার মানতে পারবো না।

—আপনার অতুলনীয় প্রেমের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি, হঠাৎ নীরা বললো কথাটা—একটু থেমে বললো—উলু নিশ্চয় ভাগ্যবতী—কিন্তু একটা প্রশ্ন কি করতে পারি?

—করুণ! স্বচ্ছন্দে করুন—

—আপনার এই গভীর প্রেম যদি ওপক্ষের প্রতিদানে অভিসিঞ্চিত না হয়?

—না হোক—ওর সুখের জন্য আমি ওকে সে সুযোগ দেব। যাকে ও ভালবাসতে চায় বাসবে।

—আপনি মহান—আপনি সত্যি সুন্দর—

—এ সব সেন্টিমেণ্টালিটি—বুঝলে নীরা—এসব কথা ·
বিবাহ-বিচ্ছেদ ওকে করতেই হবে। আমি করাবোই। যাক এখ দিস
শ্রাদ্ধটা হয়ে যাক, তারপর সব ঠিক হবে। এই বিষয়সম্পত্তি
কে নেবে? সব তোমার, সবই তোমার থাকবে।

কেউ আর কিছু বললো না। ম্যানেজার যে ফর্দ্দটা দিয়েছেন—
অমিয় সেইটা দেখছিল। দেখে বললো,

—ঘি—চিনি—আটা—চাল সব যোগাড় হবে কি করে?

—সরকারে দরখাস্ত করা হয়েছে। কনট্রোলেই পাওয়া যাবে।

—বেশ—ব্যবস্থা করুন—

অঞ্জনা দাদার জন্য কিছু ভাল ফল মিষ্টি আনলো। দিল
অমিয়কে। অন্য সকলকে চা দিতে বললো! চা খেতে খেতে
হারাধন প্রশ্ন করলো,

—টাকা কত খরচ ধরা হয়েছে?

—বিশ হাজার—বললেন ম্যানেজার।

—বেশ—কিন্তু অত টাকা তো ব্যাঙ্কে জমা নেই।

—আপনাকে দিতে হবে না—ঠাকুরমার টাকা থেকে নিলাম।

—না না—সেকি হয় ম্যানেজারবাবু—না, টাকাটা এষ্টেট থেকেই
দিন—কিছু একটা ব্যবস্থা করুন।

—টাকা এসে গেছে আপনি আর এ নিয়ে ভাববেন না।

হারাধন চুপ করে গেল। ভাবতে লাগলো, অবশেষে বললো,
—বর্ত্তমান দিনে শ্রাদ্ধাদির খরচ লোকে যথা সম্ভব কমিয়ে দিয়েছে
অমিয় তাই আমি তোমাকে দু'হাজার বলেছিলাম—বেশ—তুমি
যা ইচ্ছে খরচ কর—তবে টাকাটা মামার এষ্টেট থেকেই নিও।

বলে চলে গেল হারাধন। নীরাও গেল পিছনে। অমিয় বা
অঞ্জনা কিছু বললো না। ম্যানেজার বললেন,

—ব্যাঙ্কে টাকা জমা ছিল চুয়ান্ন হাজার—চল্লিশ হাজার তুলে

-াকা রেখে -

সেই এ- নিজের নামে জমা করেছে অন্য ব্যাঙ্কে—বললে 'ক্যাসে অত করটাকা নেই।'

—টাকা তুলবার অধিকার ওকে কি দিয়েছেন বাবা ?

—হ্যাঁ, ওকে তো তিনি সবই দিয়েছেন—

—যাকগে ম্যানেজারবাবু—বাবা যখন দিয়েছেন তখন নিক—

—না—ম্যানেজার দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—না—তা আমি হতে দেব না। ও যে কত বড় শয়তান তা আমি জেনেছি। ওর হাতে এই তিন পুরুষের সম্পদ পড়লে আর রক্ষে নেই। হাতেই মাথা কাটবে ও লোকের।

—বিবাহ বিচ্ছেদ না করলে সবই তো ওর হয় ম্যানেজারবাবু ?

—হয় না—হবে না। তোমার বাবার গোয়ার্তুমী ছাড়া ও উইলের কোনো মূল্য নেই—যাক, আপাততঃ শ্রাদ্ধটা সার, পরে আমি সব দেখবো।

উলুর খবর কিন্তু পাওয়া গেলনা। অঞ্জনা অসিতবাবুর বাড়ীতে ফোন করে জানলো—অসিতবাবু বোম্বাই থেকে উলুকে নিয়ে কোথায় গেছেন এখনো জানান নি। খুব সম্ভব তিনি দূরে কোথায় বেড়াতে গেছেন।

শ্রাদ্ধাদি চুকে গেল অমরবাবুর। ভালভাবেই হোল, ত্রুটি কিছু ঘটতে দিলেন না ম্যানেজার—খরচও যথেষ্ট করা হোল।

এই ক'দিন অঞ্জনা প্রায় সব সময় দাদার কাছাকাছি থেকেছে ; কি জানি কেমন যেন ওর ভয় করে দাদাকে একলা রাখতে। কাজ শেষ হোল। এবার তাকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে। বললো, —শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দাও দাদা কাল—তারপর তুমি কি করবে ?

—আমি মামার বাড়ী চাঁদকোনায় গিয়ে ডাক্তারী করবো।

—ঐ পাড়াগাঁয়ে তোমার ডাক্তারী চলবে কেন দাদা ?

—চলবে। না চলে না চলবে। ওখানেই থাকবো। উলুব

খবর রাখিস তুই। যদি সে ফেরে তো তৎক্ষণাৎ খবর দিস আমাকে।

—তা তো দেবই। কিন্তু ওখানে তোমার শরীর ভাল থাকবে না দাদা—

—থাকবে। খুব ভাল থাকবে। তোর কোনো ভাবনা নেই। ওটা মাতামহের সম্পত্তি—ওখানে হারুদার কিছু নেই—তাই ওখানেই যাব—বুঝলি ?

—হুঁ—অঞ্জনার কান্না পাচ্ছিল।—সাবধানে থাকবে দাদা। কালই যাবে ?

—হ্যাঁ—কাল একবার গিয়ে সব দেখে আসি—ওখানকার নায়েব এসেছিলেন শ্রাদ্ধের সময়। তিনি বলে গেছেন—ওটার সব তোর আব আমার; হারুদার কিছু নেই ওখানে। হারুদা ওখানে গিয়েছিল। নায়েব বললেন—সাধারণ ভাবে আদর যত্ন তাঁরা করেছেন কিন্তু ওখানকার সম্পত্তি সব দাদু তোর আর আমার নামে দিয়ে গেছেন। নগদ টাকাও বেশ কিছু আছে। ওতেই চলে যাবে রে অঞ্জু। মোটর গাড়ী না চললেও ডাল-ভাত জুটবে।

কথাটা দুঃখের, অঞ্জনা এমনিই কাঁদছে—দাদার কথা শুনে আরো কেঁদে উঠলো। অমিয় তাকে থামিয়ে বললো,

—উলু যে ভাল মেয়ে তার একটা বড় প্রমাণ আমি পেয়েছি অঞ্জু।

—কি দাদা ? কি ?—অঞ্জনা ত্বরিতে এগিয়ে এলো শোনবার জন্য। অমিয় বললো—

—আজ সকালে আমি উপরে গিয়ে উলুর ঘরটা দেখলাম। দেখলাম ঘরের দরজাটা ভেজানো আছে। ঢুকে দেখি উলুর চলে যাওয়ার পরদিন এ পর্য্যন্ত কেউ তার ঘরে ঢোকে নি। না ঢোকার কা অমিয় বিরুদা নিজেকে সাধু সাজাবার জন্য তার ঘরে নিজে তো বাড়ির ঝি চাকরকেও যেতে দেয় নি। উলুর আর

ক'টা টাকা আছে যে সে নেবে? কিন্তু আমি দেখলাম, উলুর লোহার সিন্দুকের চাবি ওখানেই রয়েছে—খুলে দেখলাম, ঠাকুরমা ওকে যে টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে মাত্র এক হাজার টাকাই নিয়েছে—অথচ হারুদা বলেছে বারবার নাকি সেই লোকটি তার কাছে টাকা নিত। হাজার টাকা তাকে দেবার কথা উলু স্বীকার করেছিল। হাজারই দিয়েছে আর সব ঠিক আছে। খারাপ মেয়েরা আর যা ছাড়ুক টাকা ছাড়ে না—ঠাকুরমার দেওয়া এবং আমার দেওয়া, তার বাবা অসিতবাবুর দেওয়া সব টাকাই মজুত—একটা পয়সা তোলেনি। প্রায় হাজার চল্লিশ টাকা রয়েছে—যে-টাকা যে-কোনো লোকের পক্ষে সম্পদ। উলুর যে চিঠিলেখা খাম কাগজ—গুণে দেখলাম, তার যে কটা খরচ হয়েছে শুধু আমাকে লেখার জন্য। বাকী সব মজুত। উলুর শাড়ী ব্লাউস টয়লেট--ইত্যাদি যা যতটুকু সব ঠিক আছে—আমার বালিশের তলায় উলু লিখে রেখেছে, 'কবে তুমি আসবে—'

শুনতে শুনতে অঞ্জনার চোখের জলটা গাল বেয়ে পড়ছে।

—শোন অঞ্জনা, চরিত্রহীনা মেয়ের এগুলো লক্ষণ নয়। মন্দিরের ঝি বললো—একটা আধবুড়ো লোক একদিন মাত্র বৌরাণীর সঙ্গে দেখা করেছিল সন্ধ্যাবেলা 'আমরা ভেবেছিলাম ভিখিরি'—তাহলে সেই লোকটাই টাকা নিয়েছে আর সে কথা উলু স্বীকার করেছে বাবার কাছে। কিন্তু ঐ একবার মাত্র।

—উলুর মত মেয়ে হয় না দাদা—ও যদি সুস্থ হয়ে ফেরে তো, ওকে আনবো আমরা ভাই-বোনে। ওকে ফেলা যাবে না। জানি না ও ভাল হবে কি না। খুব অসুখ দেখেছি।

—বরাং—যাক্, কাল আমি তোকে শ্বশুরবাড়ী পরবে-[illegible] দিয়ে চাঁদকোণায় যাব। ওখানে-সব ব্যবস্থা করে দুচার [illegible] [illegible] বসবো—ওখানেই প্র্যাকটিস করবো। [illegible]

অঞ্জনা আর কিছু বললো না. সেও চায় না যে দাদা এখানে থাক। হারাধনকে তাব ভয় করে। কে জানে দাদার আরো কোনো ক্ষতি সে করবে কি না। খানিক পরে বলল,

—উইলটা কিন্তু বে-আইনা দাদা—

—হোক, বাবা যখন চান না যে আমি এই সম্পদ পাই, তখন যাক সব—প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রেব মতামতের জন্যও তিনি অপেক্ষা করলেন না—

—বাবার ভুল শেষ অবস্থায় ভেঙেছিল দাদা—

—কি করে তা জানা যাবে? উলুর উপর তাঁর ঘৃণাও তো হতে পারে।

—না দাদা—তা নয়। বাবার অসহায় চাউনি আমার মনে পড়ছে—তাছাড়া চাকরটা শুনেছিল, বাবা বলছিলেন টেলিফোন সমেত পড়ে যাবার সময়—'উইল নাকচ করতে হবে—কালই নাকচ করতে হবে—'

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ—আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমার মনে হয় রাণী নিপুনিকা এমন কোনো কথা বাবাকে জানান যা তিনি এখন বলছেন না—যা শুনে বাবার আক্কেল হয় যে তিনি ভুল করেছেন।

—রাণীকে জিজ্ঞাসা করেছিলি?

—হ্যাঁ—তিনি শ্রেফ্ অস্বীকার করলেন।

—যাকগে—উইল বেআইনি হলেও উলুকে না পেলে কিছু আমি করবো না অঞ্জনা। যদি সে ফেরে—যদি তাকে ভালভাবে পাই তো দেখা যাবে।

পরদিন অঞ্জনাকে শ্বশুর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ওখানেই খেয়ে অমিয় বিকালবেলা নিজের মোটরে চড়ে রওনা হোল চাঁদকোণায়।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্‌, পাকা রাস্তা—এখুনি পৌঁছে যাবে। অঞ্জনা বললো,—কাল ফিরে আমাকে সব জানাবে।

—আচ্ছা—

অমিয় চলে গেল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পথ অন্ধকার—তবে মোটরের হেড্‌ লাইট-এ সবই দেখা যায়। বৃষ্টি পড়ছিল টিপটাপ। অমিয় সজোরে গাড়ী চালাচ্ছে, হঠাৎ দেখতে পেল একখানা লরী পথ আগলে মুখ ঘোরাচ্ছে। লরীটা কলকাতার দিকে আসছিল—হয়তো বিপরীত মুখে ঘুরবে—অমিয় নিজের মোটর থামালো।

লরীটার মুখ ঘোরাতে সময় লাগবে। অমিয় একটা সিগারেট ধরিয়ে নেবার জন্য পকেটে হাত দিয়েছে—হঠাৎ দুজন লোক দুদিক থেকে জড়িয়ে ধরলো তাকে। মুখে রুমাল দিয়ে চেপে ধরলো—অজ্ঞান হয়ে গেল অমিয়।

জ্ঞান ফিরলে দেখলো সে বন্দী। মেঝেতে একটা পাটির উপর সে শুয়ে আছে। হাত পা খোলা তবে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। দেখতে পেল একজন দুষমন চেহারার লোক বাইরে পাহারা দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে একটা লণ্ঠন—একটা জলের কুঁজো আর একটা এনামেলের গ্লাস ছাড়া কিছু নেই।

জায়গাটা কোথায় বোঝা অসম্ভব। একটিমাত্র ছোট জানালা ছাড়া আর কোনো ফাঁক নেই। কোথাও কোনো আওয়াজ শোনা যায় না—ঘরের দেওয়ালগুলো পুরোনো, চুনবালি খসা—এ কোথায় রাখা হয়েছে তাকে? কেন রাখা হয়েছে? হারাধনকে তো সে সবই ছেড়ে দিতে চায়। তবে কেন এ অত্যাচার তার উপর?

কিছুই বুঝতে পারলো না অমিয়। অনেকক্ষণ পরে একজন ভদ্রবেশী লোক এসে বললেন,

—শুনুন অমিয়বাবু, আপনার ঠাকুরমার দেওয়া দশলক্ষ টাকা

আছে ; আপনাকে ওটা দিতে হবে। সই করুন এই কাগজে—সই করার পর টাকাটা কাল আমাদের নামে জমা হয়ে গেলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আসুন—সইটা করে দিন ; আপনার খাবার আসছে।

—না—

—না সই করলে বিপদ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। অর্দ্ধাহার অনাহার থেকে অত্যাচার চরম হতে পারে। আসুন—

—সই করবো না—অমিয় দৃঢ় কণ্ঠে বললো।

—আচ্ছা, তাহলে থাকুন উপবাস—আজ এই পর্য্যন্ত—কাল আরো মাত্রা চড়বে—মনে রাখবেন।

লোকটা চলে গেল। অমিয় বুঝলো সে বড় কোনো ডাকাত দলের হাতে পড়েছে। এখন করবে কি সে ? কে তাকে উদ্ধার করবে ? না, কেউ নাই। কোনো উপায় দেখতে পেল না অমিয় উদ্ধারের।

ঈশ্বরমাত্র সহায়।

পরদিন খবরের কাগজে অঞ্জনা পড়লো,

"দুঃসাহসিক ডাকাতি—

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর একখানি মোটরে জনৈক ব্যক্তির পরিত্যক্ত কয়েকটি কাগজপত্র ও একটি হাতব্যাগ পাওয়া যায়—টাকাকড়ি সবই চুরি গিয়াছে। আরোহীর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। মোটরের নম্বর লইয়া স্থানীয় পুলিশ জোর সন্ধান করিতেছে।"—গাড়ীর নম্বরটা দিয়েছেন কাগজওয়ালারা।

অঞ্জনা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। এ যে তার দাদার গাড়ীর নম্বর। কী ভয়ানক ! কি হবে ? শ্বশুরমশাইকে খবরটা জানালো সে তৎক্ষণাৎ। তিনি হারাধনকে ফোন করে জানালেন। হারাধন বললো,

—বলেন কি! অমিয়র মোটরের নম্বর? দেখি, আমি এখুনি পুলিশে খবর দিচ্ছি—সর্ব্বনাশ!

পুলিশ কি করছে জানে না অঞ্জনা। তার কিন্তু নিশ্চিত ধারণা হারাধনই কাজ করেছে। কিন্তু কি সে করবে? কাকে বলবে? স্বামী তার ঈজিপ্টে। অনেক ভেবে সে ম্যানেজার বাবুকে ডেকে পাঠালো। তিনি এলে বললো—এ কাজ হারুদার।

—হ্যাঁ মা—নিশ্চয়। কিন্তু তুমি ভেবো না। খুন সে এখন করবে না অমিয়কে। কারণ অমিয় খুন হলে সম্পত্তিটা উলুর হয়ে যাবে সব। উলুকে খুন করলে সবই তোমার হয়ে যাবে। জানে হারাধন।

—তবে কি উদ্দেশ্যে গুম্ করলো দাদাকে?

—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—যতদূর মনে হয় তোমার ঠাকুরমার টাকাটার দিকে এখন তার লক্ষ্য।

—কি হবে কাকাবাবু?

—ভয় নাই—আমি গুপ্তচর লাগিয়েছি, গোপনে।

অঞ্জনা কাঁদতে লাগলো। ম্যানেজারবাবু যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়ে ফিরে গেলেন। অঞ্জনার সব রাগটা গিয়ে পড়লো তার বাবার উপর। বললো,

—বাবা—বাবা না দুষমন!

উলুকে নিয়ে বোম্বাই থেকে দিল্লী গিয়েছেন অসিতবাবু—উলু বললো হিমালয়টা দেখতে তার ইচ্ছে করছে। অসিতবাবু তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করলেন এবং উলুকে নিয়ে কেদার-বদরী দেখবার জন্য রওনা হলেন। টাকা যা আছে তাতেই চলে যাবে সুতরাং তিনি বাড়ীতে কিছু জানালেন না। একটা বড় দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে দূর তীর্থভ্রমণে বেরুলেন—ইচ্ছা, সমস্ত হিমালয়টা

দেখবেন—দেখাবেন উলুকেও। উলু ক্রমশ ভাল হয়ে উঠছে। এখন আর তাকে দেখে অসুস্থ মনেই হয় না। বেশ হাসিখুসি অবশ্য হয়নি তবে সুস্থ আছে এটা বোঝা যায়।

ভ্রমণকারীদলে দু'একজন বাঙালী আছেন—এটা অমরনাথ যাবার সময়। সকলে প্রস্তাব করলেন হৃষীকেশ অমরনাথই যাবেন তাঁরা। ভাল কথা। উলুও রাজি হোল—চললেন সব।

অমর উলুর শ্বশুরের নাম—মনে পড়লো উলুর। বললো,

—কলকাতার কোন খবর তো পাননি বাবা ?

—না মা—কলকাতার কি খবর নেব আর ? কার বা খবর নেব ?

—আমার শ্বশুরবাড়ীর কোনো খবর তো দেন না কেউ ?

—না—বলিস তো চিঠি লিখে খবর জানি।

—উনি বিলাত থেকে ফিরলেন কিনা জানতে ইচ্ছে করে।

—বেশ তো, জানার ব্যবস্থা করছি। অমিয় ফিরলে যাবি কলকাতা ?

—না বাবা কলকাতা যাবার জন্য নয়—উনি কি ভাবছেন আমার সম্বন্ধে তাই আমি জানতে চাই....

—সেটা তো এখান থেকে হওয়া সম্ভব নয় মা। চল, আমরা কলকাতা ফিরি তাহলে।

—না—না, তীর্থদর্শন শেষ করে যাব—হয়তো উনি ফিরেছেন। কিম্বা আসছে মাসে ফিরবেন—জুলাই তো শেষ হোল।

—হ্যাঁ আজ পঁচিশে—আর ছটা মাত্র দিন।

—বেশ, আমরা আগস্টে ফিরবো।

—আচ্ছা—তাহলে আর কাশ্মীর যাবি না ?

—না—আমি যেতে পারতাম, কিন্তু আপনি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন দেখছি। থাক আর যাওয়া ..

অসিতবাবু বুঝলেন উলু সম্পূর্ণ সেরে গেছে। তার চিন্তাশক্তি

সজাগ ও সক্রিয় এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে যদি সে অমিয়র ভালবাসা পায় অর্থাৎ অমিয় তাকে গ্রহণ করে তাহলে উলুর জীবনটা আবার ফলে-ফুলে ভরে উঠবে। কিন্তু অমিয় কি করবে কে জানে? সেটা জানার উপায়ও তো কিছু দেখছেন না অসিতবাবু। উলু সুস্থ হয়েছে কিন্তু সে যদি শোনে যে অমিয়ও তার বাবার এবং হারাধনের কথাই বিশ্বাস করে উলুকে চরিত্রহীনা ভেবেছে তাহলে উলু আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে—এই আশঙ্কাটা প্রবল হয়ে উঠলো অসিতবাবুর মনে। উলুকে নিয়ে হঠাৎ তাঁর কলকাতা যাওয়া ঠিক হবে না—আগে তিনি জানবেন উলু সম্বন্ধে অমিয়র মত কি। যদি দেখেন অমিয় তাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাহলেই উলুকে তিনি কলকাতায় আনবেন। উলুকে আর তিনি অসুস্থ করতে চান না। অতিকষ্টে তাকে ভাল করা হয়েছে।

কিন্তু অসিতবাবু কি করে জানবেন অমিয়র খবর? এরকম ভেতরের খবর সাধারণ কারো কাছে তো জানা সম্ভব নয়—অঞ্জনা হয়তো জানতে পারে। কে জানে সেও সঠিক কিছু লিখবে কি না। লক্ষ্মীকে পত্র লিখবেন—ঠিক করলেন কিন্তু এই সুদূর হিমালয়ের গিরিকন্দর থেকে ওসব কিছু না করে অসিতবাবু ভাবলেন দিল্লীতে ফিরে যা হয় তিনি করবেন। উলুকে বললেন, —এখান থেকে তাহলে আমরা দিল্লী ফিরে যাই—তারপর কলকাতা যাবার ব্যবস্থা—না কি বলিস?

—কলকাতা যাবার কথা আমি আর ভাবি না বাবা—কি জন্য যাব সেখানে? কে আমার আছে?

—অমিয় যদি তোকে ফিরে নিতে চায়?

—সম্ভব নয় বাবা—ও কথা বাদ দিন—উনি তো ঐ বাপেরই ছেলে।

—না উলু, ঐ বাপের ছেলে হলেও তার নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। তাছাড়া ওটা আমাদের জানা দরকার।

—জানা যাবে পরে—

উলু এড়িয়ে গেল কথাটা।' অসিতবাবু তখন আর কিছু বললেন না। কারণ উলুব সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তিনি অতিশয় সতর্ক থাকেন সব সময়। ডাক্তার বলেছেন ওর মন বুঝে সময়মত কথা বলতে হবে। যতদূর মনে হয় উলু সেরে গেছে। পবিবর্ত্তনের মধ্যে একটু গম্ভীর হয়েছে। তবে ওর প্রকৃতিটা বরাবরই গম্ভীর জানেন অসিতবাবু। তাই খুব বেশী ভাবলেন না। যে ঝড় বইছে উলুর জীবনে তাতে ও যে বেঁচে আছে এই ঢের।

পাহাড়-পর্ব্বত ঘোরা খুব অভ্যাস নেই অসিতবাবুর, তারপর এখন আর তিনি যুবক নন—বয়স যথেষ্টই হয়েছে, তাই মাঝে মাঝে বড়ই অসুস্থ বোধ করেন। উলুকে কিন্তু কিছুই জানতে দেন না। বললেন,

—চল মা, এবার ফিরে যাই দিল্লীতে। ওখানে কিছু কাজও রয়েছে আমার।

—চলুন—উলু তৎক্ষণাৎ রাজি হোল।

ভ্রমণকারীদলটি আরো ঘুরবেন। অসিতবাবু আর উলু তাঁদের সঙ্গী ছিলেন। ভালই চলছিল সকলে মিলে আনন্দের এই তীর্থযাত্রা। অসিতবাবু তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে উলুকে নিয়ে ফিরলেন দিল্লীতে। এখানে তাঁর বহু পরিচিত ব্যক্তি—বন্ধু-বান্ধব এবং রাষ্ট্রের বহু বিশিষ্ট নেতা রয়েছেন। সকলেই তাঁকে চেনেন এবং শ্রদ্ধা করেন। সকলেই জানেন একমাত্র কন্যা অসুস্থ হওয়ার জন্য তিনি কন্যাটিকে নিয়ে তীর্থযাত্রা করেছিলেন। সে সুস্থ হয়েছে। এখন তাকে তার স্বামীর কাছে পৌছে দিতে হবে।

সবাই খুসী হলেন উলুকে দেখে। ডাক্তার বললেন,—না, রোগ আর নেই। সম্পূর্ণ সেরে গেছে উলু। অসিতবাবু এবার তাকে শ্বশুরবাড়ীতে পৌছে দিতে পারেন।

ভ্রমণে যাবার সময় অসিতবাবু দিল্লী হয়েই গিয়েছিলেন। তখন তিনি এঁদের বলেছিলেন, মেয়েটিকে সুস্থ করবার জন্যই তাঁর এই ভ্রমণ-বিলাস। নইলে এই বয়সে এই কষ্ট তিনি করতে চাইতেন না। উলুকে তিনি নিজের মেয়ে বলে পরিচিত না করলেও, উলু তাঁকে 'বাবা' বলে আর অসিতবাবু উলুকে যে-রকম স্নেহের চোখে দেখেন এবং যে রকম মমতায় ঘিরে রেখেছেন তাতে সকলেরই বিশ্বাস উলু তাঁর নিজেরই মেয়ে। অসিতবাবুর একমাত্র পুত্র বাড়ী থেকে পলাতক তাও অবশ্য জানেন এঁরা—তাই একদিন এক বন্ধু প্রশ্ন করলেন,

—ছেলের কোনো সংবাদ পেলেন?

—না—আছে কি না কে জানে। যদি বেঁচে থাকে তো থাক যেখানে হোক।

—খুবই দুঃখের কথা। আপনার ধন-সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করেছেন?

—ছেলে ফেরে তো সেই পাবে—মেয়ের মাসোহারা থাকবে আর যদি নাই ফেরে তো সবই মেয়ের এবং জনগণের। সরকারই সব দেখবেন—কথাটা যখন বলছিলেন উনি তখন উলু চা দিচ্ছিল অসিতবাবু আর তাঁর বন্ধুকে।

শুনলো কথাটা। উইলের কথা সে জানে কিন্তু তখন সে খুব অসুস্থ থাকার জন্য সে-সব কথা মনে ছিল না। আজ শুনে মনে পড়ল। বন্ধুটি চা খেয়ে চলে যাওয়ার পর উলু বললো অসিতবাবুকে—

—আপনার এতো সম্পত্তি নিয়ে আমি কি করবো বাবা?

আমার কি দরকারে লাগবে। আমাকে বরং এখানকার কোনো জন-সেবার কাজে লাগান।

—না মা না—আমি বেঁচে থাকতে তা করতে পারবো না। তাছাড়া এখনো তো অমিয়র মত জানি না। যদি সে ফিরে তোকে ঘরে নেয়?

—সে আশা খুব কম বাবা।

—না কম নয়—তার বাবা যদি তাকে তাড়িয়ে দেয় তো আমার সব সম্পদ নিয়ে তোরা দিব্যি কাটাতে পারবি। ভাবনা কেন? আমার বিশ্বাস অমিয় তোকে নেবে—এ যুগের ছেলে সে, অত হাল্কা নয়।

উলুর বিরসমুখে অতি ক্ষীণ হাসি ফুটলো মাত্র। সে চলে গেল আর কিছু না বলে। অসিতবাবু উঠে নীচে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে কলকাতায় তাঁর বাড়ীতে কথা বলবার জন্য একটা 'ট্রাঙ্ক কল' বুক করলেন। ম্যানেজারকে ডেকে তিনি অমিয়র খবর জানবেন। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস অমিয় এসে অনুসন্ধান করবে এবং হারাধনের কথা অগ্রাহ্য করে উলুকে গ্রহণ করবে। অঞ্জনা নিশ্চয় দাদাকে বলবে উলুর নির্দোষিতা সম্বন্ধে। উলুর ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হবে এই আশায় অসিতবাবু উৎসুক হয়ে ফোনের অপেক্ষা করছেন। ফোন এল—ম্যানেজারই কথা বলছেন বাড়ী থেকে—অসিতবাবু শুধুলেন,

—খবর কি ম্যানেজারবাবু? ও বাড়ীর কে কেমন আছে?

—ভাল নাই স্যার—খবর খুব খারাপ—বলতে ভয় করছে। উলু কোথায়?

—উলু এখানে নেই—খবরটা বলুন আপনি।

—খবর স্যার—অমরবাবু মারা গেছেন দিনকতক হোল। তাঁর সব কিছু তিনি ভাগ্নে হারাধনকেই দিয়ে গেছেন।

—বেশ, গেছেন—অমিয় কি ফিরেছে ?

—হ্যাঁ, তিনি ফিরে বাপের শ্রাদ্ধ করলেন—তারপর....

—বলুন ম্যানেজারবাবু—থামলেন কেন ? কি হয়েছে ?

—খুব খারাপ খবর স্যার—অমিয়কে পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর তার গাড়ীটা পাওয়া গেছে। পুলিশ বলছে...

—কি বলছে পুলিশ ?

—খুন হয়েছে অমিয়—তাকে মেরে ফেলা হয়েছে ..

—অ্যাঁ—

অসিতবাবু কাঁপছিলেন। পড়ে যাবেন। হোটেলের ম্যানেজার ধরলেন তাঁকে—পড়তে দিলেন না কিন্তু অসিতবাবু অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

উলু ছুটে এল। ডাক্তার এলেন। সারারাত ধরে চিকিৎসা চললো—অসিতবাবুকে বাঁচানো গেল না। ভোর রাত্রেই তিনি দেহত্যাগ করলেন।

ফোনে কি খবর তিনি শুনলেন তাও কাউকে জানাতে পারলেন না। কোনো কথাই আর বেরুলো না তাঁর মুখ থেকে। মৃত্যুর এক মিনিট পূর্বে জ্ঞান হয়। নিঃশব্দে শুধু চেয়েছিলেন উলুর পানে। চোখে দুফোঁটা জল ছিল।

হাজারটা টাকা ওড়াতে ইউনিট সাহেবের বেশীদিন লাগবার কথা নয়—অনেক আগেই ফুরিয়ে যেতো কিন্তু উলু তাকে বলে দিয়েছিল, সে যেন আর না যায় তার কাছে টাকা চাইতে। যাবে না কেন ? আলবাৎ যাবে ইউনিট। উলু এখন বড় লোক হয়েছে। বাড়ী, গাড়ী, স্বামী-সংসার পেয়েছে সে—ইউনিটকে অতি সামান্য

হাজারটা মাত্র টাকা দিয়েছ উলু। কেন যাবে না—দরকার হলেই যাবে ইউনিট টাকা চাইতে।

দরকার আগেই হোত—ইউনিট যদি একটা কাজ না পেতো। শ্রীরামপুরের দিকে একটা কারখানায় দিন হিসাবে কাজ পেয়ে গেছে ইউনিট। যে দিন কাজ করে আট দশটা টাকা পায়। সবদিন কাজ থাকে না—মাসের মধ্যে দশ বারো দিন বেকার থাকে। ঐ সময় আড্ডা জমে—তাড়ি চলে আর চলে নানা রঙের রসিকতা। ইউনিট ওখানে মাতব্বর। কাছাকাছি একটা সিনেমা-হাউস আছে—দল মিলে সেখানে মাঝে মাঝে যায়। সবাই প্রায় চ্যাংড়া, ইউনিট বয়সে বড়। তাই ওরা সব তাকে চাচা বলে ডাকে। "ইউনিট চাচা" নামে সে এখন পরিচিত—এমন কি শুধু চাচা বললেও লোকে চিনবে তাকে। 'চাচা' নামে ইউনিট বিখ্যাত হচ্ছে। কিন্তু হাতের টাকা সব ফুরিয়ে গেল। কারখানায় ক'দিনই কাজ পায় নি ইউনিট—যে-কটা টাকা হাতে আছে তাতে কলকাতা যাওয়া চলবে। উলুর কাছে গিয়ে আরো কিছু টাকা না আনলে চলছে না তার। জামা কাপড় সব ছিঁড়ে গেছে—ময়লা হয়ে গেছে। জুতোর অবস্থা আরো খারাপ। আরো হাজারটা টাকা এনে ইউনিট একদফা ধোপদোরস্ত হয়ে ভদ্রলোক সাজবে। কাউকে কিছু না বলে ইউনিট তার পুরানো পোষাকটা পরে বেরুলো। সাহেবি পোষাক, প্যাণ্ট কোট এবং হ্যাট আছে মাথায়। চড়লো এসে গাড়ীতে।

উলুর কোনো খবরই জানে না ইউনিট—সেই যে হাজার টাকা নিয়ে গেছে এ পর্য্যন্ত আর আসেনি—সুতরাং সে ভাবছে উলুর সঙ্গে দেখাটা করবে কি করে। উলু তাকে কেন যেতে নিষেধ করেছে তা সঠিক না জানলেও ইউনিট বুঝেছে অতবড় লোকের বাড়ীতে যখন বিয়ে হয়েছে তখন নিশ্চয়ই উলু তার পূর্ব্ব জীবনের

কথা গোপন করেই ঢুকেছে ওখানে। তাই ইউনিটকে যেতে নিষেধ করেছে।

কিন্তু কেন? উলুতো খারাপ মেয়ে নয়। তার জীবনটা নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক—ইউনিট তাকে খারাপ করতে চেয়েছিল, উলু পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে—কিংবা কে জানে কি সে করেছে—কি করে ও-বাড়ীতে বিবাহিতা হয়েছে—ভাবছে ইউনিট! পৌঁছালো। বাইরে থেকেই বুঝতে পারলো বাড়ীটার যেন সেই শ্রী-সৌন্দর্য্য নেই। কেন। কি হয়েছে?

ইউনিট গেটের কাছ থেকে সবে সেই গলির দিকে গেল, যেখানে সে টাকা নিয়েছিল উলুর কাছে। দরজা বন্ধ। খুলবে নিশ্চয়ই। পূজারতি হবে তো মন্দিরে। তখন যাবে ইউনিট। কিন্তু রাত নটা বেজে গেল—মন্দির তো খুললো বলে মনে হয় না। ইউনিট এই দীর্ঘ সময়টা এদিক ওদিক ঘুরে কাটিয়েছে এক কাপ চা আর একখানা টোষ্ট খেয়েছে। পকেটে যা আছে তাতে আরো দু'চার দিন তার চলে যাবে কিন্তু তার পর কি হবে? কারখানার কাজ কবে পাবে কে জানে। এখন সে ফিরে যাবে কি না ভাবছে। ইউনিট কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস করছে না—এ বাড়ীতে উলু আছে কি না। উলু যদি তাকে যেতে নিষেধ না করতো তাহলে ইউনিট সটান ভেতরে গিয়ে বলতে পারতো উলুর সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। কিন্তু না—নিশ্চয় বিশেষ কোনো কারণে উলু তাকে আসতে নিষেধ করেছে। সে গেলে যদি উলুর কোনো অসুবিধা হয়—ক্ষতি হয়—অমঙ্গল হয়। ইউনিট অনেক ভাবলো—অবশেষ আজকার যাত্রাই খারাপ বলে ফিরতে লাগলো শ্রীরামপুরে যাবার জন্য। যাবার আগে আর একবার সেই গলিটা ঘুরে দেখে গেল ইউনিট।, না—খোলে নি দরজা—মন্দিরও খোলে নি। হোল কি?

চিন্তিত ইউনিট চলে গেল—কিন্তু টাকা ৬—দ করতে রাজি
পরদিন সে কিছু বেশী টাকা পয়সা সংগ্রহ করে
শ্বশুর বাড়ীর দরজায়। দিনের বেলায় এল। এসে দেখ—ন্নী?
কাছারিতে কয়েকজন লোক কাজ করছেন। তাদের মধ্যে একজন
বয়স্ক—অপর দুজন যুবক; একটি মেয়ে বয়স ত্রিশ হবে। ওঁরা
নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। ইউনিট ভেতরে ঢুকবে কিনা
ভাবছে। হঠাৎ একটা কথা শুনতে পেল। ম্যানেজার বলছেন:

'খুন'—ইউনিট থেমে গেল। কে খুন হোল? উলু? কাকে খুন
করেছে? উলুকে? না-না না—ইউনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো
জানালার আড়ালে—শুনছে,

—পুলিসী কুকুর লাগালে হয় না?

—হয়—সবই হয়—হয়ে কি হবে। সে আর নেই! গিন্নীমার
কথা আজ মনে পড়ছে—কিছুই রক্ষা করা গেল না রমেন—সবই
নিল ঐ শয়তান হারাধন।

ব্যাপার কি? ঘটেছে কি? ইউনিট ঢুকে কি জিজ্ঞাসা করবে?
না—ইউনিট যাবে না—যাওয়া উচিৎ হবে না—বাইরে থেকেই
জানতে হবে সব।

—কে? কে ওখানে?—প্রশ্নটা কড়া সুরে এল ভেতর থেকে।

—ভিখিরি। কিছু দেবেন বাবা!—ইউনিট মাথাব টুপিটা
পাতলো।

ম্যানেজার দেখলেন ইউনিটকে। ছেঁড়া ময়লা জামা প্যান্ট
টুপিটাও আস্ত নেই—লোকটা খোঁড়াচ্ছে—বললেন,

—ভিখিরি তা এখানে কেন? এটা অফিসঘর—যাও—

—কোন্ দিকে যাব বাবা? কোথায় ভিক্ষে পাব? কাল থেকে
উপোস আছি।

ইউনিটকে জবাব দেবার পূর্ব্বেই ওদিকের দরজা দিয়ে এক যুবক

কথা গোপন কা-থলো ইউনিট। সুন্দর পোষাক পরা হাতে ঘড়ি নিষেধ করে-্প নয়—ম্যানেজার এবং আর সকলে নমস্কার করলেন।

কি-ভনিট তৎক্ষণাৎ সরে গেল জানালার কাছ থেকে কিন্তু সে জানতে চায় আরো কি কথা হবে এখানে—তাই কাছের একটা মেহদী ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালো সে। ঘন ঝোপ, ওকে কেউ দেখতে পাবে না।

—শুনুন ম্যানেজার বাবু—যুবক বললো—পুলিশ জানতে চায় অমিয়র ব্যাঙ্কের পাশ বই, চেক বই আর আর কাগজপত্র কোথায় আছে।

—পুলিশ এ রকম প্রশ্ন করলে আমি জবাব দেব হারাধনবাবু।

—আমাকে বলতে চান না?

—আজ্ঞে না—নিষেধ আছে।

—ম্যানেজারবাবু, আপনি পুরানো লোক—আপনি দেখুন অমিয়র খোঁজ করবার জন্য আমি কি না করছি। আমার বিশ্বাস—অমিয় খুন হয়েছে—আর—

—আর কি— ?

—যার স্বার্থ বেশী সেই তাকে খুন করেছে।

—কার স্বার্থ বেশী এখানে হারাধনবাবু।—ম্যানেজারের কণ্ঠ কঠোর শোনালো।

—উলুর। সে চরিত্রহীনা। আমার মনে হয় সেই তার নাগরকে দিয়ে অমিয়কে খুন করিয়েছে। তাতে সে অমিয়র সব টাকা তো পাবেই মামার সম্পত্তিও পাবে। কারণ জানেন তো মামার ও উইলের কোনো মূল্য নাই—ওটা বাজে।

—ও উইল তাহলে আপনি করালেন কেন?

—আমি কিছু করাইনি ম্যানেজারবাবু, বিশ্বাস করুন, মামার শর্তমত অমিয় উলুর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটালে উলু কিছুই পাবে

না—তাই এই চক্রান্ত। কারণ অমিয় বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে রাজি হয়েছে, আমি রাজি করিয়েছিলাম।

—আপনি বলতে চান যে অমিয়কে খুন করার জন্য উলুই দায়ী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—উলু এবং অসিতবাবু দুজনেই, তাঁরাই করেছেন এই চক্রান্ত! উলুর অসুখের কথা মিথ্যা; অসিতবাবুর ভ্রমণের কথাও মিথ্যা, তাঁরা হয়তো বাহাল তবিয়তে কাছেই কোথাও আছেন। যথাসময়ে এসে মামার উইল বাতিল করিয়ে উলু সব অধিকার করবে—তারপর বিয়ে করবে যাকে ইচ্ছে।

—অসিতবাবুও এতে জড়িত আছেন বলতে চান?

—আলবাৎ আছেন। নইলে ওভাবে তিনি উলুকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহস করতেন না। মামার হাতে পায়ে ধরতেন। ড্যাঁটসে চলে গেলেন। প্ল্যান তাঁর ঠিকই ছিল ম্যানেজারবাবু।

—পুলিশের কি মত?

—পুলিশের মতটাই বলছি আমি। তাঁরা এইটাই ঠিক বলে মনে করেন। তাই অমিয়র টাকাকড়ি কোথায় কি আছে জানতে চান।

—বেশ—আমি জানাব। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে মিঃ ঘোষাল।

—কি প্রশ্ন?

—আপনি বলেছেন উলুর চরিত্র খারাপ। সে মন্দিরের ছোট দরজা খুলে তার পূর্ব প্রণয়ীকে টাকা দেয়। বারবার আপনি দেখেছেন?

—হ্যাঁ, তিনদিন দেখেছি।

—বেশ—কিন্তু উলুর ঘর খুঁজে দেখা গেছে যত টাকা তার কাছে থাকবার কথা সবই আছে, মাত্র হাজার টাকা কম—এই হাজারটা টাকাই সে তার বাবার কর্মচ্যুত অভাবি একজনকে

দিয়েছে বলেছিল। এখন দেখুন এসব চরিত্রহীনা মেয়েরা টাকাটা আগেই সরায়। তাছাড়া গহনা সে সবই খুলে দিয়ে গেছে।

—ওটা কোন যুক্তিই নয় ম্যানেজারবাবু। উলু গভীর জলের মাছ—ও টাকাটা অমনি রেখে দিয়ে সে প্রমাণ করতে চায় সে নির্দ্দোষ।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই! উলু দোষী তাই নির্দ্দোষ সাজতে চায়। তবু একটা কথা থাকে।

—কি?

—আপনি বলেছেন, আপনি তিনদিন দেখেছেন উলু সেই লোকটিকে হাজার টাকার নোটের তাড়া দিয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে উলু টাকা পেল কোথায়? দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি সেই লোকটিকে ধরে ফেললেন না কেন? তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন থাকে—উলুর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করার স্বপ্নও অমিয় দেখেনি। উলু যাই হোক, অমিয় তাকে গ্রহণ করবে।

—সে মত তার বদলেছিল ম্যানেজারবাবু—

—না, এখন দাঁড়ায় এই যে উলু অসুস্থ, অপ্রকৃতিস্থ অতএব সম্পত্তির উত্তরাধিকার সে না পেতে পারে—খোরপোষ বা চিকিৎসার খরচ পাবে। অমিয়র অনুপস্থিতি বা অপমৃত্যুতে আপনিই মালিক থাকবেন। স্বার্থটা কার বেশী?

হারাধন চুপ করে রইল। কথা যেন তার বেরুচ্ছে না। ম্যানেজার কঠোর কণ্ঠে বললেন,

—এই বাড়ীর গিন্নিমা যখন আমাকে আনেন, অমিয় তখন দু'বছরের মাত্র। তাকে কোলে পিঠে নিয়ে বেড়িয়েছি আমি। অন্ন খেয়েছি এই সংসারের। আমি বেঁচে আছি যতক্ষণ, অমিয়র হত্যাকারীকে আমি রেহাই দেবনা, তা সে যেই হোক, উলু বা অসিতবাবু অথবা শ্রীযুক্ত হারাধন ঘোষাল—

সবেগে বেরিয়ে গেলেন ম্যানেজারবাবু। তাই হবে। ইউনিট অন্য কর্ম্মচারীরাও দেখলো। আর শুনলো ইও—এতটুকু উলুকে বাইরে দাঁড়িয়ে। বাহ-যোগ্যা

ইউনিট আর দেরী করলো না, নিঃশব্দে চলে গেল। খুব বেশ আগে ভাল করে দেখে নিল হারাধনকে।

চলে এল ইউনিট ওখান থেকে—নিঃশব্দেই এল, কিন্তু সবই সে শুনে এল। উলু এখানে নেই। কোথায় আছে সেটা শোনা গেল না। ইউনিট জানে না কোথা থেকে উলু এখানে এসে বিবাহিতা হয়েছিল। উলু অসুস্থ এ খবরটাও জেনে নিয়েছে ইউনিট ওদের মুখ থেকে, আরো জেনেছে, ইউনিট টাকা নিয়েছিল উলুর কাছে, তাই তার চরিত্রে কলঙ্ক দিয়েছে ঐ হারাধন নামক লোকটি যার সঙ্গে ম্যানেজারের বিতণ্ডা বাধলো আজ। সবই জেনে ফেলেছে ইউনিট শুধু উলুর বর্ত্তমান ঠিকানা ছাড়া। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? উলু যেখানেই থাক তার জীবনে যে বিশেষ বিড়ম্বনা জেগেছে তা প্রতিভাত হোল ইউনিটের চোখে।

—আহা!—

কথাটা অস্পষ্ট বেরিয়ে গেল ইউনিটের মুখ থেকে। অদূরে একটা গাছের ছায়ায় বসে ইউনিট ভাবছে, নজর রেখেছে বাড়ীটার দিকে। দেখলো একখানা নতুন গাড়ীতে চড়ে সেই হারাধন বের হয়ে গেল। পোষাক-পরিচ্ছদ মূল্যবান তার। যেন রাজার ছেলে। গেল কোথায়? কেমন করে ওর সব খবর জানবে ইউনিট?

ইউনিটের খুব তেষ্টা পেয়েছে। জল তেষ্টা নয়—মদ তেষ্টা। এই পিপাসা ওর পায় খুব বেশী যখন ও চিন্তিত হয়। একটু মদ তার দরকার এখন। কোথায় পাবে। ইউনিট জানে কোথায় পাওয়া যায়। চলতে লাগলো। এলো একটা আড্ডায়। এখানে

দিয়েছে বলেছিল। অভ্যর্থনা করলো—'দাও তো এক গেলাস—'
আগেই সরায় এসেই। ওর মুখের চেহারা দেখে চেনা দু'একজন
—ও
মাছ -ব্যাপার কি? এতো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?
—খাওয়া দাওয়া হয় নি। দেখছো না বেকার আছি।
—ও হ্যাঁ—

ইউনিট আর কাউকে কিছু বলতে চায় না। নিজের মনেই খানিক ভাববে। এক কোণায় সে বসলো মদের পাত্র আর সামান্য কিছু চাট নিয়ে। মদ একঢোক খেয়েই ভাবতে লাগলো ইউনিট—উলুর জীবনের এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে? ইউনিট স্বয়ং। সেই তো খিড়কীর দরজায় টাকা নিয়েছিল তার কাছে। আর তারই জন্য তার চরিত্রে অপবাদ দিয়েছে ঐ হারাধন—ওঃ মাত্র একদিন এসেছিল ইউনিট, হারাধন বলেছে তিনদিন। মিথ্যাবাদী শয়তান। উলুকে ইউনিট মানুষ করেছে কন্যাস্নেহে। তাকে দোসাদের হাতে দেবার চেষ্টার মধ্যে ইউনিটের অন্য কোনো অপরাধ ছিল না। দোসাদকে ইউনিট ভালই পাত্র মনে করেছিল। আর তার দেনাটাও শোধ করবার মতলব ছিল ইউনিটের। উলু পালিয়ে এসে নিজেকে রক্ষা করেছে—ভাল ঘর-বরে বিবাহিতা হয়েছে। আনন্দের কথা ইউনিটের পক্ষে—কিন্তু—ওঃ ওঃ ॥

ইউনিট হঠাৎ কেমন যেন বিচলিত হয়ে উঠলো—ওঃ। উলুর যা-কিছু দুঃখ দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী একমাত্র ইউনিট। উলুর জীবনের সে প্রবল রাহু, মারাত্মক শনি—দারুণ কুগ্রহ। উলুর সুন্দর জীবনট্যাকে ইউনিট অকালে শুকিয়ে মেরে দিল।

ইউনিট ভাবতে লাগলো আসামের কথা। উলুর বাবার মৃত্যুর কথা—কোম্পানী থেকে উলু আর তার মার টাকা পাওয়া এবং সেই টাকা ইউনিটের মদে ওড়ানোর কথা, উলুর মার জীবনটাকে—

নাঃ—ইউনিট ভাবতে পারছে না—কিন্তু ভাবতেই হবে। ইউনিট আর এক চুমুক মদ খেয়ে চিন্তা করতে লাগলো—এতটুকু উলুকে সে এনেছিল ধানবাদে। সেই উলু বড় হোল, বিবাহ-যোগ্যা হোল—উলুর মা মারা গেল, উলুকে দোসাদের হাতে দিয়ে বেশ কিছু টাকা মারবার ফন্দী করলো ইউনিট—উলু পালিয়ে এলো—নিজেকে বাঁচাল, রাজ-ঐশ্বর্য্যে এসে পড়লো। আবার ইউনিটই তার কাছে টাকা চাইতে এসে উলুকে আবর্জনাকুণ্ডে ফেলে দিল। উলুর যতকিছু দুঃখ দুর্ঘটনা—সবই ইউনিটের জন্য। ইউনিট ভাবছে, উলুর জীবনে ইউনিট প্রচণ্ড অভিশাপ—নিদারুন ধূমকেতু!

ইউনিটের চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে আসছে। নেশা তার হয় না। নেশা হবার মত প্রচুর মদ বহুদিন খায় নি সে, তাই মাঝে মাঝে গাঁজা খায়, খেয়ে নেশাটা একটু জমায়। আজ কিন্তু গাঁজার কথা তার মনে হোল না—মনে হোল তাকে একটা বড নেশায় পেয়েছে, সেটা হচ্ছে উলুর প্রতি তার অগাধ স্নেহ। কোথায় ছিল এত স্নেহ তার অন্তরে? ইউনিট বিয়ে করেনি—ছেলেমেয়ে তার নেই, থাকলে উলুর থেকে তাকে কি ইউনিট বেশী ভালবাসতো?

না—কখনো না—উলুকেই সে কন্যাস্নেহে মানুষ করেছে। উলুই তার ধানবাদের শেষ কয়েকটা বছরের অবলম্বন ছিল। উলুর জন্যই সে কত কি করেছে মনে পড়ে না—তবে করেছে বহু কিছু। শেষে দোসাদের দেনা শোধ করবার জন্য উলুকে বিসর্জন দিতে গিয়েছিল ইউনিট। কিন্তু দোসাদ তার চেখে তখন ভাল পাত্র। পরে অবশ্য ইউনিট বুঝেছে উলু তার যোগ্য যায়গাতেই এসেছিল কিন্তু একি হোল—একি অভিশাপ উলুর জীবনে? এর সব দায়ীত্বই পড়ছে ইউনিটের উপর—এখন করা যায় কি? 'খুন হয়েছে' কথাটা শোনা গেল। কে খুন হয়েছে? উলুর স্বামী?

—হ্যাঁ—তাই। খুন করলো কে? উলু স্বয়ং? অসম্ভব। ঐ হারাধন তাই বলতে চায়—ম্যানেজার অস্বীকার করছিল। হারাধন চায় উলুকে অপরাধী খাড়া করতে আর ম্যানেজার চায় সঠিক হত্যাকারীকে ধরতে। ম্যানেজার যে উলুর হিতৈষী তা তার কথাগুলোতেই প্রমাণ। কিন্তু সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হোচ্ছে না। কি করে জানা যাবে? কে জানাতে পারবে? হারাধন? না—সে উলুকেই অপরাধী করে ম্যানেজারকে কিসব কাগজপত্রের কথা শুধোতে এসেছিল। ম্যানেজার বললেন দেবেন না—ম্যানেজার উলুর হিতৈষী।

বারবার ভাবলো ইউনিট কথাগুলো। বারবার আওড়ালো। মদের গেলাস শূন্য হয়ে গেছে—তবু সে বসে রইল বহুক্ষণ। চিন্তার শেষ নেই—অবশেষে উঠলো—মদের দাম দিল। বেরুলো—আপন মনে বললো—"জীবন যাক—তবু উলুর জন্য যা করবার আমি করবো।" অন্ততঃ উলু যে চরিত্রহীনা নয় তা সে প্রমাণ করবে নিজে উপস্থিত হয়ে। এখনি সে সেটা করতে পারতো—কিন্তু ওবাড়ীতে খুন হয়েছে। সবটা না জেনে কিছু করা উচিৎ হবে না—ইউনিট ভাবলো কথাটা।

বিশদ বিবরণ কোথায় পেতে পারে ইউনিট্? কে তাকে সব কথা বলবে? কেন বলবে? কেউ বলবে না। বলতে পারে ঐ ম্যানেজার—যদি ইউনিট তার সঙ্গে দেখা করে আত্মপরিচয় দেয় আর বলে যে উলু তার পরম স্নেহের ধন—সেই টাকা নিয়েছিল—তাহলে হয়তো ম্যানেজার তাকে বিশ্বাস করে সব বলতে পারেন। ইউনিট হাঁটছে।

সন্ধ্যা পার হোল—রাত হচ্ছে—ইউনিট ঐ বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরছে—আর ভাবছে—কেমন করে সে সব জানবে। জানালার পথে দেখছে ইউনিট—সেই চেয়ারটায় বসে ম্যানেজার

কাগজপত্র দেখছেন—অরো ত্বজন লোক রয়েছে। না, ইউনিট ওখানে যাবে না।

ন'টা বাজলো—ম্যানেজার উঠলেন। বাড়ী যাবেন। বেরুলেন তিনি; হাতে একটা বেতের লাঠি পৌঢ় বয়সের চিহ্ন অথবা ম্যানেজারী আসবাব। ইউনিট পিছু নিল তাঁর। চলছেন ম্যানেজার ইউনিট কিছু দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। ত্বটো মোড ঘুরে তৃতীয় মোড়ে ঢুকবার আগে ম্যানেজার বললেন,

—কে তুমি? আমার পিছনেই বরাবর আসছো দেখছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনাব সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।

—কথা। কি কথা। কে তুমি আগে বল, নইলে পুলিশ ডাকবো।

—না—পুলিশ ডাকবেন না, আমি ছদ্মবেশী গুপ্তচর—ওবাড়ীতে যে খুনটা হয়েছে তার তদন্ত করতে চাই।

—কে তোমাকে নিযুক্ত করেছে?

—কেউ না—আমি নিজেই এসেছি।

—কি তোমার স্বার্থ?

—স্বার্থ এই যে আপনি ওবাড়ীর পুরাতন লোক। যদি আপনি আমাকে নিযুক্ত করেন আর আমি ঠিকমত খুনের তদন্ত করে আসামীকে ধরতে পারি তো সরকার থেকে আর আপনার কাছ থেকেও পুরস্কার পাব।

—আমাকে কেন ধরেছ তুমি? ওবাড়ীর কর্ত্তাকে ধরগে।

—না—আমার মনে হয় ওবাড়ীর কর্ত্তা—মানে হারাধন বাবুই অপরাধী।

ম্যানেজারবাবু অল্পক্ষণ ভেবে বললেন,

—তোমাকে নিযুক্ত করার কিছু নেই—তুমি যদি আসামীকে ধরতে পার তো পুরস্কার পাবে—

—আমার কয়েকটা জিজ্ঞাস্য আছে—যা আপনার কাছে জানতে চাই।

—কি বল?

—উলু কোথায়? কি তার অসুখ? কবে কোথায় কি ভাবে এই খুনটা হয়েছে ইত্যাদি আমার জানা দরকার। আর সামান্য খরচের টাকা যা হাতে না থাকায় আমি ঠিকমত কাজ করতে পারছিনা।

—কত টাকা?

—এই দশ-বিশ বেশী না—কারণ আমি এখানকার লোক নই। গিয়ে টাকা আনতে দেরী পড়ে যাবে। তাতে হত্যাকারীর পালাবার সুযোগ ঘটতে পারে।

—হ্যাঁ—আচ্ছা—এসো তুমি, আমার বাড়ীতে কথা হবে।

ম্যানেজারবাবু নিয়ে গেলেন ইউনিটকে নিজের বাড়ীতে। বললেন—তোমাকে সকালে কি আমি দেখেছিলাম কাছারির জানালায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—হারাধন কি তোমাকে দেখেছে?

—না—আমি সরে গিয়েছিলাম। ওকে আমি দেখা দিতে চাই না।

—কেন?

—আমার বিশ্বাস সেই একাজ করেছে।

—কি জন্য তোমার এ বিশ্বাস হোল? উলুই যদি করে থাকে!

—অসম্ভব—

ইউনিটের কণ্ঠ জোরালো হয়ে উঠলো। ম্যানেজার বললেন,

—কি প্রমাণে তুমি উলুকে নির্দোষ মনে কর।

—আমি উলুকে চিনি—ইউনিটের চোখ থেকে নেশা কেটে গেছে—বললো,—উলু আমার অতি স্নেহের ধন ম্যানেজারবাবু, আমি

মেয়ের মত তাকে বড় করেছি। সে আমার—ইউনিট হঠাৎ বসে পড়লো ম্যানেজারের পায়ের কাছে—পা দুটো ধরে বললো, —আমি—আমিই টাকা নিয়েছিলাম তার কাছে।

—তুমি?

—হ্যাঁ ম্যানেজারবাবু—আমি। তার সব দুর্ভাগ্যের মূলে আমি। আমি তার রাহু আমি তার শনি আমি তার· ....

—থামো—কেঁদোনা—ম্যানেজার সস্নেহে বললেন,—বুঝলাম উলুর সঙ্গে তোমার ভালই পরিচয় আছে। সে কার মেয়ে?

—সে অনেক কথা ম্যানেজারবাবু, পরে শুনবেন। শুধু শুনুন উলু খুব ভাল বংশের মেয়ে—ভাল লোকের মেয়ে—সতী মেয়ে উলু।

—তুমি কি করতে চাও?

—জীবন পণ করে উলুর জন্য খাটবো আমি। তাকে অন্ততঃ হত্যার অপরাধ থেকে বাঁচাব—ফাঁসীতে ঝুলতে দেব না। বলুন সব ঘটনাটা বলুন—টাকা তার কাছে আমিই নিয়েছিলাম।

—শোন—

ম্যানেজার সবই বললেন ইউনিটকে।

ইউনিট শুনলো—ভাবলো খানিক—তারপর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল। কয়েকটা টাকাও দিলেন ম্যানেজরবাবু তাকে। রাত অনেক।

নীরার পাটোয়ারী বুদ্ধি কিছু কম নয়। বরং অতিশয় তীক্ষ্ণ। চাঁদকোনা থেকে ফেরার পথে হারাধনের সঙ্গে তার যে কয়েকটা কথা হয়েছিল তাতেই সে বুঝতে পেরেছিল—হারাধন তাকে বিয়ে করতে চায় না—শুধু অমরবাবু নীরাকে পছন্দ করেছেন বলেই

নীরাকে হারাধন নিতে চাইছে। নীরাকে ভালবাসা দূরে থাক হারাধন তাকে ঘৃণাই করে। নীরা জীবনে অনেক ধাক্কা খেয়েছে অনেক দেখেছে। গোপন পরামর্শের মধ্যে ছিল অমরবাবুকে হত্যা করার ফাঁদ পাতা। নীরা বলেছিল কাজটা ঠিক হবে না। কারণ সে তখনি বুঝতে পেরেছিল—অমরবাবুর ইহলোক ত্যাগ মানেই নীরারও হারাধনকে লাভের আশা শূন্য। হারাধন যতই চালাক আর বুদ্ধিমান হোক নীরাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি। নীরা বরাবরই বুঝে আসছে কাজটা হাসিল হলেই হাবাধন তাকে তাড়াবে।

ঈশ্বর সহায় হারাধনের, কাউকে কিছু করতে হোল না; অমরবাবু স্বয়ংই মহাপ্রয়াণ করলেন। অতএব উইল বদলের বা অন্য কোনো বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত হোল হারাধনের মন থেকে কিন্তু নীরার মনে অগাধ চিন্তা জেগে উঠলো। সে বেশ বুঝতে পারলো, অবিলম্বে তাকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু অত সহজে বিদায় নেবার মত মেয়ে নয় নীরা। সে হারাধনকে এমন এক ফাঁদে জড়িয়ে দিতে চায় যাতে নীরাকে সে আর ছাড়তে না পারে। এই পরামর্শটা সে করলো যদু উকীলের সঙ্গে। যদু উকীল বেশ ওস্তাদ লোক। সে হারাধনকে জানিয়ে দিল যে অমিয় বেঁচে থাকতে হারাধন নিষ্কণ্টক নয় কারন অমরবাবুর উইলের কোন মূল্য নাই। যদি অমিয় পৃথিবীতে না থাকে তো হারাধনই মালিক। নীরা এই সুযোগ গ্রহণ করে হারাধনকে পরামর্শ দিল 'চাঁদকোনায় জমিদারদের যে গেষ্ট হাউসটা পড়ে আছে, সেদিন তারা দেখে এসেছে মাঠের উপর জঙ্গলঘেরা ঐ যে বাড়ীটা, ওতেই অমিয়কে বন্দী করে · না—নীরা বললো—'অত সহজে মারা হবে না— কারণ আছে। ওর ঠাকুমার দেওয়া নগদ টাকাটাও আদায় করে নিতে হবে—হারাধন টাকা তোলার ক্ষমতাটা অমিয়র কাছে আদায়

করে নিক। অতগুলো টাকা, আট দশ লাখ বা তারও বেশী—এ ছাড়লে পাপ হবে।'

—ঠিক কথা—ওটাকাটা আমি না নিলে উলু পেয়ে যাবে।

—হ্যাঁ—তাইতো বলছি, উলু আছে অঞ্জনা আছে সবশেষে সরকারী তহবিল আছে, অমিয়কে মারার আগে ও টাকা যেমন করে হোক আদায় করে নেওয়া হোক—বুঝলে!

—হ্যাঁ নিশ্চয়—বললো হারাধন।

বুদ্ধি তার যতই থাক—নীরার বুদ্ধির কাছে সেটা নেহাৎ কাঁচা।

নীরা অমিয়কে বাঁচিয়ে রেখে টাকাটা আদায় করে নেবার ব্যবস্থা করলো। অমিয়কে বাঁচাবার জন্য কোনো দরদ তার নেই কিন্তু নীরা জানে—হত্যার দায়ীত্ব খুব বেশী। সাধারণ রাহাজানি বা গুম করা বা টাকা আদায় করা আর একবারে মানুষ খুন করায় অনেক তফাৎ। নীরা ঠিক করলো এই সাংঘাতিক কাজটায় সে হারাধনকে জড়িয়ে দেবে এবং নিজে তফাতে থেকে দেখবে কি কতদূর হোল। যদি হারাধন ঠিকমত কাজ সেরে বেরিয়ে আসতে পারে তো তারপর নীরাকে ছাড়া তার পক্ষে অসম্ভব হবে কারণ নীরা তার এই অতিমানুষিক সৎকর্মের সাক্ষী থাকবে। অতএব নীরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ না করলে হারাধনের আর উপায় থাকবে না। অন্ততঃ নীরা খুসিমত হারাধনকে 'ব্ল্যাকমেল' করতে পারবে। অনেক ভেবেই নীরা এই পরামর্শ দিয়েছিল এবং অমিয় কখন যাবে চাঁদকোনায় তারও খবর জানতে পেরে হারাধনকে জানিয়ে দিয়েছিল। তবে খুনের ঝুঁকি নীরা নিতে চায় নি—তাই বলেছিল,

—ছদিনে না হোক দশদিন আটকে রাখ। অত্যাচার কর, প্রথম প্রথম মৃদু তারপর কঠোর—তার সঙ্গে ভয় দেখানো খাবার বন্ধ

চলতে থাক। সব টাকাটা তোমাকে দিলে তারপর তাকে মারবে কি না ভাবা যাবে।

হারাধন এপরামর্শ নিতে কার্পণ্য করলো না—এর প্রধান কারণ অমরবাবুর উইলটা যে তাঁর খোসখেয়াল মাত্র, আদালতে এটা মোটেই টিকবে না তা সে জেনেছে। এমন কি অমিয়কে মেরে ফেললেও সম্পত্তি হারাধন পাবে না, সেটা হবে উলুর। অতএব অমিয়কে মেরে লাভ হবে না—তার চেয়ে ঠাকুমার দেওয়া নগদ টাকাটা যদি হারাধন পায় তো স্বচ্ছন্দে তার এ জীবন চলে যাবে। বহু টাকা—কত টাকা ঠিক জানে না হারাধন। জানবার উপায় নাই, সে সব কাগজপত্র কার কাছে আছে তাও ঠিকমত জানা যাচ্ছে না। হয়তো কোনো ব্যাঙ্কের সেফ্ ডিপোজিট ভল্টে আছে। অতি সামান্য মাত্র লাখখানেক টাকা আছে অমিয়র নামে একটা ব্যাঙ্কে। মোটা টাকাটা হয়তো গভর্ণমেণ্ট লোন বা অনুরূপ কিছুতে রয়েছে। কোম্পানীর কাগজগুলো কোথায় রেখেছে অমিয় ?

যাক—সবই জানা যাবে অমিয়কে কয়েকদিন আটকে রাখলেই। অত্যাচারও করতে হবে হয়তো—হ্যাঁ, সহজে কি সে দিতে চাইবে ? না—চাইবে না। তবে হারাধন মতলব করলো ব্যাপারটা সে করাবে নাথুকে দিয়ে ; নিজে থাকবে সম্পূর্ণ আড়ালে। এটা যেন ডাকাতের কাজ—

এই রকমই যেন পুলিশ এবং দেশবাসী বিশ্বাস করে। হারাধন অতি সতর্ককার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে। আর নীরা আরো সতর্ক। সে হারাধনকে পরামর্শ দিয়েই খুব খানিকটা তফাতে চলে গেল। দিন কয়েক এলোই না। খবর অবশ্য রাখছে।

মোটরের নম্বরটা কাগজওয়ালারা ছেপে দিয়েছেন, নইলে জানাই যেত না কে গুম হয়েছে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে। ভুল হয়েছে

হারাধনের—অমিয়র মোটরের নম্বর প্লেট সরিয়ে নিতে বললে ভাল হোত। যাক—যা হবার হয়েছে।

পুলিশ সন্দেহ করছে অমিয়কে খুন করা হয়েছে। তার ঘড়ি আংটি এবং নগদ যা ছিল কেড়ে নিয়ে তাকে মেরে কোথাও ফেলে দেওয়া হয়েছে—মৃতদেহ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তবে কাছেই একটা নদী আছে, ওর স্রোতে ফেলে দিলে হয়তো বহুদূরে চলে গেছে দেহটা। খুঁজে অবশ্যই বের করবে পুলিশ।

হারাধন দুটি জল ভরা চোখে আবেদন করছে—যেমন করে হোক অমিয়কে বের করে দিন। যত টাকা খরচ হয় হোক—দরকার হয় পুলিশী কুকুর লাগান।

কথাটা বলেই ভয় পেল হারাধন। পুলিশী কুকুর যদি তাকেই ধরে! না—সে তখন ওখানে ছিলই না। সামলে বললো,

—ভাল গোয়েন্দা লাগান—অমিয় আমার অতবড় মামার একমাত্র বংশধর—তাকে জীবিত বের করতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব—দয়া করুন আপনারা।

—দয়ার কি আছে? এতো আমাদের কর্তব্য। নিশ্চয় আমরা খোঁজ করছি এবং করবো। তবে কেশটা জটিল। সময় লাগবে।

—জটিল কেন? এতো একটা সিম্পল ডাকাতি!

—তা না হতে পারে—অফিসার বললেন কথাটা। হারাধন কেমন যেন একটু বিস্মিত হোল। কিছুক্ষণ ভেবে বললো,

—এরকম সন্দেহ হয় আপনাদের?

—হ্যাঁ—সন্দেহ আমরা নানা দিক থেকে করে থাকি। এমন কি আমরা আমাদের নিজকেও সন্দেহ করে কাজ করি। আপনাকে সন্দেহ করতেও আমরা দ্বিধা করবো না।

কথাটা অতর্কিতে বলে উঠলেন অফিসার ইনচার্জ—হারাধনের মুখ এক মুহূর্তের জন্য পাংশু হয়ে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলল,

—আপনাদের যা নীতি তা অবশ্যই আপনারা মানবেন। বেশ—সন্দেহভাজনদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে ধরুন আপনারা। তবে আমার বিশ্বাস এ নিছক ডাকাতি—হয়তো অমিয় সহজে টাকাকড়ি দিতে চায় নি—তাই ডাকাতরা তার উপর গুলি চালায়—

—গুলি চালানোর কোনো প্রমাণ নেই। গুলি চলেনি, চলেছে ক্লোরোফর্ম।

—তাও হতে পারে—তাকে অজ্ঞান করে টাকাকড়ি নিয়েছে।

—টাকাকড়ি নেওয়া আর মানুষটাকে নেওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে হারাধনবাবু। তারা বাঘ নয় যে মানুষ খাবে। নিশ্চয় অপর কোনো উদ্দেশ্য আছে। যাই থাক—আমরা বের করবো।

—অনেক ধন্যবাদ—অনেক—অনেক—দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব ধরতে পারলে।

—আচ্ছা—

নমস্কার জানিয়ে চলে এল হারাধন। কিন্তু তার রীতিমত ভয় জাগছে। নীরার সঙ্গে দেখা হলে তার কাছে কিছু সাহস পেতে পারতো হারাধন। নীরা নেই এখানে—কলকাতাতেই নেই। অমিয় গুম হবার আগের দিন সে এলাহাবাদের সঙ্গীত সম্মিলনীতে যোগদানের জন্য চলে গেছে এবং সেখানে যোগ দিয়েছে। কাগজে বেরিয়েছে খবরটা। ওখান থেকে ওরা নাকি দিল্লী যাবে—অর্থাৎ ঘটনাটা ঘটবার সময় নীরা দেশেই ছিলনা—নীরা সুকৌশলে তার প্রমাণ রাখলো।—হারামজাদী।

কথাটা বললো হারাধন কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুঝলো নীরার খপ্পর থেকে তার আর রেহাই নেই। নীরার সাহায্যে সে যতটা অগ্রসর হয়েছে তারপর আর ফেরা যায় না—নীরা কিন্তু বেশ ঝাড়া-মোছা আছে। তাকে ধরবার ছোঁবার মতো কোনো প্রমাণই

সে রাখেনি। হারাধন বুঝলো নীরা অতিশয় সাবধানী মেয়ে। ধরা যদি পড়ে তো হারাধনই পড়বে—নীরা দিব্যি ফাঁকে বেরিয়ে যাবে। আর না যদি ধরা পড়ে তাহলে নীরা এসে ভাগ বসাবে হারাধনের সম্পদে। রাগটা খুবই হচ্ছে কিন্তু এখন আর উপায় কিছু নাই। হারাধন অমরবাবুর প্রাসাদে ফিরছে।

গলির মোড়ে কে ও! সেই লোকটা নয়? সেই যে উলুর কাছে টাকা নিয়েছিল—হ্যাঁ, সেই তো—সেই! হারাধন গাড়ীর গতি মন্থর করলো—থামালো, নামবে। কিন্তু কৈ লোকটাকে তো আর দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেল? হারাধন চারদিকে তাকালো—না—কেউ নেই। ঐ সরু গলিটার মধ্যে ঢুকে গেছে বোধ হয়। যাকগে। ওকে আর কোন্ কাজে লাগবে হারাধনের?

গাড়ীটা চালিয়ে ঘরে ঢুকলো হারাধন।

শহরের বহু ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত অসিতবাবু সুতরাং সংবাদটা তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে পড়লো এবং দলে দলে বন্ধুবান্ধব এসে দেখলেন অসিতবাবুর পায়ের তলায় বসে এক প্রস্তর-প্রতিমাকে। উলুকে আর মানুষ মনে হয় না। শুধু চোখ দুটি থেকে জলধারা গড়াচ্ছে দেখেই বোঝা যায় সে জীবিত। স্থাণুবৎ বসে আছে উলু। কেউ ওকে কোনো প্রশ্ন পর্য্যন্ত করতে সাহস করছেন না। উলু বসে আছে---বসেই রইল, শেষ কৃত্যের জন্য বন্ধুরা এগিয়ে এলেন।

উলু যেন পাথরের মূর্ত্তির মত বসে আছে। কিন্তু তাকে দরকার। কারণ হিন্দু-সংকারের নিয়ম অনুযায়ী তাকেই মুখাগ্নি করতে হবে। কথাটা বললেন একজন ভদ্রলোক উলুকে। উলু যেন চমকে উঠলো। কি ভেবে বললো,

—আমি তো ভিন্ন গোত্রা – বিবাহিতা মেয়ে।

—তা হোক, তুমি ছাড়া আর কেউ অধিকারী নেই এখানে।

উলু কি যেন ভাবলো ; সমাগত ভদ্রলোকরা আবার বললেন,

—তোমাকেই একাজ করতে হবে মা—এসো এগিয়ে এসো।

উলু সচল হোল। মাটির প্রতিমা যেন নড়ে উঠলো। ওঁরা বললেন,

—কি আর করবে। মৃত্যুর উপর কারো হাত নেই। এসো।

কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। উলুকে তাঁরাই নিয়ে গেলেন। কাজ শেষ করে উলুকে হোটেলে ফিরিয়ে আনলেন তাঁরা। উলু ম্যানেজারকে বললো—'কলকাতার বাড়ীতে খবরটা দেওয়া হোক।' এই সব কথা উলু স্বাভাবিক ভাবেই বললো। তাই সকলে ভাবলেন উলুর আর কোনো অসুখ নাই। সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। কলকাতা থেকে লোক এসে তাকে নিয়ে যাবে এই কথাই জানালো সে ম্যানেজারকে। চুপচাপ শুয়ে রইল বিছানায়।

অসিতবাবু নামকরা লোক—বহুদিনের পুরানো দেশকর্ম্মী। বর্ত্তমানে যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রে জড়িত নেই তবু বহু জনগণ-মান্য এই লোকটির মহাপ্রয়াণে সকলেই ব্যথিত হলেন। খবরটা বেতারে এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হোল। আগেই বললেন আকাশ-বাণী দিল্লীর খবরে—

"প্রবীন দেশকর্ম্মী অসিত বরণ চৌধুরী মহাশয় আজ ভোর রাত্রে দিল্লীর হোটেলে দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুয়ান্ন বৎসর মাত্র। একমাত্র পুত্র নীলোৎপল নিরুদ্দেশ হওয়ার পর কন্যা শ্রীমতী উলুপীকে নিয়ে তিনি দেশভ্রমণে বের হন—ভারতের বহু স্থান পরিদর্শন করে দিল্লীতে এসে বিশ্রাম করছিলেন, অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। পুত্র নীলোৎপলের কোনো সংবাদ না পাওয়ায়

তাঁর শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছিল—কন্যাটিও খুব সুস্থ ছিল না। বর্ত্তমানে সে কিছু ভাল আছে। দেশবাসী এই দেশকর্ম্মীর বিয়োগে আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছেন।"

সংবাদটা বেতারে শুনছিল নীলোৎপল হরিদ্বারের একটা আশ্রমে বসে। সকালের সংবাদ "পুত্র নীলোৎপল নিরুদ্দেশ; অসিতবাবুর একমাত্র কন্যা উলুপীই শেষকৃত্য সমাপন করলেন—"

কে এই অসিতবাবু? তার বাবা? হ্যাঁ, নীলোৎপল নিরুদ্দেশ—অর্থাৎ নীলু—কিন্তু কন্যা উলুপী কে? কে এই উলু? নীলুর তো কোনো বোন নেই। আশ্চর্য্য হচ্ছে সে। তাহলে অন্য কোনো অসিতবাবু হবেন—ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। নীলোৎপল অস্থির হয়ে উঠলো সঠিক খবর জানবার জন্য—কিন্তু এখানে আর বেশী কিছু জানবার উপায় নাই। বন্ধু কুমারকে বলে সে তৎক্ষণাৎ দিল্লী রওনা হয়ে গেল। পৌঁছালো সন্ধ্যা নাগাদ—সটান গিয়ে উপস্থিত হোল হোটেলে।

—অসিতবাবু নামে কোনো ভদ্রলোক এখানে মারা গেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনি কি তাঁর কোনো আত্মীয়?

—হ্যাঁ—আমি তাঁর কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

—আসুন—তিনি কিন্তু খুব সুস্থ নেই। সাবধানে কথা বলবেন।

ম্যানেজার নিয়ে গেলেন নীলুকে উলুর ঘরে। উলু উঠে বসলো; তাকিয়ে দেখলো নীলুকে। শুধোলো,

—আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন? কি দরকার?

—দরকার অন্য কিছু নয়—আপনার বাবা অসিতবাবুকে আমি চিনতাম।

—ও—অনেকেই তাঁকে চিনতেন—

—না—আমার চেনার ব্যাপারটা কিছু স্বতন্ত্র। শুনুন—

আমাকে তিনি মানুষ করেছেন। আমি তাঁর বাড়ীতে ছিলাম—অবশ্য সে অনেক দিনের কথা।

—ছিলেন—তাতে কি! আপনাকে আমি চিনিনে!

—না—চিনবেন না। এখন আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—অসিত-বাবুর মেয়ে ছিলনা। একটি মাত্র পুত্র—নাম নীলোৎপল—সে নিরুদ্দেশ। আপনি কে তাঁর?

উলু তাকালো নীলুর পানে এতক্ষণে। বেশ কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললো,

—আমি তাঁর পালিতা কন্যা—আমাকে তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন—না—আমি তাঁকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম—উলু কথাগুলো স্বাভাবিক ভাবেই বলছে।

নীলুকে ম্যানেজার আগেই জানিয়ে দিয়েছেন মেয়েটি খুব সুস্থ নন—নীলু সতর্ক হোল। উলু ঠিক কথা বললেও হয়তো খুব সুস্থ নয় এখনো। তাই আর এ বিষয়ে কিছু না জিজ্ঞাসা করে অন্য কথা বললো,

—কলকাতায় কখন ফিরবেন আপনি?

—জানিনা। ওখানকার কেউ এলে ফিরবো। খবর দেওয়া হয়েছে ম্যানেজারকে।

—চলুন—আমি আপনাকে কালই পৌঁছে দিই কলকাতায়!

—আপনি কেন দেবেন? দিলেও আমি যাব কেন? কে জানে আপনি শত্রু না মিত্র—কে জানে আপনি হারাধনের লোক কিনা?

—হারাধন কে?

—হারাধন আছে। খুব ভাল লোক হারাধন। আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আপনাকে সেই হয়তো পাঠিয়েছে। যান—সুবিধে হবে না এখানে।

উলু শুয়ে পড়লো খাটে। মাথাটা বালিশে গুঁজলো। নীলু

বুঝলো তাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। নীচে গিয়ে সে ম্যানেজারকে শুধোলো

—কলকাতায় খবর কখন দেওয়া হয়েছে?

—সকালেই দিয়েছি। ওঁরা কেউ নিশ্চয় আসবেন। প্লেনে যদি আসেন তো এখনি পৌঁছে যাবেন। ট্রেনে এলে কাল আসবেন। আপনি কি অপেক্ষা করবেন?

—হ্যাঁ—ওকে কলকাতা নিয়ে যেতে হবে।

নীলু অপেক্ষা করে রইল। রাত দশটা নাগাদ এলেন ম্যানেজার বিকাশবাবু! তিনি উলুর সঙ্গে দেখা করবার আগেই নীলু দেখা করলো তাঁর সঙ্গে।

—নীলু?

—হ্যাঁ কাকাবাবু—আমিই।

—কোথায় ছিলে?

—সব বলছি—বসুন।

নীলু আর ম্যানেজার নীচেই কথাবার্তা কয়ে নিলেন। ঠিক হোল—কালই উলুকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে। নীলুর পরিচয় ম্যানেজার দেবেন উলুকে। সতর্ক ম্যানেজার অমিয় সম্বন্ধে নীলু বা উলুকে কিছু বললেন না।

ম্যানেজার দেখা করলেন উলুর সঙ্গে। উলু বললো—কলকাতায় আমি কার কাছে যাব? যাব না আমি। এখানেই কোথাও থাকবো। আমাকে কোনো আশ্রমে দিন না-হয় মরে যেতে দিন। আটকাবেন না। আমার এই পৃথিবীতে কোনো কাজ নেই।

—বাবুর অতবড় বিষয়টার তুমি মালিক উলু—বাবুর শেষ ইচ্ছা—

—না—আমি কেন মালিক হব? মালিক দাদা—তিনি আসবেন, তাঁর সম্পত্তি তিনি নেবেন। আমি কে? আমাকে

বাবা মাসে হাজার টাকা নিতে বলেছেন। কি হবে হাজার টাকায়? একশ' টাকা দেবেন আমাকে—তারও দরকার নেই।

—দাদা ফিরলে তোমার সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা করে তাই হবে।

—না—দাদা যদি না ফেরে? দাদা নিষ্ঠুর—অমন স্নেহময় বাবাকে ছেড়ে অকারণ চলে গেছে।

নীলু ওখানেই বসেছিল। উলুর কথা শুনতে শুনতে তার দুই চোখে জল আসছে। হঠাৎ বলে ফেললো,

—তোর দাদা ফিরেছে উলু। আমি তোর সেই নিষ্ঠুর দাদা। চল—বাড়ী চল। বাবা নেই, আমি আছি। ভাই-বোনে বাবার ইচ্ছে পূরণ করবো—

উলু তাকিয়ে আছে নীলুর দিকে। মুখে কথা নেই।

—উলু!—

নীলু ডাকলো। অনেকক্ষণ পরে আস্তে বললো উলু,

—তুমি তোমার সম্পত্তি নাও—আমাকে নিয়ে গিয়ে কি হবে? আমার আর পৃথিবীতে কোনো কাজ নেই…… ..

—আছে। বিস্তর কাজ আছে তোর। অমিয়কে আমি ভালই চিনি। চল, আমি দেখবো সে তোকে কি করে পরিত্যাগ করে। আমি বিশ্বাস করি—সে তোকে ফিরে নেবে।

—তাঁর বাবা—

—তাঁর বাবা নেই। তিনি চলে গেছেন মা উলু—তিনি দেহ রেখেছেন।

—কতদিন হোল?

—তা মাস খানেক হবে।

—ওঁর ছেলের খবর কি?

—ভালই। সে ফিরেছে। তোমাকে না প্যাওয়ায় কোনো

কিছুই করা যাচ্ছে না হিমালয় থেকে বাবু কোনো খবর আমাকে দেন নি। তাই কিছুই তাঁকে জানাতে পারিনি আমি।

—চল উলু—নীলু বললো—যতক্ষণ আমি আছি তোর কোনো ভাবনা নেই। তাছাড়া বাবা তো তোকেই সব দিয়ে গেছেন।

—ও নিয়ে কি হবে আমার? ওসব তোমাব—তুমি নিও।

—আচ্ছা তাই হবে। চল, কাল বাড়ী যাই। কেমন?

—হুঁ—চল।

উলু ঘুমোলো। বেশ কিছুক্ষণ ঘুমোলো উলু। ওদিকে ম্যানেজার ভাবছেন—অমিয়র কথা উলুকে তো বলাই চলে না—নীলুকেও তিনি এখন বলবেন না। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন, —ফোনে তাঁর মুখ থেকে অমিয়র খবর পেয়েই অসিতবাবু অজ্ঞান হয়ে যান। তিনি তাই এদের কিছু বললেন না:

পরদিন সব কলকাতা এলেন ওঁরা।

নীলোৎপল উলুকে নিয়ে কলাতায় ফিরলো; উলু ভালই আছে। দেখলো সবাই তাকে। ম্যানেজার এসেই সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন যেন অমিয়র সম্বন্ধে কোনো কথা উলুকে জানানো না হয়। তবে নীলুকে অবশ্যই জানাতে হবে। বাড়ীতে আর যারা আছে তারা সকলেই বললো—ম্যানেজারবাবুই জানাবেন নীলোৎপলকে।

কাজটা গুরুতর কিন্তু প্রয়োজনীয়। আপাততঃ নীলোৎপলকে বাবার শ্রাদ্ধাদি করতে হবে তার জন্যই আয়োজন করা দরকার। নীলু যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে ক্রটি করবে না। উলুও চায় বাবার শ্রাদ্ধটা ভালভাবে হোক। ফর্দ্দ তৈরী এবং জিনিসপত্র কেনা-

কাটার ব্যবস্থা শিগ্রি করতে হবে; কারণ দশ দিনের চারদিন কেটে গেছে এর মধ্যে।

নীলোৎপল একটু বিশ্রাম করেই ম্যানেজারবাবুকে বললো, —ও বাড়ীতে খবর দিতে হবে কাকাবাবু—অমিয়কে তো ডাকতে হবে ?

—হ্যাঁ—কিন্তু শোন—ম্যানেজার অতি গোপনে কথাটা বললেন 'অমিয় বেঁচে আছে কি না জানা নেই। উলু যেন না শোনে।'

—সে কি! এ খবরটা তো আপনি দিল্লীতে দেন নি ?

—দেওয়া ঠিক হবে না ভেবেছিলাম, কারণ উলুকে আমি জানাতে চাইনে এ খবর।

—ক'দিন গোপন রাখবেন কাকাবাবু? সত্যি কি অমিয় বেঁচে নেই ?

—জানি না। হয়তো নেই। পুলিশ খোঁজ করছে। এখনো সঠিক কোনো খবর পাওয়া যায় নি—আজ প্রায় সপ্তাহ পার হোল।

—উলুকে একথা কি করে জানানো যায় কাকাবাবু ?

—জানাব না—জানানো চলবে না। এখন একথা গোপন থাক—

—হ্যাঁ—কিন্তু আমাকে সব ব্যাপারটা ভাল করে জানতে হবে।

অশৌচ গায়েই বেরুলো নীলু বিকালের দিকে। অমরবাবুর বাড়ীর গেটে ঢুকবে—দেখতে গেল, একখানা নতুন গাড়ীতে হারাধন আর তার পাশে বসে নীরা বেরিয়ে যাচ্ছে।

"নীরা ? হ্যাঁ—সেই তো! নীরাই—"

কথাগুলো আপন মনেই বললো নীলু। ওর আর বুঝতে বাকী রইল না যে ঐ শয়তানি যখন জুটেছে তখন আর কোনো

সন্দেহ নাই যে হারাধনই একাজের নায়ক। কিন্তু সব খবর সে জানবে কি করে? কার কাছে জানবে? মনের অস্বস্তি সে চেপে রাখতে পারলো না—ঢুকলো অফিস ঘরে। কাছারীতে নিজের চেয়ারে বসে আছেন ম্যানেজারবাবু। নীলুকে তিনি ভালই চেনেন এবং অসিতবাবুর মৃত্যুসংবাদও জানেন, তবু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন,

—নীলোৎপল! কবে এলে? কেমন আছ?

—বলছি—বাবা তো গেলেন! এখানকার সব খবর আমাকে জানান ম্যানেজারবাবু।

—জানাচ্ছি। বৌমা মানে উলু কোথায় জানো?

—হ্যাঁ, সে বাবার কাছেই ছিল। সেই বাবার মুখাগ্নি করেছে। আমি রেডিওতে খবর পেয়ে পরে এলাম। উলু ভাল আছে।

—কোথায় আছে সে?

—আমার বাড়ীতেই। তাকে সঙ্গে আনলাম আমি দিল্লী থেকে। তার অসুখ সেরে গেছে। তবে অবশ্য যা খবর শুনছি···· নীলু থামলো।

—হ্যাঁ—খবর খুব খারাপ। আজ ন'দিন হোল অমিয় গুম্ হয়েছে। অবশ্য আমরা আশা করছি সে বেঁচে আছে। তবে যতক্ষণ তাকে না পাওয়া যায় ততক্ষণ ভরসা কি!

—সর্ব্বনাশ। কে একাজ করলো ম্যানেজারবাবু? কেন করলো!

—প্রমাণ না পেয়ে কিছু বলা যায় না নীলু—তবে একাজ করার কারণ স্বয়ং তার বাবাই ঘটিয়ে গেছেন। উলুকে অকারণ চরিত্রহীনতার অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে তাঁর ভাগ্যে হারাধনই কাজ গুছিয়ে নিল—একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ম্যানেজার। বললেন, —আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সহজে কিছু পেতে ওকে দেব না।

—কে পাবে ?

—উলু। তারই সব থাকবে। হারাধন পাবে কাঁচকলা।

—হারাধন কি অমিয়কে খুনই করেছে মনে করেন ?

—না—কারণ হারাধন জানে অমরবাবুর উইলের কোনো মূল্য নেই। অমিয় গেলে উলু পাবে, উলু গেলে অঞ্জনা পাবে। এতোগুলো খুনের ঝুঁকি নিশ্চয় হারাধন নেবে না। আমার মনে হয়—হারাধন চায় অমিয়র ঠাকুরমার দেওয়া নগদ টাকাটা হাত করতে—সে তাই তাকে কোথাও লুকিয়েছে।

—কেন আপনার একথা মনে হয় ?

—কারণ অমিয়র ব্যাঙ্কের কাগজপত্র সে চেয়েছিল আমার কাছে।

—দিয়েছেন ?

—রাম্‌মো! ওকে আমি ভালই চিনেছি। যাক—উলুই সব সম্পত্তির মালিক এখন।

—যদি অমিয়কে না পায় তাহলে সম্পত্তি নিয়ে উলু কি করবে ম্যানেজারবাবু ? ও যে পায় পাকগে। উলুর জন্য বাবা আমার বিস্তর রেখে গেছেন। উলু তো আধা সন্ন্যাসিনী হয়ে আছে।

কথাগুলো যেন কাঁদছে নীলুর কণ্ঠে। ম্যানেজার বললেন,

—সবই সত্যি নীলু। এ বরাত—কি আমরা করতে পারি ?

নীলু আর কি বলবে। আরো যা জিজ্ঞাস্য ছিল জেনে নিয়ে ফিরলো সে বাড়ী পানে। উদাস হয়ে গেছে তার মন। উলুকে তার স্বস্থানে ফিরিয়ে দেবার আর উপায় নাই।

"হা ঈশ্বর।" নীলু যেন হতাশ হয়ে ঈশ্বরকে ডাকলো। এ কি অভিশাপ! উলুর জীবনের যতটুকু সে জেনেছে তাতেই উলুর উপর তার মমতা অসীম হয়ে উঠেছে—আজ আবার এই খবর

পেয়ে উলুর ভবিষ্যৎ ভেবে নীলু যেন অস্থির হয়ে উঠলো—সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি উলুর স্বামী অমিয়কে জীবিত ফিরে পাওয়া যায় তো নীলু এক্ষুনি তা দিতে পারে। কিন্তু ভাগ্য কে কাকে দিতে পারে? পারেন যিনি—তাঁর দরবারে তো যাওয়া যায় না। অন্ততঃ যেতে দেখেনি নীলু কোনোদিন কাউকে।

কিছুদিন আশ্রমবাস ও সাধুসঙ্গ করার ফলে নীলুর মধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাস জেগেছে, তাছাড়া তার পৈত্রিক রক্তে রয়েছে ঈশ্বরে বিশ্বাস। নীলু তাই ভাবলো—ভগবান উলুকে রক্ষা করুন—

উলু বাড়ী এসেই অমিয়র খবর জানবার জন্য লক্ষ্মীকে ফোন করেছিল। কারণ ম্যানেজারবাবু তাকে ওবাড়ী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানান নি। লক্ষ্মী নেই—অঞ্জনার শ্বশুর জানালেন এবং বললেন যে অঞ্জনাকে তিনি পাঠিয়ে দেবেন উলুর কাছে। বিকালে এলো অঞ্জনা—উলু উপরে তার ঘরে বসেছিল।

—বৌদি!

ডাকলো অঞ্জনা—উলু উঠে তাকে জড়িয়ে ধরলো। বললো,

—আয়! সব তোরা ভাল আছিস অঞ্জু?

—হ্যাঁ—বাবা তো গেলেন! ভাল আর কৈ বৌদি?

—শুনেছি। হঠাৎ তাঁর কি এমন হোল অঞ্জু? বেশ তো সুস্থ ছিলেন।

—না—সুস্থ তাঁকে থাকতে দেয় নি হারাধনদা—যাক—বৌদি! আর কোনো খবর জান তুমি?

—না। আর কি খবর অঞ্জু? তোর দাদা কোথায়? শুনলাম ফিরেছেন।

—হ্যাঁ—ফিরেছেন। বাবার শ্রাদ্ধও করেছেন।

—অঞ্জনা মা—হঠাৎ পিছন থেকে স্বয়ং ম্যানেজার ডাক দিলেন।

অঞ্জনা তাকালো। ম্যানেজার তাকে ইশারা করলেন। বললেন,

—শোন মা অঞ্জনা!

—যাই—

কথাটা শেষ না করেই অঞ্জনা এগিয়ে গেল ম্যানেজারের দিকে। উলু আশ্চর্য্য বোধ করলো। ম্যানেজার শুধু বললেন,

—অঞ্জনাকে আমি একটু বাইরে নিয়ে যাচ্ছি মা, দরকার আছে জরুরী।

অঞ্জনা চলে গেল। উলুর মনে জাগলো দারুন সন্দেহ। এমন কিছু কথা আছে যা ওরা উলুকে জানাতে চায় না। সারাদিন লক্ষ্য করছে উলু। কেন? উলু তো ভাল হয়ে গেছে। অমিয় ফিরে এসেছে। উলুকে সে গ্রহণ করবে—বুড়ো শ্বশুর মারা যাওয়ার খবরও শুনেছে। তবে লুকোচ্ছে কি ওরা উলুকে? কেন লুকোচ্ছে? কি কথা লুকোচ্ছে? নিশ্চয় অমিয়র কথা—নিশ্চয় উলুকে আর ফিরিয়ে না নেবার কথা! অথবা · কি! কোনো অমঙ্গল সংবাদ?

উলু বিচলিত হোল—বিরক্ত হোল—বিশেষ কোন একটা অমঙ্গলের ছায়া যেন সে দেখতে পেল। ঝি-চাকর সবাই তার জন্য সহানুভূতিপরায়ণ—সবাই যেন তার দুঃখে দুঃখী—সবাই যেন তারই জন্য চিন্তিত—কেন? কেন? কেন?

উলু জানবেই—ছুটে নেমে গেল উলু লঘু পায়ে, একেবারে নীচের তলায়। শিড়ির নীচের ঘরে কথা শুনতে পেল। নীলু—অঞ্জনা আর ম্যানেজার কথা বলছেন; নীলু বললো,

—উলুকে জানানো চলবেনা অঞ্জনা।

—ক'দিন লুকিয়ে রাখবেন দাদা! —অঞ্জনা কাঁদছে।

—রাখি কিছু দিন—আমার বিশ্বাস অমিয় বেঁচে আছে। পুলিশ নিশ্চয় খোঁজ করে বের করবে—অন্ততঃ লাস বের করবে।

—শোন মা অঞ্জনা—ম্যানেজার বললেন—যতক্ষণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাই ততক্ষণ অমিয়র মৃত্যু বিশ্বাস করা ঠিক হবে না—যদি একান্তই ঈশ্বর বিরূপ হোন……

—উঁ.. উঁ....উঁ...উঁ উঁ.. উঁ.. ....

বাইরে একটা অস্বাভাবিক অনুনাসিক স্বর—তার সঙ্গেই ধপাস করে কি যেন পড়ে যাওয়ার শব্দ। ছুটে বেরিয়ে এলো নীলু—অঞ্জনা এবং ম্যানেজার। উলু পড়ে গেছে দরজার কাছে—অজ্ঞান হয়ে গেছে একেবারে। অঞ্জনা ত্বরিতে মাথাটা কোলে নিল—ম্যানেজার ডাক্তারকে ফোন করতে ছুটলেন—নীলু মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। নাঃ—জ্ঞান ফিরলো না। ডাক্তার এলেন, ওষুদ দিলেন। দীর্ঘক্ষণ অজ্ঞান উলু—রাত কেটে গেল—জ্ঞান হোলনা।।

সহরের খ্যাতনামা তিনজন ডাক্তারকে আনলো নীলু—সর্ব্বস্ব যাক—উলু ভাল হোক। না—উলুর জ্ঞান হয়তো আর ফিরবে না। ডাক্তারগণ বললেন,

—ক্রমাগত দুঃখ পেতে পেতে ওর এই অবস্থা হয়েছে।

তিনদিনের দিন জ্ঞান অবশ্য ফিরলো উলুর। কিন্তু না ফিরলেই ভাল হোত। উলুর চোখে কোনো চাঞ্চল্য নেই—নেই সর্ব্বাঙ্গে কোনো চাঞ্চলতা। উলু নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ওর মস্তিষ্ক যে কোনো কাজ করছে তা বোঝাই যায় না। উলু চেয়ে আছে আকাশ পানে—অথবা আলমারীর দিকে কিংবা নীলুর হাতটার দিকে—কিন্তু কে বলবে সে কিছু দেখছে। উলু যেন কাপড়ের পুতুল—চোখ দুটো স্ফটিকের। না হাসি না কথা—যেন পাথরের মূর্তি।

যে যা কথা বলছে উলু শুনছে কিনা বোঝা যায় না। বসিয়ে দিলে বসে থাকে, শুইয়ে দিলে শুয়ে থাকে। কথা নাই—হাসি নাই, কান্নাও নাই। একি অবস্থা। একি দুঃসহ অবস্থা মানুষের ?

পুলিশ নিশ্চয়ই তদন্ত করছে অমিয়র নিখোঁজ হওয়ার—কিন্তু পুলিশের উপর নির্ভর করে বসে নাই ম্যানেজারবাবু। তিনি ইউনিটকে লাগিয়েছেন। ইউনিট যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

ইউনিট যে কেন এমন করে চেষ্টা করছে তা বুঝেছেন ম্যানেজার। ইউনিট উলুকে কন্যাস্নেহে মানুষ করেছে। সেই উলু বিপন্না এবং বিপদের কারণটা ঘটিয়েছে ইউনিট নিজেই। তাই আত্মগ্লানিতে আচ্ছন্ন ইউনিট পণ করেছে—জীবন দিয়েও সে ধরবে হত্যাকারীকে। ইউনিটের জন্য যথেষ্ট খরচ হচ্ছে—কিন্তু উপায় নাই। টাকা দিতে হয় তাকে। যখন-তখন সে হারাধনের পিছু নেয়। হারাধন যায় মোটরে—ইউনিটকে ট্যাক্সি করতে হয়। তাছাড়া ইউনিট তিনরকম ছদ্মবেশ কিনেছে—একটা সাহেবী, একটা বাঙালী—ধুতি পাঞ্জাবী—আর একটা ফেরিওয়ালার মত আলখেল্লা। সবই কিনতে হয়েছে, চুলদাড়ী এবং চশমাও। ম্যানেজারবাবু ওর কাজের নিষ্ঠা দেখে বুঝেছেন—প্রকৃত অপরাধীকে যদি কেউ ধরতে পারে তো সে ইউনিট।

উলুর আবার অসুখের খবর পেলেন ম্যানেজারবাবু। দুর্ভাগ্য এই পরিবারের—আর সৌভাগ্য হারাধনের। কারণ অসুস্থ উলু সম্পত্তি পাবে না—পাবে শুধু চিকিৎসার ব্যয় আর খোরপোষ। কী দুঃখের বিষয়। উলুর ব্রেন-প্যারালিসিস হয়েছে। এ রোগ শিবের অসাধ্য—জানেন ম্যানেজারবাবু। তাই ইউনিটকে তিনি উলুর অসুখ বা তার কলকাতায় আসার কোনো খবরই দিলেন না। কারণ ইউনিট উলুর এই অবস্থার কথা জানলে হয়তো একেবারে মুষড়ে পড়বে। তার চেয়ে সে পারে তো অমিয়র হত্যাকারীকে খুঁজে বের করুক—এই ভেবে ইউনিটকে কিছুই জানালেন না তিনি।

ইউনিট নানা বেশে ঘোরে—সব সময় লক্ষ্য তার হারাধনের দিকে। নীরাও এসে জুটেছে—ইউনিট তাকেও লক্ষ্য করছে—নীরার ঘরবাড়ী এবং পূর্ব্ব জীবনের কথাও খানিকটা জেনে নিয়েছে। কিন্তু হত্যাকারীব কোনো কিনারা হোলনা।

হারাধন অতি সতর্ক—নীরা ততোধিক সাবধান! কোনো হ'দিসই পাচ্ছে না ইউনিট কোথায় কি করে ব্যাপারটা ওরা ঘটালো। দেখতে পেল—হারাধন সব সময দেখাচ্ছে যেন অমিয়র খোঁজের জন্য তার ব্যস্ততার অন্ত নেই। পুলিশের কাছে সে ঐ জন্য যাতায়াত করছে—টাকাও খরচ করছে—বলছে—'মামার একমাত্র বংশধর—আপনারা খোঁজ করুন।'

চার-পাঁচ দিন হয়ে গেল—ইউনিট কিছুই জানতে পারে নি। অবশেযে সে ভাবলো—হয়তো ভুল হচ্ছে তাব। হয়তো হারাধন নির্দ্দোষ। তবে দেষী কে? অসিতবাবু! না—তা তো হতে পারে না। যিনি উলুকে এত যত্নে এনেছেন রেখেছেন—বিয়ে দিয়েছেন—তিনি একাজ কেন করবেন? অসিতবাবুর পুত্র নিরুদ্দেশ—তাঁর অঢেল সম্পত্তি। না, তিনি কখনো একাজ করতে পারেন না। তাছাড়া আরও কথা, উলু নাকি খুব সুস্থ নেই। অতএব অসিতবাবু দোষী নন।

তাহলে ব্যাপারটা ঘটলো কার দ্বারা? অঞ্জনা? উলু? অথবা স্বয়ং ম্যানেজারবাবু—না না না? কি সব ভাবছে ইউনিট! অগাধ চিন্তায় ডুবে গেল ইউনিট মদের ভাঁড়টা হাতে নিয়ে।

ক'দিন সে মদ খায়নি—আজ একটু খাবে। মদ না খেলে ঠিকমত চিন্তা করা যায় না। ইউনিট খেল খানিকটা। ভাবছে—কে হত্যাকারী? কে! ইউনিট নিজেই নয় তো? হ্যাঁ, সেই তো হত্যাকারী—সে নিজেই। সে উলুর মাকে মেরেছে, উলুকে মেরেছে—উলুর বরকে মেবেছে—এখন নিজেকে মারছে—

না—ভাবনাটা ঠিক হচ্ছে না—ইউনিট আর এক ঢোক মদ খেল। ভাবছে....

'—বর্দ্ধমানের কাছাকাছি চাঁদকোণায় যাচ্ছিল অমিয়—অঞ্জনাকে বলে গিয়েছিল—পথে এই দুর্ঘটনা।' অতএব চাঁদকোণাটা একবার ঘুরে আসতে হবে। চললো ইউনিট। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের বাস ধরে চলে এল সন্ধ্যার কাছাকাছি। চাঁদকোণা গ্রামটা বড়-রাস্তা থেকে দূরে। একজন যাত্রী ওকে বলে দিল,

—এখানে নামলে চাঁদকোণা আধমাইল।

নামলো ইউনিট—সন্ধ্যা এখনো হয় নি—দেখতে পেল, ৩৬৯৩৬৩ নম্বর ওয়ালা গাড়ীটা চলে গেল ঐ চাঁদকোণার দিকে। হারাধনের গাড়ী—তাহলে তো হারাধন আসে এখানে। কিন্তু গাড়ীর ভেতর সে কাউকে দেখতে পেলনা। কি ব্যাপার তাহলে? গাড়ীটা যে চালাচ্ছে সে একজন অচেনা লোক, ড্রাইভার। গাড়ীটা ফাঁকা—কোনো আরোহী নেই? তাহলে কি হারাধন আগেই এসেছে চাঁদকোণায়? গাড়ীটা তাকে আনতে গেল? না—তা হতে পারে না। হারাধন তো নিজের গাড়ী ছাড়া বেরয় না। আগে সে কেমন করে আসবে? হয়তো হারাধন এখানেই কোথাও নেমে গেছে। খালি গাড়ীটা নিয়ে ড্রাইভার গেল চাঁদকোণায়। কেন? কেন? কেন?

ইউনিট আর চাঁদকোণার দিকে এগুলোনা—হাতের টর্চ্চটা ঝোলায় ঢুকিয়ে সে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপরই হেঁটে পিছনদিকে আসতে লাগলো। ওখানটায় ঝোপজঙ্গল—ইটখোলা আর পোড়ো বাড়ী—একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ীও আছে।

বড় রাস্তা থেকে অনেক দূরে বাড়ীটা—আলো জ্বলছে। পেট্রোম্যাক্স বাতিটার উজ্জ্বল আলো পড়েছে এসে গাছে। কার বাড়ী ওটা—কেন অত জোর আলো? কে থাকে ওখানে?

দেখতে হবে। কিন্তু যাওয়া শক্ত—এদিকটায় পথ নয়—পথ ওদিক দিয়ে—ওদিকে যেতে অনেক সময় লাগবে। না—এই জঙ্গল পার হয়েই যাবে ইউনিট—চলতে লাগলো।

ওর মনে হোল—ওখানে অত জোরালো আলো জ্বালবার মত কেউ থাকতে পারে না—কারণ এ যায়গাটা পড়ো যায়গা—ডাকবাংলো। পড়ো বাড়ীও হতে পারে ওটা। যাই হোক ইউনিট দেখে আসবে। তার মনে হোল—ঐ দূরের মোড়টায় নেমে হারাধন নিশ্চয় ঐ বাড়ীতে গেছে—ওটা নিশ্চয় ফাঁকা বাড়ী।

না, ফাঁকা বাড়ী হলে আলো জ্বলতো না। কে থাকে ওখানে? দেখতে হবে। অত নির্জ্জন যায়গায় কে থাকে! অত জোরালো আলো কেন জ্বালে? কোনো সরকারী অফিসার এসেছে হয়তো; ইউনিট অনর্থক পণ্ডশ্রম করছে ওখানে যাবার জন্য। ফিরে যাবে সে।

ফিরছে—হঠাৎ একটা আলোর রেখা লাগলো তার চোখে—আলোটা মোটরের। একখানা গাড়ী যেন আসছে ঐ বাংলোর দিকেই। ওদিকের পথ ধরে আসছে গাড়ীটা। ফিরলো ইউনিট; ঐ বাংলোতে কোন অফিসার এলেন, দেখবে ইউনিট—দেখতে হবে কোনো পুলিশ কি না। হয়তো পুলিশ অফিসার কিংবা এস. ডি. ও. অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—যাই হোক, ইউনিট দেখবে। জঙ্গলটা খুব বিরক্তিকর, কাঁটা ঝোপ আর বুনো লতায় ভর্তি—আর মশা তো অজস্র—হোক—ইউনিট চলে এলো বাংলোর কাছাকাছি।

গাড়ীখানাও ঢুকেছে বাংলোর হাতায়। ড্রাইভার বসে আছে একা। কৈ—হারাধন তো নেই। তাহলে হোল কি! কোথায় হারাধন? তার গাড়ীতে অন্য কেউ আসবে এ তো সম্ভব নয়—বড় জোর নীরা আসতে পারে। কিন্তু নীরাকেও তো দেখা যাচ্ছে

না। পাঁচিলগুলো বহু পুরোনো, ভেঙে আছে একটা যায়গায়; ইউনিট সেই ভাঙা পাঁচিলটা পার হয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। বাড়ীর ভেতর নয় বাংলোর বারান্দায় উঠলো। অন্ধকারে দাঁড়ালো। ওদিকে সামনের উজ্জ্বল প্যাট্রোম্যাক্স আলোটা জ্বলছে, তার সামনের একটা কামরায় কথা চলছে। কাণ পেতে শুনতে লাগলো ইউনিট—

—কি কি ব্যবস্থা করছো তুমি এখন?

—কয়েকটাই করলাম হুজুর; লোকটি খুব শক্ত কিছুতেই নোয়ায় না।

—কি বলে?

—বলে—'প্রাণ যাক সেও স্বীকার—সই করবো না। তোমার যা-ইচ্ছে করতে পার।'—মেরে তো ফেলা যায় না হুজুর?

—না না না—মেরে ফেললে কাজটা হবে কি করে? সইটাই করানো চাই। অত্যাচার কর—আরো কড়া হও।

—আজ্ঞে হুজুর—বলেন তো দিই দু'এক চাবুক।

—হ্যাঁ দাও—এ পর্য্যন্ত কতখানা কি করেছ?

—সিগারেট বন্ধ করলাম, তারপর খাবার কম করলাম, তারপর একবেলা খাবার দিচ্ছি—তারপর জল তেষ্টায় ছাতি ফাটলে জল দিই। এখন দিই শুধু আলু সেদ্ধ ভাত একবেলা। চড় চাপড়ও দিয়েছি দুএকখানা। লোকটা খুবই শক্ত। সে বলে—'তোর মনিবকে ডাক—তার সঙ্গেই কথা বলবো।'

—না না আমার যাওয়া হবে না। আমি যেতে পারি নে। তুমি ওকে বলো—আজ শনিবার আগামী শনিবারের মধ্যে যদি সে সই না করে তো তাকে ইহধাম থেকে বিদায় করা হবে।

—যে আজ্ঞে—তাই বলবো। তবে রাজি হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া হুজুর একটা কথা—

—বলো—

—আমার বলায় আর আপনার বলায় তফাৎ আছে। আপনি নিজে যদি ওকে বলেন তো আরো ভাল হয়।

– না, আমার ওখানে যাওয়া সম্ভব নয় নিজে বলতে হবে কেন ?

—লোকটি খুব বুদ্ধিমান। সে বুঝেছে সই না করা পর্য্যন্ত তাকে আমরা মেরে ফেলবো না। আমি যে আপনার লোক তাও যেন সে আন্দাজ করেছে। অর্থাৎ সে প্রায় জেনেই ফেলেছে যে ভেতরে আপনি আছেন।

—ডাকাতি মনে করে না ?

—আজ্ঞে না—সে পরিষ্কার আপনার নামটাই করলো। বললো 'তাকে ডাক—সই করার কথা তার সঙ্গে হবে আমার।' আমি অবশ্য নিজকে ডাকাতের লোক বলেই জানিয়েছি কিন্তু ও তা বিশ্বাস করে না - ও বলে 'তোমার মনিবকে আমি দেখতে চাই। সে নিশ্চয় হারাধন।'

—আচ্ছা, তাকে বলো, আমি আসছে শনিবার তাকে দেখতে যাব। যদি এর মধ্যে সে সই না করে তো শনিবার তাকে আমি নিজের হাতে খুন করবো—বুঝলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তবে ও কাজটা আমাকেই করতে দেবেন।

—কেন ?

—ওরকম বদখৎ লোককে মারতে আমার খুব ভাল লাগে।

—আচ্ছা, তাই হবে। এখন চলি আমি।

—যে আজ্ঞে হুজুর। কিছু টাকা দিয়ে যান !

—এই নাও—

এরপর আর কথা শোনা গেল না। একটু পরেই মোটরের শব্দ পেল ইউনিট—বুঝলো লোকটি চলে গেল। বাইরে এসে দেখলো গাড়ীটা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর পড়ে সবেগে ছুটছে।

লোক দুজন কে কথা বললো ঠিক বুঝতে পারলো না ইউনিট—তবে বুঝলো এখানে কেউ বন্দী আছে যাকে সই করাতে চায় এরা—কে সে ? নিশ্চয় অমিয়। কিন্তু কোথায় ? একতালা বড় বাড়ী—ইউনিট কিছু দেখতে পেল না।

হারাধন ভয় পেয়েছে। কয়েকদিন থেকে সে লক্ষ্য করছে কে যেন তার অনুসরণ করে ; কে যেন সব সময় সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে তাকে। ম্যানেজার কি কোনো বিশেষ গোয়েন্দা নিযুক্ত করলেন ? হতে পারে। এখন এ কাজে ম্যানেজারই তার পরম শত্রু মনে হচ্ছে। তিনি যদি এমনভাবে বাধা না দিতেন তাহলে হারাধন অনায়াসে কাজটা সিদ্ধ করে সিদ্ধিলাভ করতে পারতো। আশ্চর্য্য ! ওঁর কি এসে যায় ? মামার সম্পত্তি ভাগে নেবে তাতে ম্যানেজারের কি ? কিন্তু ম্যানেজার অতি পুরোনো কর্ম্মচারী—ঠাকুরমার আমলের। বড় কর্ত্তা তাকে নিযুক্ত করেন—অতি বিশ্বাসী বলে খ্যাতি আছে তাঁর।

হারাধন বুঝতে পারলো—তার পেছনে গুপ্তচর ঘুরছে—পুলিশ নয়। পুলিশ কি করছে, খবর রাখে হারাধন। পুলিশ তাকে ধরতে পারবে না, তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই রাখে নি হারাধন। তবু হারাধন অত্যন্ত চিন্তিত। নীরা ফিরেছে দিল্লী থেকে কিন্তু সে অতি সতর্কতার সঙ্গে চলছে এখন। হারাধনকে সেই ডুবিয়েছে। এখন এই ঘোর বিপদের সময় নীরাকে পাওয়াই যায় না। সে ক্লাবের আগামী বাৎসরিকের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে নাটক নিয়ে। রাণী সাহেবা তাকে আরো কি সব কাজে লাগিয়েছেন ঠিক জানে না হারাধন। ক্লাবে যাবার সময় তার খুব কমে গেছে এখন।

আজই সে একবার চাঁদকোণায় যাবার জন্য মোটরটা নিতে গিয়েও নিল না—ড্রাইভারকে বললো সে যেন সন্ধ্যানাগাদ চাঁদকোণায় যায়। সেখানে তাকে নিয়ে কলকাতা ফিরবে। হারাধন ট্রেনে এসেছিল। আশ্চর্য্য! নিজের মোটর থাকতে ট্রেনে কেন এল হারাধন? কারণ ভয়—গুপ্তচরের আতঙ্ক। ট্রেনে সে এলো অর্থাৎ তার সাধারণ জীবন-যাত্রাকে অন্য খাতে আনলো।

বাংলো থেকে বেরিয়ে মোটরে চড়ে সবেগে ফিরছে হারাধন কলকাতায়। ড্রাইভারটা নতুন লোক তবে চেনা। ওরই কারখানায় কাজ করতো অল্প বেতনে। হালে ড্রাইভারি শিখে লাইসেন্স নিয়েছে। লোকটা বিশ্বাসী। হারাধন বললো,

—তোমার পিছনে কোনো ট্যাক্সি বা মোটর আসতে দেখনি?

—না স্যার—আমি যখন আসি কেউ পিছু নেয় নি।

—এখন দেখতো কেউ পিছনে আসছে কি না?

—একখানা বাস আসছে স্যার—যাত্রীবাস—বর্দ্ধমান থেকে।

—ওটাকে চলে যেতে দাও পাশ দিয়ে।

ড্রাইভার গাড়ীর গতি কমিয়ে বাসটাকে পথ দিল। বাসটা চলে গেল তীব্র বেগে। কিন্তু ঐ মোটরে-বসে-থাকা-হারাধনকে দেখে গেল ইউনিট। ইউনিট গাড়ীটা চিনলেও আজ এ পর্য্যন্ত খোদ হারাধনকে দেখেনি—এতক্ষণে বুঝলো ঐ বাংলোতে ছিল হারাধনই।

—হারাধন! আপন মনে বললো ইউনিট।

প্রায় আধ মাইল গিয়ে বাসটা এক ষ্টপেজে দাঁড়ালো। নেমে পড়লো ইউনিট—অপেক্ষা করতে লাগলো হারাধনের গাড়ীর। কোথায় রইল হারাধন? অন্য কোথাও গেল নাকি? না—ঐ তো ঐ গাড়ীতে ফিরছে—রাত হয়েছে। এখন গাড়ী চেনা অত সোজা নয়—তবু ইউনিট চিনতে পারলো গাড়ীটার রং দেখে।

হু' তিনটে গাড়ী যাচ্ছে সার দিয়ে। হারাধন ভেতরে বসে আছে ওর নিজের গাড়ীতে—ইউনিট দেখলো পথের পাশ থেকে।

হারাধন সব সময় দুপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে কিন্তু কৈ কাউকেই তো পিছু নিতে দেখা গেল না! অনর্থক সন্দেহ করছে সে—অকারণ ভয় করছে। ম্যানেজারের বাবাও তাকে ধরতে পারবে না। হারাধন কিছুটা আশ্বস্ত হোল। ম্যানেজার তো কর্মচারী—হারাধন মালিক। ম্যানেজারকে তো সে তাড়িয়ে দিতে পারে। না—তাতে হারাধনের উপর সকলের সন্দেহ গুরুতর হয়ে উঠবে। ম্যানেজারকে এখন তাড়ানো হবে না; কারণ তাতে অন্য কর্মচারীরাও বিরূপ হয়ে যেতে পারে।

যে ফ্যাকটরীটা মামা ওর জন্য করে দিয়েছেন আয় সেটার মন্দ নয়। চালাতে পারলে তাতেই হারাধনের জীবন ভালভাবে চলে যেতে পারে কিন্তু যে সুযোগ হারাধন পেয়েছে তার সদ্ব্যবহার করতে পারলে হারাধন কোটিপতি হবে। একি ছাড়া যায়?

কিন্তু এই সম্পদ পেতে হলে তিনটে বাধা—অমিয়, উলু এবং শেষে অঞ্জনা। এতোগুলো বাধা অতিক্রম করা অসম্ভব। অতএব সম্পত্তিটা পাবার আশা আর করেনা হারাধন। নগদ যে টাকাটা দিদিমা দিয়েছেন, সেটাই এখন লক্ষ্য ওর। যেমন করে হোক হারাধন ঐ নগদ টাকাটা আদায় করে দূর কোনো দেশে চলে যাবে কিছুদিনের জন্য—ফ্যাকটরী থাকবে ম্যানেজারের জিম্মায়। কিন্তু অমিয় তো সই করছে না—ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তোলা অসম্ভব হবে হয়তো—হয়তো হারাধন ধরা পড়ে যাবে।—নানা চিন্তায় বিচলিত হারাধন ঠিক করলো—অমিয়কে সে মেরেই ফেলবে। উলু অসুস্থ—অতএব সে সম্পত্তি পাবে না—অঞ্জনা পেতে পারে—কিন্তু সেটা আদালতের বিচার্য বিষয়। কারণ মামার

উইলটা হারাধনের পক্ষ সমর্থক। উলুর অসুখ একটা মহাসুযোগ হারাধনের পক্ষে। এখন অমিয় যদি ছাড়া পায় তো এসেই জানবে উলু আর ভাল হবেনা—তখন বিবাহ-বিচ্ছেদ অনায়াসে হয়ে যাবে—অমিয় আবার বিয়ে করে হারাধনকে কলা দেখাবে। না—অমিয়কে বাঁচতে দেওয়া হবে না। মোটরের গর্ভে হারাধনের চোখ জ্বলে উঠলো। বললো "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—ভয় কি? ঠিক সামলে নেব—"

ইউনিট দেখলো হারাধনকে। নিশ্চিত হয়ে গেল সে—বুঝলো ঐ ডাকবাংলোর মধ্যে অথবা কাছাকাছি কোথাও অমিয়কে বন্দী করে রাখা হয়েছে—তাকে কোনো কিছুতে সই করতে বলা হচ্ছে। ডাকবাংলোটা নিশ্চয় জমিদারদের ছিল—এখন পড়ে আছে। পথচারী জনসাধারণকে চিনিয়ে দেবার জন্য ওখানে পেট্রোম্যাক্স জ্বেলে রাখা হয়—লোকে ভাবে এস. ডি. ও. বা ম্যাজিষ্ট্রেট বা কোনো বড় অফিসার এসেছেন। সাধারণ কেউ তাই যায় না ওখানে। ওখানেই আছে অমিয়। তাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং আগামী শনিবারের মধ্যে। ইউনিট অস্থির হয়ে উঠলো। কি করে বের করবে সে?

পকেটে একটা বোতলে ছিল খানিকটা মদ। ইউনিট ওখানেই একটা চায়ের দোকানে দুখানা তেলেভাজা দিয়ে বোতলের মদটুকু শেষ করে দিল। এতক্ষণে চিন্তাটা ঠিক মত হচ্ছে। হ্যাঁ—হারাধনের পেছনে না ঘুরে অমিয়কেই আগে খুঁজে বের করতে হবে। ইউনিট ফিরতে লাগলো বাংলোর দিকে।

হেঁটেই আসছে ইউনিট। অন্ধকার রাজপথ—মাঝে মাঝে মোটর

বা বাস যাচ্ছে, পথ আলোকিত হয়ে উঠছে—আবার অন্ধকার। ইউনিট একা ফিরছে—অনেকখানা পথ—কিন্তু ইউনিটের অভ্যাস আছে হাঁটা—সে দুপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ফিরে এল। বাংলোটা স্তব্ধ—আলোটা নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে—হয়তো ঐ আলো হারাধনের সম্বর্ধনার জন্যই জ্বালানো হয়েছিল। যাক্ গে।

ইউনিট নিঃশব্দে ঢুকলো সেই ভাঙা পাঁচিলটা দিয়ে। ভেতরে কে আছে কি আছে কে জানে? চোরেব মত ঘুরছে ইউনিট—না—কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। এতো শিগ্রি সবাই চলে গেল নাকি? ওরা কে কে ছিল কে জানে। কাউকে দেখে'নি ইউনিট—এখন কিন্তু সব ঘরগুলোই দেখলো সে—কেউ নেই। পড়ো বাড়ী পড়ে আছে। তাহলে কি শুধু হারাধনের জন্যই ওরা এসে আলো জ্বেলেছিল? হ্যাঁ—তাছাড়া আর কি হতে পারে? ইউনিট হতাশ হয়ে পড়লো- এখানে অমিয় নেই। কেউ নেই। কোথায় তবে অমিয়? কে যে কথা কইল হারাধনের সঙ্গে দেখেনি ইউনিট—কি করে তাকে বের করবে? ইউনিট কি একাজে সফল হবে না? উলুকে রক্ষা করতে পারবে না ইউনিট?

চিন্তায় জ্বর এসে যাবার কথা ওর—কিন্তু না—জ্বর হলে চলবে না—যেমন করে হোক—খুঁজে বের করতে হবে অমিয়কে। অমিয় যে বেঁচে আছে তা সে জানতে পারলো হারাধন আর তার লোকের কথায়। কিন্তু তাকে মেরে ফেলতে কতক্ষণ? ইউনিট কোমরে হাত দিয়ে দেখলো—সেই পুরোনো রিভলভারটা আছে। এত রাত্রে আর যাবে কোথায় ইউনিট, ওখানেই শুয়ে রাতটা কাটাবে। একটা দরজাখোলা ঘরে ঢুকলো ইউনিট—খাট-বিছানা কিছুই নেই—একখানা ভাঙা টেবিল আছে। সম্ভবতঃ এতে খানা খাওয়া হোত। বড় টেবিল—ইউনিট তার উপর শুয়ে পড়লো। মশা—ভয়ঙ্কর বুনো মশা! ঘুম হওয়া অসম্ভব।

ঝিল্লীরব আসছে কানে—শেয়ালের ডাকও—জোনাকিরা জ্বলছে বাইরে—গাছে পাতায়—দেখছে ইউনিট—ভাবছে—কি সে করবে এখন। কোথায় খোঁজ করবে অমিয়র?—ঘুমিয়ে পড়ল।

উঠে দেখে বেলা উঠে গেছে। বাংলোটা দিনের আলোতে ভাল করে দেখে বুঝলো ইউনিট—দীর্ঘ দিন এখানে কেউ আসেনি। ঘরটার দরজা জানালাও খুলে নেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ বাড়ীটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিক দূরে বাড়ীখানা, এখানে আসবার জন্য যে পথ ছিল তা প্রায় অব্যবহার্য্য হয়ে পড়েছে। ইউনিট বেরিয়ে এল ওখান থেকে। বুঝলো এখানে অমিয় নেই। কোথায় তবে?

দুটো দিন কাটালো ইউনিট ঐ তল্লাটে ঘুরে ঘুরে। না—কোনো কিছুই জানা গেল না। চাঁদকোণায় জমিদার বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরলো কিছু যদি খবর মেলে। তৃতীয় দিনে দেখতে পেল জমিদার বাড়ীর আঙ্গিনায় একটা গাড়ী—হারাধনের নয়—অন্য কারো হবে—কার গাড়ী? কে এলো এখানে?

ঢুকে পড়লো। এ বাড়ীতে তো বিশেষ কেউ নেই। জানে ইউনিট—তবু ঢুকলো গাড়ীখানা কার দেখবার জন্য। ঢুকে দেখলো সদর ঘরেই বসে কথা কইছে—নীরা আর হারাধন এবং ওখানকার তিন-চারজন কর্ম্মচারী। ইউনিট বুঝলো—হারাধন গাড়ী বদলেছে। এ গাড়ীটা পুরোনো অষ্টিন—খুব সম্ভব অমরবাবুর গাড়ী এটা। ইউনিট গতকাল দেখেছে—গাড়ী এখানে আসবার পথটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—মেরামত করা হচ্ছে। অস্থায়ী সাঁকো করেছে। হারাধনই করালো হয়তো—কারণ সেইতো এখন মালিক। ইউনিট আর বেশী এগুলো না ভেতর দিকে। ওখানে দাঁড়িয়েই ভেতরে চাইল—এবং লক্ষ্য করতে লাগলো ওদের। কথা শোনা যাবে না—শুধু দেখতে পাচ্ছে। হারাধনই কথা বলছে। কি কথা

বলছে, শোনা না গেলেও ইউনিট বুঝলো—বিষয় সম্পত্তির কথাই হবে।

ভিক্ষা ওকে কেউ দেবে না এখানে—জানে ইউনিট—দেবার কোনো ব্যবস্থাই নেই হয়তো—তবু একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

—কে—কি চাও?

—ভিক্ষে চাই বাবা—

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে হারাধনই একটা সিকি ছুড়ে দিল। ইউনিটকে এবার চলে আসতে হবে—আর থাকা চলে না। ফিরছে, দেখতে পেল—একজন জোয়ান লোক বাইরে দাঁড়িয়ে। ভেতর থেকে হারাধন ডাকলো—নাথু?

—হুজুর—বলে লোকটা ভেতরে গেল।

লোকটাকে চিনে রাখলো ইউনিট।

অসুখটা অসাধ্য—অর্থাৎ এ রোগ নাকি সারে না—ডাক্তারদের অভিমত। একে বলে ব্রেন প্যারালিসিস। হয়তো ইউরোপ—আমেরিকায় এর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে—ভারতে কোথাও আছে কি না জানা নেই।

নীলু হতাশ হয়ে পড়লো। উলুর জন্য অন্তর্বেদনা তার আগাধ। বাবা যাকে কন্যাস্নেহে লালন করে গেছেন—নীলুর কাছে দুটো দিনও ভাল থাকলো না সে—দুর্ভাগ্য!

কিন্তু নীলু অত সহজে ছাড়বে না। বড় ডাক্তার—আরো বড় ডাক্তার—স্পেশালিষ্ট যে-যেখানে আছেন খবর নিতে লাগলো। কোথায় গেলে এই রোগের চিকিৎসা হতে পারে জানবার জন্য নীলু

প্রাণপণ করলো। উলুকে ভাল করতেই হবে—সর্ব্বস্ব যাক—উলু ভাল হোক।

ওদিকে অমিয়র খবরও রাখতে হচ্ছে তাকে। খবর কিছুই পাওয়া যায় নি। ওখানকার ম্যানেজারবাবু বলেছেন—চেষ্টার ত্রুটি তিনি করছেন না। তবে এখন যতদূর মনে হয় অমিয়কে মেরে ফেলেছে। কথাটা শুনে চমকে উঠলো নীলু। অমিয়কে যদি মেরে ফেলে তাহলে উলুকে আর ভাল করে কি হবে? ওর মরাই ভাল।

না—নীলু ভাবলো—উলুকে সে ভাল করবে। আবার সে বিয়ে দেবে উলুর—উলুকে সুখী করবে নীলু—এই তার পন। উলু যেমন ছিল তেমনি আছে। হাসে না, কাঁদে না, কারো সঙ্গে কথা বলে না। নার্স খাইয়ে দেয়—খায়—শুইয়ে দেয়—শোয়—ওর যেন কোন চিন্তাশক্তি নেই। একি আশ্চর্য্য রোগ।

ডাক্তারগণ বলেন—জন্মাবধি দুঃখের আঘাত পেতে পেতে ওর মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে গেছে—কোনো কাজ করে না। স্মৃতিও নেই—কিছুই মনে নেই ওর—ওর মুখের ভাষাও হয়তো মুক হয়ে গেছে। কী দারুন অবস্থা! দেখলে চোখে জল আসে। কিন্তু উলুর চোখে জল নেই, ঠোঁটে নেই হাসি—যেন পাথরের একটা মূর্তি অথবা ন্যাকড়ার একটা পুতুল—ড্যাবড্যাবে চোখে চেয়ে থাকে—চেয়েই থাকে—ঘুমায় কিনা কেউ জানেনা—ঘুমোতে দেখেনি কেউ। মাঝে মাছে চোখ বোজে—কিন্তু ঘুমায় কিনা কে জানে। গান ভাল বাসতো উলু—ওর ঘরে রেডিও রাখা হয়েছে। গান বাজে—উলু শোনে কিনা কে জানে। অর্থাৎ জীবিত মানুষের লক্ষণের মধ্যে শুধু হাঁটা—বসা—শোওয়া আর খাইয়ে দিলে খাওয়া ছাড়া উলুর জীবনের আর কোনো লক্ষণ নেই।

নীলু সহরের সুবিজ্ঞ ডাক্তারদের আনলো। কবিরাজ আনলো।

হাকিমী চিকিৎসক আনলো—না, কেউ ভরসা দিলেন না। অবশেষে একজন বৃদ্ধ হোমিওপ্যাথকে আনল নীলু। তিনি বললেন, চেষ্টা তিনি করবেন। ওষুদ দিতে লাগলেন হোমিওপ্যাথি। অঞ্জনা আসে, খবর নেয় চলে যায়—না, উলু আর ভাল হবে না!

বাপের শ্রাদ্ধাদি কোনো রকমে সারলো নীলু—ভালই করলো সব। আজ একবার ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা করে অমিয়র খবর নেবে। গেল সে অমিয়দের বাড়ী। ম্যানেজার বসে আছেন।

—পুলিশ কিছু করতে পারছেনা—অন্ততঃ এখনো পরেনি। তবে একটা খবর আমি পেয়েছি—অমিয় এখনো বেঁচে আছে।

—বেঁচে আছে! তাহলে নিশ্চয় উদ্ধার করবো। কোথায় খবর পেলেন?

—আমার এক গুপ্তচর মারফৎ। তবে কোথায় তাকে রেখেছে জানা যায় নি।

—তাহলে!

—খোঁজ চলছে। দেখি ভগবান কি করেন। উলু কেমন আছে?

—তেমনি! হোমিওপ্যাথি মতে দেখবো একবার।

—ভাল—এলোপ্যাথরা সব জবাব দিলেন?

—হ্যাঁ—তাঁরা বললেন—এদেশে ওর চিকিৎসা নেই—হবে না।

—জানিনা—কি পাপে এই বংশের এতো দুর্গতি—ম্যানেজার বললেন.

নীলু চুপ করে রইল—কিছুক্ষণ কাটলো। হারাধন বাড়ী ঢুকছে গাড়ীতে। নীরা সঙ্গে আছে। নীলু তৎক্ষণাৎ উঠলো এবং নিঃশব্দে অন্য ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো। নীলু নীরার সঙ্গে দেখা করতে চায় না। হারাধন ঢুকেই বললো,

—কে একজন বসেছিল না আপনার কাছে?

—হ্যাঁ—ওঘরে গেছে। ও একজন বেকার—কাজ চায়—

—ও—শুনুন ম্যানেজারবাবু—আমি আজ বাইরে যাচ্ছি। আমার কারখানার জন্য কিছু কেনাকাটা করতে—যাব বোম্বাই—আপনি রইলেন।

—হ্যাঁ—কবে ফিরবেন ?

—দিন সাত লাগবে। হাজার খানেক টাকা দরকার।

—নিয়ে যান। ওরে খাজাঞ্চিবাবুকে ডাক তো!

হারাধন এটা করে। বরাবরই সে এইভাবে টাকা নিয়েছে। জানাতে চায় যে তার নিজের তহবিলে টাকা নেই। অতি অল্পই নেয়—দুশো-একশ—আজ হাজার চাইল। জানেন ম্যানেজার।

—শুনেছেন ম্যানেজারবাবু উলু নাকি খুবই অসুস্থ—সারবে না ?

—হ্যাঁ শুনেছি। সব ডাক্তারই জবাব দিয়ে গেছেন।

—খুব দুঃখের কথা ম্যানেজারবাবু। অমিয়র খবর নেই—উলুর অসুখ। এতবড় সংসারে এখন রইল শুধু অঞ্জনা—কি যে হবে ?

—হবে আর কি! মালিকের ইচ্ছেমত আপনি সব সম্পত্তিই দখল করবেন।

—না না না—কি সব বলছেন ম্যানেজারবাবু-আমি কেন এ সম্পত্তি নিতে যাব ? অঞ্জনাই নেবে—সেই তো এখন মালিক। মামার ও উইল বাজে—ওর কোনো দামই নেই—অমিয় বা উলুর অবর্ত্তমানে অঞ্জনাই সব পাবে—উলুর জন্য সত্যি দুঃখ হয়।

—না না—দুঃখের কি আছে, চরিত্রহীনা মেয়েদের শাস্তি তো ভগবান দেন—ম্যানেজার বললেন কথাটা। বলেই তাকালেন হারাধনের পানে।

নীরা এতোক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এতক্ষণে কি ভেবে বললো,

—পাপ বা পাপীর কথা আমরা জানি না ম্যানেজারবাবু;

মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখলে কষ্ট হয়। উলুকে একবার দেখে আসা উচিৎ আমাদের।

—না—দেখা করতে দেওয়া হয় না তাকে কারো সঙ্গে।

—কেন?

—কি হবে দেখা করে? সে কাউকেই চিনতে পারে না। তার মনে বা মাথায় বা চোখে মুখে চিন্তার কোনো লক্ষণ নেই। সে একেবারে মানুষের বাইরে চলে গেছে। এ রোগ সারে না—শিবের অসাধ্য।

ম্যানেজার লক্ষ্য করছিলেন তাঁর কথায় নীরা আর হারাধনের মনটা কতখানা প্রফুল্ল হয়। হ্যাঁ, যা চেয়েছিলেন তিনি তা পেলেন। মুখ দেখে বেশ বোঝা গেল হারাধন খুসী হয়েছে।

—সারবেই না! সুইজারল্যাণ্ডে পাঠানো হোক। যত টাকা লাগে দেব আমরা।

—টাকার জন্য নয়, টাকা তার দাদাই খরচ করে তাকে সারাতে চায়।

—দাদা কে?

—নীলু—নীলোৎপল অসিতবাবুর ছেলে—সে ফিরেছে।

—হ্যাঁ—ফিরেছে জানি। নীলু তার দাদা কি করে হোল? উলুর জন্মের কোনো ঠিকানা নেই—তার কেউ নেই কোথাও।

—জন্মের ঠিকানা কারইবা থাকে হারাধনবাবু? মানুষ শুধু মানুষ এই হিসাবেই যতকিছু সামাজিক প্রতিপত্তি। নইলে কে এমন আছে বলবে কার কে ছেলে? কার মা সতী সাবিত্রী? আমার বাবাই যে আমার সত্যি বাবা তা শুধু বলতে পারে আমার মা। উলু অসহায়, উলু অসুস্থ, উলু তার জীবনে কোথাও কোনো সুখ পেল না, তার ভাগ্য তাকে ঝঞ্ঝা-ঝটিকার আবর্তে আর্ত্ত করে তুলেছে তাই আমাদের সহানুভূতি জাগে—বলতে ইচ্ছে হয়—আহা!

ম্যানেজারের এতগুলো কথার উত্তরে হারাধন কোন কথাই বললো না। হাজারটা টাকা এর মধ্যে এসে গেছে। হারাধন ভাউচারে সই করে টাকা নিল। বললো,

—আচ্ছা, আমি ফিরে আসি—নমস্কার।

চলে গেল হারাধন আর নীরা। ম্যানেজার জানেন না কোথায় ওরা গেল। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ইউনিট জানিয়েছে—'অমিয়র খোঁজ সে পায় নি কিন্তু জানতে পেরেছে অমিয় বেঁচে আছে। আগামী শনিবার তাকে হয়তো হত্যা করা হবে'—পরশু সেই শনিবার।

ব্যাকুল হয়ে উঠলেন ম্যানেজারবাবু। বেশ বুঝলেন, কোনো বিশ্বাসী লোক দিয়ে হারাধন খুনটা করাবে।

নিজে থাকবে দূরে—তাই টাকা নিল, কলকাতার বাইরে হয়তো সুদূর বোম্বাই এ চলে যাবে খুনের পূর্ব্বেই এবং প্রমাণ করবে—সে তখন ছিলই না এখানে। এখন কি করা যায়? কর্ত্তব্য স্থির করা অত্যন্ত কঠিন হোল ম্যানেজারের পক্ষে। নীলু ফিরে এলো ওঘর থেকে। ম্যানেজারবাবু নীলুকে বললেন সব খুলে।

—ইউনিট—হ্যাঁ ইউনিটের নাম শুনেছি আমি উলুর কাছে। সে তখন ভাল ছিল—ইউনিটই তাকে মানুষ করেছে আসাম থেকে এনে। কোথায় সে?

—সেই তো খুঁজে বের করবার জন্য জীবন পণ করেছে।—কিন্তু পরশু শনিবার, জানিনা কোনো খোঁজ সে পেল কি না। কি করা যায় নীলু?

—তাইতো। নীলু অতিশয় চিন্তিত হোল—বললো,

—কোনো বিশেষ রকম পুলিশী ব্যবস্থা কি করা যায় না?

—হয়তো যায়—এখনো সময় আছে। ইউনিট কি খবর আনে না জানা পর্য্যন্ত কোথায় আমরা পুলিশ নিয়ে যাব? এখনো

তো জানা যায় নি অমিয়কে কোথায় ওরা রেখেছে। তবে চাঁদকোণার কাছে—এইটুকু মাত্র জানতে পারা গেছে। অকুস্থল জানা যায় নি।

—তাহলে তো কিছুই জানা যায় নি। হাজারটা টাকাও তো নিয়ে গেল হারাধন—দেখলাম। একটু থেমে নীলু আবার বললো,

—দেখুন ম্যানেজারবাবু কিছুই কি আমাদের করবার নেই? চলুন চাঁদকোণায় যাই।

—না—ইউনিটের কাছ থেকে খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই আমরা করতে পারি নে। জানাজানি হলে বিপদ বাড়বে।

—হ্যাঁ কিন্তু পরশুই তো শনিবার—সময় আর কতটুকু?

—হোলেও কোথায় আছে অমিয় না জানা পর্য্যন্ত কিছুই করা যায় না

—আমরা হারাধনকে গ্রেপ্তার করাতে পারি ?

—না—তাছাড়া হারাধন নিজে খুন করবে না, করাবে তার লোক দিয়ে। অমিয় যদি সই দেয় তো তারপর খুন করবে তাকে। না দিলেও খুন করে নিষ্কণ্টক হতে চায় হারাধন। উলু অসুস্থ অতএব সবই এখন হারাধনের। অঞ্জনার কি পাওনা পরে বোঝা যাবে কোর্টে। ইউনিট জানিয়েছে অমিয় কোথায় বন্দী তা সে এখনো জানতে পারে নি। জানলেই এখানে জানাবে।

—আপনি এখন কি করবেন ম্যানেজারবাবু?

—ইউনিটের কাছ থেকে খবরের জন্য অপেক্ষা করবো। খবর হয়তো সে দেবে সন্ধ্যা নাগাদ। যে লোকটার উপর খুনের ভার আছে, ইউনিট তার পিছনে লেগে আছে।

—হারাধন কি সত্যই বাইরে যাবে ম্যানেজারবাবু? আমার মনে হয় সে যাবে না। সে দেখবে কাজ ঠিক হোল কি না।

পিছু নিল গাড়ীটার কিন্তু মোটরগাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা অসম্ভব সাইকেলের পক্ষে। গাড়ীটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। ওখানে একটা বাঁক আছে—এই যায়গাটায় পায়ে পায়ে বাঁক। বিস্তর ঘুরে পথটা চন্দননগরে পৌঁছেছে। ঝোপজঙ্গলও বিস্তর—ইটাখোলা নাকি নাম জায়গাটার।

ও গাড়িটাকে আর ধরা যাবে না—ভেবেও কিন্তু ইউনিট চলতে লাগলো। তার মনে পড়লো—একটা রেলওয়ে ক্রসিং পার হতে হবে—যদি সেখানে রেলগাড়ী পাস করে তাহলে মোটরের গতি রোধ হবে—দেখা যাক কি হয়। ইউনিট যথাসাধ্য বেগেই সাইকেল চালালো।

ক্রসিংটার আগেই একটা খাল—পূবদিকে জঙ্গলমত খানিকটা যায়গা। ইউনিট দেখতে পেল—ঐখানে বহু পুরাতন যে পথটা ছিল, দীর্ঘদিন পরে সেই পথে মোটরের চাকার দাগ পড়েছে। সন্ধ্যা তখনো হয়নি—ইউনিট দেখলো ভিজে মাটিতে গাড়ীর টায়ারের দাগ। এপথে এখুনি কোনো গাড়ী গেছে বুঝতে পারলো ইউনিট—সে সাইকেলটা ঐ পথেই ঘোরালো। প্রায় মাইল খানেক এল। সন্ধ্যা নামছে। এখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ইউনিট দেখতে পেল, অতি জীর্ণ একখানা ইমারত—দীর্ঘকাল বোধহয় পড়ো হয়ে আছে। তারই সামনে মোটর গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে—গাড়ীতে কেউ নেই কিন্তু দুজন পাহারাওয়ালা রয়েছে ভাঙা বাড়ীর বারান্দায়।

ইউনিট নিজের সাইকেলটা একটা ঘনঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে সন্তর্পনে এগুতে লাগলো ভাঙা সেই বাড়ীটার দিকে। পিছন দিক দিয়ে তাকে যেতে হোল কারণ সামনে পাহারা রয়েছে।

পিছনদিকে প্রথমতঃ কিছুই সে দেখতে পেল না। হঠাৎ বাড়ীর ভাঙা চিলেকোঠায় যেন আলো জ্বলে উঠলো মনে হোল

তার। পাশেই একটা বড় বেলগাছ রয়েছে—ইউনিট একমিনিটে উঠে পড়লো গাছে।

হ্যাঁ—বেশ দেখা যাচ্ছে, কথাও হয়তো শোনা যাবে। শুনতে পেল,

—সর্দ্দারের হুকুমই আপনাকে জানাচ্ছি। সই করুন—না যদি করেন তো জীবনের আশা নেই আপনার—কোনটা চান ভেবে দেখুন।

—সই করবো না—তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার—

—বেশ, আপনার সিগারেট বন্ধ হয়েছে, বিছানাও বন্ধ হোল, আজ রাত্রে আর কোন খাবার দেওয়া হবেনা—শুধু জল খাবেন। কালও যদি সই না করেন তো উপোস চলবে। পরশুও যদি সই না করেন তো গুলি খেতে হবে—বুঝেছেন? ঐ চেয়ারেই বসে থাকুন—মাঝে মাঝে চাবুক মেরে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য লোক রইল—তারা জানিয়ে দেবে সইটা করা দরকার—কেমন?

আর কোনো জবাব শোনা গেল না। ইউনিট দেখতে পেল, চিলে কোঠার বাইরে ছাদের উপর হারাধন দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তারই আদেশ নাথুরাম জানাচ্ছে অমিয়কে। কিন্তু অমিয়কে দেখতে পাচ্ছে না ইউনিট—সে হয়তো কোণার দিকে আছে। নাথুরাম বের হয়ে এল। হারাধনের কাছে গিয়ে বললো,

—খুব শক্ত লোক—

—পরশু পর্য্যন্ত ওর মেয়াদ। সই যদি না করে তো ওর আর বাঁচবার পথ থাকবে না।

—সেকথা তো আমি জানিয়ে এলাম হুজুর।

—আচ্ছা—চল এখন।

ওরা চলে গেল। ইউনিট অন্য একটা ডালে এগিয়ে এসে ভাল করে দেখলো—এককোণায় একখানা ক্যাম্বিসের চেয়ারে জীর্ণ শীর্ণ এক যুবক বসে আছে—ঘরে আর কোনো আসবাব

নেই। একটা মোমবাতির অতি ক্ষীণ আলো মাত্র জ্বলছে ঘরে—একটু পরেই দমকা হাওয়ায় বাতিটা নিবে গেল। ঘর অন্ধকার। আর কিছু দেখা গেল না। ইউনিট সন্তর্পণে নেমে এল গাছ থেকে। অতিশয় সাবধানেই নামলো ইউনিট, গাছের ডাল তবু নড়লো। ইউনিট শুনতে পেল কে যেন বলছে 'গাছটার ডাল নড়ে কেন! দেখ তো।' সৌভাগ্যক্রমে ইউনিট তখন নেমে পড়েছে। সে একটা ঝোপের আড়ালে লুকোল। জোরালো একটা টর্চ্চ নিয়ে একজন লোক এসে গাছটা তদাবক করে গেল। দেখলো ইউনিট, তার হাতে দোনলা বন্ধুক। বেশ বুঝলো অমিয়কে অতি সতর্ক পাহারা ঘিরে রাখা হয়েছে। বন্ধুকধারী পাহারাও আছে তার জন্য। কি এখন করবে ইউনিট?

চিন্তা করে লাভ নেই, ভাবতে ভাবতে ইউনিট চারদিক যতটা সম্ভব ভাল করে দেখে অতি সন্তর্পনে ফিরে এল। ম্যানেজারকে খবর দিতে হবে। আজ বৃহস্পতিবার—আগামী পরশুই হয়তো অমিয়র জীবনের শেষ দিন। সে ফিরে এল দোকানে। চিন্তায় চিন্তায় কাতর হয়ে উঠেছে ইউনিট। কি করে অমিয়কে উদ্ধার করবে এই তার চিন্তা। পুলিশের সাহায্য নিয়েই সে সেটা করবে ঠিক করলো। নিতেই হবে পুলিশের সাহায্য। কিন্তু তার মত একজন অসহায় ভিখারীকে পুলিশ সাহায্য করবে কি না—কে জানে? ভাবতে লাগলো ইউনিট বাইরের বেঞ্চিটায় শুয়ে শুয়ে। অধিকরাত্রি পর্যন্ত ঘুম না আসায় ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে দেখলো দোকান খুলেছে। একখানা মোটরগাড়ী সামনে দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার কি যেন কিনছেন। ঐ গাড়ীর হর্ণের আওয়াজেই ঘুম ভেঙে গেল ইউনিটের। উঠে বসলো ইউনিট—গতরাত্রের চিন্তাটাই সর্ব্বাগ্রে ওর মনে উদয় হোল, কি করে অমিয়কে রক্ষা করা যায়। পুলিশের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই কিন্তু পুলিশ কি ইউনিটের কথায়

আসবে ? ঘুমের মধ্যেও এই দুশ্চিন্তায় ছটফট করেছে ইউনিট। উঠেই মনে পড়লো—আজ শুক্রবার, কাল শনিবার—কে জানে কি হবে।

মোটরের ড্রাইভার ওর দিকে তাকালো—বসলো এসে ওরই বেঞ্চিটার এক কোণায়—বসেই দোকানীকে বললো,

—এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট—

ইউনিট তার সামান্য বিছানাটা গুটিয়ে চলে যাবে ; মোটরের ড্রাইভার প্রশ্ন করলো,

—আপনি এখানেই থাকেন ?

—হ্যাঁ জি—ইউনিট জবাব দিল।

—ইউনিট—কথাটা অতি আস্তে বললো ড্রাইভার। ইউনিট বুঝলো, ড্রাইভার যেই হোক তাকে চেনে। হয়তো ছদ্মবেশী কেউ ; সে তাকালো ড্রাইভারের দিকে। মাথায় বড় পাকড়ী আর চোখে মোটা গগল্‌স্ দেখে বোঝাই যায় না লোকটা কে ! বলল,

—কাকে কি বলছেন ?

—তোমাকেই বলছি ইউনিট, আমি কলকাতা থেকে আসছি। আমাব নাম নীলু—ম্যানেজারের কাছ থেকে তোমাব ঠিকানাটা জেনেই আসছি আমি। আমি অসিতবাবুর ছেলে নীলোৎপল।

—ও—ইউনিট বসলো বেঞ্চিটায়। তাকালো, ভাল করে দেখলো নীলুকে। কি যেন ভাবলো। পরে বললো,

—কি আপনার দরকার আমার সঙ্গে ?

—কতদূর কি করতে পারলে ? কোনো সন্ধান কি পেয়েছ ?

—পরে বলবো—উলু কোথায় ?

—উলুকে আমি কলকাতায় ফিরিয়ে এনেছি। সে এখন আমার বাড়ীতেই আছে।

—কেমন আছে ?

—ভালই—বলে নীলু কি যেন ভেবে উলুর অসুখের খবরটা দিল না ইউনিটকে। কারণ উলুর অসুখের খবর শুনলে হয়তো ইউনিট খুব মুষড়ে পড়বে—তাই আর এ বিষয়ে কিছু বললো না। বললো—

—তার ভাল থাকা এখন অমিয়র বেঁচে থাকার উপর নির্ভর করে ইউনিট—অমিয় কি বেঁচে আছে ?

—হ্যাঁ—এখনো আছে কিন্তু কাল কি হবে জানিনা।

দোকানী চা-খাবার দিল। খেল নীলু ইউনিটের পাশেই বসে বসে। এই সময়টুকুর মধ্যে ইউনিট তাকে জানিয়ে দিল সব কথা এবং বললো যদি ঠিক সময় পুলিশ না আসে তাহলে অমিয়কে রক্ষা করা যাবে না—অতঃপর কোথায় অমিয় আছে তাও সে জানালো নীলুকে।

নীলু তাকে আশ্বাস দিয়ে বললো সে যেমন করে হোক কাল সন্ধ্যা নাগাদ পুলিশ নিয়ে আসবে।

নীলু চলে গেল ড্রাইভারের বেশেই গাড়ী চালিয়ে। ইউনিট ভাবতে লাগলো—যদি যথাকালে পুলিশ না আসে তাহলে হারাধনকে ধরা তো যাবেই না—অমিয়কেও বাঁচানো যাবে না।

ইউনিট নানা রকম চিন্তায় দিনটা কাটালো। সন্ধ্যার পর একবার অমিয়র বন্দীশালার দিকে যাবার ইচ্ছা সে করেছিল—কিন্তু কি ভেবে গেল না। কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে—কাজই খুঁজলো সারা দিন।

শনিবার সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ইউনিট সারাদিন অপেক্ষা করে রয়েছে নীলু আর পুলিশের জন্য। না—কেউই তো এলোনা ? হোল কি তাহলে ? কি এখন করা যায় ?

চারটে পাঁচটার সময় হারাধন গাড়ী করে চাঁদকোণায় এসেছে। দোকানের বেঞ্চিটায় বসে দেখেছে ইউনিট। সঙ্গে একটি মেয়ে রয়েছে তার—নীরা। তাকেও দেখেছে ইউনিট। নাথুকে আজ সারাদিন এদিকে দেখেনি। হয়তো তাদের পরবর্তী পরিকল্পনা

রূপায়িত করবার জন্য নাথু ব্যস্ত আছে। ইউনিট এখন করবে কি ?

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। আর দেরী করা চলে না। ইউনিট তৈরী হয়ে বেরোলো অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে। চলে এলো সে পড়ো বাড়ীটার পিছনের দিকে বেলগাছটার কাছে। চারদিক একবার দেখলো তাকিয়ে। তারপর অতি লঘু পায়ে সেই গাছটার উপর উঠে গেল। বেলগাছের পাতা খুব ঘন—তারই আড়ালে বসে ইউনিট দেখতে পেল—একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। একখানা ভাঙা ক্যাম্বিশের চেয়ারে বসে আছে জীর্ণ তুর্ব্বল এক যুবক' মলিন হয়ে গেছে, চেনা যায় না যে সে ধনীর ছেলে। ইউনিটের খুবই তুঃখ হোল। একটু পরেই বুঝতে পারলো পাহারাওলারা বাড়ীটা প্রদক্ষিণ করছে। হয়তো তাদের মনে কোনো সন্দেহ হয়েছে। ইউনিট সতর্ক হোল, পাতাটি না নড়ে এমনি নিঃশব্দে বসে রইল। তুজন পাহারাওয়ালা ঘুরে গেল বাড়ীটা। বৃষ্টি হচ্ছে তাই তাদের গায়ে বর্ষাতি। ইউনিট ওঠার সময় হয়তো বেলগাছটার পাতার জল ঝরার শব্দ ওরা শুনেছে। শব্দ শুনে দেখতে এলো। তবে-- খুব কাছাকাছি কেউ এল না—তাই ইউনিটকে দেখতে পেল না ওরা। ইউনিট এই সময়টুকু ভগবানকে স্মরণ করছিল। বাতাস বইছে। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে—

—বাতাসে গাছ নড়ছে—অন্য কিছু নয়।

—হুঁ—তবু দেখা ভাল।

--বাবুর আসবার সময় হোল--

—হ্যাঁ—শোন—বক্‌শিস আজই আদায় করে নিতে হবে।

—দেবে তবে তো!

—না দিলে ছাড়ছে কে ? হাজার টাকা দেবে বলেছে।

—আগে দিক—তারপর বলবি। এ বাবুর কাছ থেকে টাকা পাওয়া অত সোজা নয়—তবে সর্দ্দার আছে।

—হ্যাঁ সর্দ্দার ঠিক আদায় করবে।

—ঐ ছোকরা যদি সই না করে তো কি করবে বাবু?

—মেরে ফেলবে ওকে।

—মেরে ফেলবে?

—হ্যাঁ—সেই রকমই তো শুনেছি।

ওরা চলে যাচ্ছে ইউনিট শুনলো কথাগুলো। শুনতে পেল, একজন বলছে,

—খুনের ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না পরসাদ।

—না থেকে আর উপায় কি? ছোকরা যে রকম জেদী তাতে সে যে চট করে সই করবে তা মনে হয় না। খুনই করতে হবে।

—আমি কিন্তু খুনের ব্যাপারে থাকবো না।

—আরে দেখ না কি হয়—অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

আর শুনতে পেল না ইউনিট; দেখতে পেল মোটরের আলোটা দূর বনের গাছগুলোকে আলোকিত করেই হঠাৎ নিবে গেল। ইউনিট বুঝলো হারাধন পৌঁছালো অকুস্থলে। এখন কি যে ঘটবে কে জানে! কিন্তু হারাধন কি মোটরের আলো জ্বেলে আসবে এখানে? পুলিশের জীপ নয় তো? যদি হয় তো খুবই মঙ্গল। আনন্দের কথা।

ইউনিট গাছের ডালে বসে অপেক্ষা করে রইল।

হারাধন এখনো আসেনি—নাথুই এলো। দেখলো অমিয়কে। কঠোর স্বরে বললো,

—সইটা করে দাও—বুঝলে? যদি বাঁচতে চাও তো সই কর। সোমবার ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা আমাদের নামে সরিয়েই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে? বেঁচে যাবে এযাত্রা।

—সই করবো না, যা ইচ্ছে করতে পার।

—আচ্ছা—তাহলে—

একটা চাবুক তার হাতে সপাৎ করে বসিয়ে দিল নাথু।

—উঃ!! চীৎকার নয়—আতঙ্কিত যন্ত্রণার আকস্মিক প্রকাশ! আবার এক চাবুক—আবার .....

না—অমিয় আর কোন শব্দ করছে না—চোখ বুজে পড়ে আছে চেয়ারে। অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি? নাথু থামালো চাবুক। তাকিয়ে দেখলো, দেখলো ইউনিটও। তার মনে হচ্ছে ছুটে গিয়ে নাথুকে গুলি করে মারে। কোমরে সেই পুরোনো পিস্তলটা আছে। গাছ থেকে ছাদে নামলো সে। শব্দ হোল একটু কিন্তু নাথু লক্ষ্য করে নি কারণ বাইরে বাতাস বইছে—হয়তো শুনতে পায়নি শব্দটা। ইউনিট নিশ্বাস চেপে জানালার কাছে এগিয়ে এলো—দেখতে পেল হারাধন ঢুকছে ঘরের ভেতর। হারাধন বললো,

—শোন অমিয়—সইটা করে দাও—শুনছো? যদি বাঁচতে চাও তো সই কর—

একটা চকচকে রিভলভার বের করলো হারাধন। চোখ মেলে তাকালো অমিয়—দেখলো হারাধনকে। আস্তে বললো,

—আগেই বুঝেছিলাম তুমি আছ এই ষড়যন্ত্রে। ভাল ভাল! চমৎকার! একেই বলে মহান মনুষ্যত্ব!

—সই করবে কি না, জানতে চাই।

—না—অমিয় কঠোর কণ্ঠে জবাব দিল—না—করবো না।

—আচ্ছা, তাহলে আরো ঘা-কতক চাবুক লাগাও নাথু!

—যে আজ্ঞে—নাথুর হাতের চাবুক উদ্যত হচ্ছে। ইউনিট আর সহ্য করতে পারলো না—ওদিকে ঘুরে এসে দরজা ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বিস্মিত হারাধন এই আকস্মিক ব্যাপারে অল্পক্ষণ হতভম্ভ হয়ে রইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরন করে গর্জন করে উঠলো,

—কে ? কে তুই……?

—আমি যেই হই—হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি। আর এগোবেন না—থেমে যান……

—রাস্কেল! এতো বড় সাহস তোমার ?—হারাধন বিভৎসকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো—গেট্ আউট্….

নাথু থেমে রয়েছে চাবুক হাতে আর অমিয় নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছে ক্যাম্বিসের চেয়ারটায়। কিন্তু সে ভাবছে কে ঐ ত্রাণকর্তা ? কে ও ? কোথেকে অকস্মাৎ এলো এখানে ? হয়তো ও বাঁচাবে অমিয়কে।

হারাধন রিভলভারটা উচু করে ধরলো ইউনিটের দিকে। সজোরে বললো,

—ভাগো হিঁয়াসে—নেই তো গুলি করেঙ্গে।

—হাম্-ভি তৈয়ার হ্যায়—

বলতে বলতে ইউনিটও পিস্তলটা বের করলো কোমর থেকে। নাথু হয়তো পালিয়ে যেতে চায়—কিন্তু পথ আগলে আছে ইউনিট। চাবুকটা হাতেই আছে নাথুর। হারাধন আবার বললো ইউনিটকে,

—হট্ যাও শূয়ারকা বাচ্চা—রিভলবারের ঘোড়ায় তার আঙুল। কিন্তু ইউনিট আত্মরক্ষার জন্য এখানে আসেনি। জীবন দিয়েও সে অমিয়কে উদ্ধার করবে। উলুর সিঁথীর সিঁদুর বজায় রাখবে। ইউনিট বললো—

—ওকে ছেড়ে দাও। আমি নিয়ে চলে যাব—নইলে তোমার বিপদ……

—আচ্ছা—তাহলে—এই নাও……

"—গুড়ুম!—"

শব্দটা দিক্‌মণ্ডলে ধ্বনিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ভারী পদশব্দ। হারাধন বুঝলো—লোক আসছে—হয়তো পুলিশ—হ্যাঁ পুলিশই। জানালা টপকে হারাধন পালাবে—না, পালানো সম্ভব হোলনা—আর একটা শব্দ হোল—

"—গুড়ুম।—"

হারাধন পড়ে গেল মেঝেতে। পুলিশ তখন দরজায় এসে পড়েছে। একজন দুজন নয়—ডজন খানেক। দেখলো তাবা, ইউনিট পড়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার সর্ব্বাঙ্গ কিন্তু এখনো হয়তো বেঁচে আছে। সেই গুলি কবেছে হাবাধনেব পায়ে—হারাধন চীৎকার কবে মেঝেতে পড়েছে।—কিন্তু ইউনিটের আঘাত বুকে—গুলিটা হয়তো ফুসফুসকে বিদার্ণ করে গেছে। পড়ে আছে ইউনিট। আতঙ্কে অমিয় স্থির হয়ে রয়েছে। নীলু প্রবেশ করলো।

—অমিয়!

নীলুকে দেখে কিঞ্চিৎ সাহস পেল অমিয়। বললো—

—ও কে? ও ত আমাকে বাঁচালো—কিন্তু নিজে ও মরছে নীলুদা—ওকে দেখুন।

—ওর কথা পরে শুনবে, ওরই চেষ্টায় তোমাকে উদ্ধার করা সম্ভব হোল অমিয়—বেঁচে আছ, এই ভাগ্য। তোমাকে জীবিত পাবার আশা করিনি আমরা।

—আমিও জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম নীলুদা—

পুলিশ হারাধনকে ধরলো—নাথুকেও বাদ দিল না। নীচের সকলকেই ধরা হয়েছে। কিন্তু ইউনিট অজ্ঞান—তাকে অবিলম্বে হাসপাতালে দেওয়া দরকাব।—না—কিছুই করতে হোল না। চোখে মুখে জল দিতেই ইউনিটের জ্ঞান হোল। তাকিয়ে দেখলো সে নীলুকে। বলল—

—আপনি এসেছেন। আর বেশী সময় নেই—তাই বলে যাই,

লিখে নিন, '—ঈশ্বরের দয়ায় অমিয়কে বাঁচাতে পেরেছি। আমার জন্য দুঃখ করবেন না—আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই। আমি উলুকে কন্যাস্নেহে মানুষ করেছিলাম—অভাবে পড়ে আমিই তার কাছে হাজার টাকা ভিক্ষে করে নিয়েছিলাম—ও……'

থামলো ইউনিট—জল খেল এক ঢোক—তারপর টেনে টেনে বলল,

—উলু নিষ্কলঙ্ক—নিষ্পাপ—সকালের শিউলীর মত পবিত্র—অমিয়—তাকে সুখী কোরো—মেয়েটা জন্মদুঃখী চির অভাগী। তাকে আর দেখতে পেলাম না—বড় সাধ ছিল···সাধ—উলু····

ইউনিটের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল।

পুলিশ যথাকর্ত্তব্য করলেন। ইউনিটের মৃতদেহ মর্গে পাঠালেন। হারাধন, নাথু এবং আর সকলকে হাতকড়া দিয়ে হাজতে নিয়ে এলেন—অমিয়কেও আনলেন তবে নীলু জামিন দিয়ে অমিয়কে খালাস করে নিয়ে গেল অমিয়র বাড়ীতে। এর পর মামলা হবে।

অমিয় অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে গেছে। তাকে ভাল করে খেতে দেওয়া হয় নি—বিছানায় শুতে দেওয়া হয়নি—তর্জন গর্জন এবং চাবুক চলেছে এই ক'দিন তার উপর। সবার থেকে বড় তার চিন্তা, কি হবে—কি করে সে বাঁচাবে নিজেকে এবং উলুরই বা কি হোল? কোথায় সে?

—প্রথমেই সে প্রশ্ন করলো—উলু কোথায়?

—আছে। অসুস্থ আছে—আমার ওখানে আছে। ভাবনা নেই। তুমি একটু সুস্থ হও, তারপর দেখা করবে।

—সে কি! আমি এখুনি তাকে দেখতে যাব—

—না অমিয়—সে খুবই অসুস্থ। হঠাৎ তোমাকে দেখলে তার হার্টফেল হতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

—কি এমন অসুখ তার ?

নীলু নিরুপায় হয়েই জানালো উলুর বর্ত্তমান অবস্থা। বললো,
—সে আর মনুষ নেই—পুতুল হয়ে গেছে। হয়তো পাথর হয়ে যাবে। কলকাতার বড়বড় ডাক্তারকে দেখাচ্ছি। তারা বলছেন '—এ অসুখ সারবার কোনো আশাই নেই…'

—সে কি ? সারবেই না।

—না—তার মস্তিষ্ক জড়বৎ হয়ে গেছে। দুঃখের আঘাতে আঘাতে তার মনে আর কোনো সাড় নেই। সে একটা কলের পুতুল—না। তার চেয়েও খারাপ তার অবস্থা।

অমিয়র চোখে জল এল। সামলে বললো,

—আমি একবার তাকে দেখতে চাই নীলুদা—

—না অমিয়—না। ডাক্তারের নিষেধ। সে এতো দুর্ব্বল, তার হার্ট এতো বেশী জখম যে যে-কোনো উত্তেজনায় বিপদ ঘটতে পারে। তোমাকে দেখলে কি হবে কে জানে !

—আমি ওকে বিলাতে নিয়ে যাব—সুইজারল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবো নীলুদা—আমেরিকায় নিয়ে যাব—

—বেশ তো—যাবে। তুমি একটু ভাল হও। মামলাটা চুকুক। তারপর যা হয় করা যাবে। এখন থাক—উলু বেঁচে আছে অবশ্য ওরকম বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই তার ভাল—নীলুর কথাগুলো কাঁদছে যেন।

অমিয়র সহস্র অনুরোধেও ডাক্তার বা অন্য কেউই উলুর সঙ্গে তাকে দেখা করবার অনুমতি দিলেন না।

অমিয় অস্থির হয়ে রইল।

লক্ষ্মী এবং অঞ্জনার স্বামী ফিরে এসেছে। সব খবরই জানলো ওরা। লক্ষ্মী বললো—

—উলুকে শুধু নার্সের হাতে রাখা ঠিক হচ্ছে না। আত্মীয় কেউ নেই।

—তুমি এসো—নীলু সবিনয়ে বললো—আমার ভুলের জন্য আর কতদিন অনুতাপ করবো? তুমি এসো লক্ষ্মী।

—আমি তো আসবার জন্য অপেক্ষাই করে আছি, কিন্তু নীরা?

—নীরা নামে কেউ আমার জীবনে এসেছিল এই কথাটা আমাকে ভুলে যেতে সাহায্য কর লক্ষ্মী।

—আচ্ছা, তাই হবে—হাসলো লক্ষ্মী।

বিনা আড়ম্বরে বিয়ে হয়ে গেল লক্ষ্মীর সঙ্গে নীলুর। উলু দেখলো—চেয়ে চেয়ে দেখলো—না—কোনো ভাব ওর মুখে চোখে ফুটলো না। সেই একই রকম। বসে থাকে—শুইয়ে দিলে শোয় খাইয়ে দিলে খায়—কথা নেই; ভাষা যেন ভুলে গেছে উলু। লক্ষ্মী এসে সব সময় ওর তদ্বির করছে—উলু খুসীও হয় না, বিরক্তও হয় না। কিছুতেই যেন ওব কিছুই যায়-আসেনা। কাঠের পুতুল হয়ে গেছে। গান যদি শোনানো হয় নড়ে-চড়ে বসে—ব্যাস, এই পর্য্যন্ত। ফুল যদি দেওয়া হয় উলু চেয়ে চেয়ে দেখে—তারপর চলে যায়। সেদিন লক্ষ্মী ওর গলায় একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিল। উলু হাসলো না, কাঁদলো না, ঠিক কাপড় পরার মতই পরলো মালাটা—তারপর খুলে ফেলে দিল।

একটা টিয়াপাখী আছে বাড়ীতে। উলুর আঙুলে কামড়ে দিল পাখীটা, রক্তগঙ্গা হয়ে গেল উলু এতোটুকু 'উঃ!' করলোনা। লক্ষ্মী ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিল—উলু চুপ করে বসে রইল।

নানা রকম পরীক্ষা করে দেখা হয় উলু সেই একই রকম আছে। জড়ি-বড়ির দু'একজন বদ্যি আনা হোল—ভূত-প্রেতের ওঝাও বাদ গেল না—সম্ভাব্য সবই করা হোল—ফল যে-কে সেই।

অমিয় খবর রাখছে সবই। প্রতি দিনের খবর সে খুঁটিয়ে জেনে যায় নীচে থেকে! উলুর সঙ্গে দেখা তাকে করতে দেওয়া হয় না।

এতে তার মনের কতখানি অস্বস্তি তা বলে বোঝানো দুষ্কর। কিন্তু অমিয় ভাবে উলু যদি এতে ভাল হয় তো হোক। না—ভাল হবার কোনো আশা কেউ দিলেন না।

বিচারে হারাধনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল। নাথুরাম-দের দণ্ড হোল যথা যোগ্য। অমিয় বাপের সব সম্পত্তিরই মালিক হবে কারণ অমরবাবুর উইলের কোনো মূল্যই নেই। অমিয় অঞ্জনাকে ডেকে বললো—

—এতো ধন সম্পদ নিয়ে কি আমি করবো অঞ্জু। তুই নে—

—না দাদা—বৌদি নিশ্চয় ভাল হবে। ওকে নিয়ে তোমরা বিলাতে যাও—বলতো আমিও সঙ্গে যাই।

—বিলাতে গেলেই যে ভাল হবে তা কে জানে!

—নীলুদা ওর জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবে না। যদি একান্তই ভাল না হয় তো তোমার আবার বিয়ে দেব।

—অঞ্জনা!

—দাদা—আমাদের পুরোনো বংশের তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। বিয়ে না করলে চলবে কেন? আমি অনেক ভেবেই কথাটা বলেছি।

—না অঞ্জু—বিয়ে আমি আর করবোনা।

অমিয় চলে গেল অন্যত্র।

* * * * *

নীলু অস্থির হয়ে উঠেছে উলুকে ভাল করবার জন্য। দেশের প্রায় সব বড় ডাক্তারকে দেখানোর পর সে কবিরাজী চিকিৎসা করালো এবং পরে হোমিওপ্যাথিও করালো কিন্তু যে-কে সেই। বছর পার হয়ে গেল—উলু ভাল হোল না। এখন বিলাত বা

আমেরিকা কোথাও নিয়ে গিয়ে যদি কিছু করা যায় - নীলুর ইচ্ছা সর্ব্বস্ব দিয়েও সে উলুকে ভাল করবে - ব্যবস্থা করছে বিলাত যাবার।

অকস্মাৎ একদিন খবরের কাগজে পড়লো বিদেশ থেকে একদল বড় ডাক্তার আসছেন ভারতের চিকিৎসা-বিষয়ক উন্নতির ব্যবস্থা করতে। সরকার থেকে তাঁদের আনানো হচ্ছে। নীলু খবরটা পড়েই অমিয়র সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলো ঐ দলের খ্যাতনামা ডাক্তার রিচার্ডসনের অনুগ্রহ তারা প্রার্থনা করবে উলুকে দেখাবার জন্য—-অমিয় মত দিল।

ডাঃ রিচার্ডসন অমায়িক এবং বদান্য ব্যক্তি। নীলুর আবেদন তিনি শুনলেন এবং উলুকে দেখতে এলেন। যথাযোগ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন তিনি, অবশেষে মত প্রকাশ করলেন,

—এ অসুখ সারবার আশা কম। তবে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করে শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে - তাতে কিন্তু জীবনের আশঙ্কা আছে. তাছাড়া এখানে করলে হবে না, কোনো ঠাণ্ডা দেশে হওয়া দরকার।

ডাক্তার রিচার্ডসনের পরামর্শ মত উলুকে বিলাতে নিয়ে যাবার কথাই ঠিক হোল। পাশপোর্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নীলুই তাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে যাবে লক্ষ্মী। অমিয়কে তারা নিয়ে যেতে চায় না—কারণ উলুর সঙ্গে অমিয়র সাক্ষাৎ কেউই সমর্থন করছেন না। অমিয় বারবার আবেদন করেও ব্যর্থ হোল। তাকে দেখা করতে দেওয়া হবে না। উলু এত দুর্বল যে সকলেই আশঙ্কা করেন অমিয়কে দেখে উলু যদি উত্তেজিত হয়ে ওঠে তো তার হার্ট ফেল হতে পারে।

উলু যাবে—সবই ঠিক হয়েছে। হয়তো আর ফিরবে না—হয়তো ঐ বিলাতের মাটিতেই উলু তার জীবনাবসান ঘটাবে, কথাটা ভাবতেই অমিয়র চোখের জল গড়িয়ে পড়লো গালে। উলুর

সঙ্গে মাস কয়েকের আনন্দ-মুখর দিন কয়টা তার মনে পড়ে.
মনে পড়ছে উলুর সলজ্জ সরল কথাগুলি—

উলুর অন্তরের গভীর প্রেম—যা অতি তুচ্ছ কথাতেও জ্যোতির মত জেগে উঠতো, সেই উলুকে হারালো অমিয় - অকারণে হারালো, হারালো তার বাবার জন্য—তার আভিজাত্য গর্ব্বী বাবার জন্য—বাবার উপর একটা রূঢ় শব্দই বের হয়ে গেল তার মুখ থেকে; সামলালো। ভাবলো সবই নিয়তি—নইঃ এমন হবে কেন? দুর্ভাগ্য উলুর নয় অমিয়রই। উলু তো এখ পাথর। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য নিয়ে কিছুই তার যায় আসে না সে আজ আর অনুভবই করে না—কি তার ছিল, কি তার গেছে! ওঃ—কী অসহ্য অবস্থা মানুষের!

বাঁচবার কোনো আশা কেউ দিতে পারেন নি বরং জীবনে আশঙ্কার কথাই বলেছেন সব ডাক্তার—তবু নীলু শেষ চেষ্টা করঃ কারণ উলুর এভাবে বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা অসহ্য।

প্লেনে সীট বুক করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে নীলু আর লক্ষ্ম উলুকে নিয়ে বিলাত যাবে। সবই ঠিক—হয়তো উলু আর ফিরবেনা, হয়তো এ জীবনে আর দেখা হবেনা—দেখাই হবে না আঃ অশান্ত অমিয় বললো,

—যাবার আগে আমি একবার উলুকে দেখবোই।

—সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে অমিয়।

—হয় তো হোক, যা হবার হয়ে যাক—আমি দেখবো।

—অমিয়—

—না নীলুদা, কোনো কথা আমি শুনবো না।

অমিয় সটান উঠে গেল উপরে তেতলার ছাদে যেখানে অস্তসূর্যের আলোতে দাঁড়িয়ে আছে ছাদের কার্ণিশের ক দেখছে—কি দেখছে—কে জানে।

—উলু!

না, কোনো সাড়া পাওয়া গেলনা। অমিয় আরো জোরে ডাকলো,

—উলু—

না, এবারও না। অমিয় প্রায় তার সামনে এসে ডাকলো

—শুনছো? উলু?

—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ -

ভূত দেখার মত চমকে উঠলো উলু—চোখ বুঝলো। পড়ে যাচ্ছে, অমিয় ত্বরিতে ধরে ফেললো ওকে। অমিয়র বুকেই উলু অজ্ঞান হয়ে গেল। নীচে থেকে অঞ্জনা নীলু লক্ষ্মী সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। অমিয় ধীরে ধীরে উলুকে শোয়ালো ঐ ছাদেরই মেঝেতে—মাথাটা কোলে নিল,—কাঁদছে অমিয়

উলু নিস্পন্দ। কে জানে কি হোল! বেঁচে আছে তো! নিজকে অপরাধী মনে হচ্ছে অমিয়র। সেই তাহলে হত্যা করলো উলুকে।

নার্স এসে দেখলো—উলুর নাকের কাছে জ্ঞান হবার ওষুদ দিল জল দিল মাথায় চোখে মুখে দু মিনিট পাঁচ মিনিট—বিশ মিনিট—না জ্ঞান হচ্ছে না। ডাক্তার ডাকা হোল—নাড়ীটা এখনো চলছে উলুর। অমিয় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উলুর মুখ পানে। চোখের পাতা নড়ছে উলুর—চোখ খুললো। হ্যাঁ—খুললো তার চোখের পাপড়ীর মত সুন্দর পাতা দুটি —দেখছে উলু অমিয়কে। দেখছে—এক মিনিট দু মিনিট…হঠাৎ একি! উলুর চোখে জল। যে উলু আজ আঠার মাস কাঁদে নি, হাসে নি, তার চোখে জল এল আজ।

চেয়ে আছে উলু—চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক তবে অজস্র জল ঝরছে গাল বেয়ে। অমিয় আস্তে ডাকলো,

--উলু!--

উলুর ঠোঁটে হাসি।

চেষ্টা করে অস্পষ্ট কণ্ঠে উলু সাড়া দিল,

—এসেছ!

সন্ধ্যার শোণিমা ওর সীমন্তে।

—শেষ—